মন্ত্রযোগ

Exposition of the Structure and Growth of the Advanced Hindu Religious Thoughts.

মোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে কুণ্ডলিনীশক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা,
ড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সপ্তচক্র ক্রমে সপ্ত
যোগভূমি ও সপ্তাচার, মন্ত্রশক্তি ও মন্ত্রদেবতা,
এবং মন্ত্রযোগের স্বরূপ অবধারণ।

অবধূত জ্ঞানানন্দ প্রবোধিত

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীআদরচন্দ্র মিত্র, বি-এল্,
গ্রাম পাঠডাঙ্গা। পোষ্ট—বিড়া-বল্লভপাড়া, চব্বিশ পরগণা
এবং
১৪৫ সোণার পুরা, কাশীধাম।
১৩৩৬

মূল্য ১।০

পূর্ব্বাভাস

স্বর জগতের মোহিনীশক্তি। বজ্রের নির্ঘোষে কঠিন হৃদয়ও স্তম্ভিত হয়। পুরাকালের যোদ্ধাগণ বিপক্ষকে নিজের বজ্র নিনাদে জড়ীভূত করিয়া তাহার শক্তিহরণ করিতেন। আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারে এখন বীরগণের সে অভ্যাস সভ্যজগতে তিরোহিত হইলেও অসভ্য জাতির মধ্যে রহিয়াছে। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশুগণ গর্জ্জন সহকারে অন্য জন্তুকে আক্রমণ করে। স্বরের দ্বারা যে কেবল ভয়সঞ্চার ও শক্তিহরণ ক্রিয়া সাধিত হয় এমন নয়। বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন ক্রিয়া উৎপাদন করে। যেমন শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভূত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্ত ও বাৎসল্য ভেদে দশপ্রকার রস হৃদয়কে উদ্দীপন করে, সেইরূপ ঐসকল রসের অনুরূপ স্বরেরও বিভিন্নতা রসের সঙ্গে আপনি উপস্থিত হয়। রস হৃদয়ের ভাব, আর স্বর তাহার প্রথম সূচনা করে।

স্বরশক্তি জগতে সর্ব্বত্র অবস্থিত। কি সজীব কি নির্জীব, স্থাবর জঙ্গম সকল বস্তুতেই স্বরশক্তি বিদ্যমান আছে, তবে আমরা তাহা সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিতে পারি না। স্বরশক্তি দ্বারা সাধিত হয় না এমন ক্রিয়া নাই। মার্কিণ দেশীয় একজন বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবং তাহা কুইন্সল্যাণ্ডার (Queenslander) নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, যে তিনি বাদ্যযন্ত্রের স্বরের দ্বারা ৬।৭ তল বৃহৎ অট্টালিকাকেও ভূমিসাৎ করিতে সক্ষম। একমাত্র স্বরশক্তি জগতে অভিনব বস্তুর উদ্ভাবন ও বিদ্যমান বস্তুর সংহার করিতেছে। স্বরশক্তি পুরুষকে স্ত্রীবশে আনিতেছে, ব্রহ্মচারীর ধৈর্য্য-হরণ করিতেছে, শত্রুকে মিত্র ও মিত্রকে শত্রু করিতেছে, শিশুপালনের জন্য স্নেহক্ষরণ করিতেছে, সকলকে বিষয়রসে আকর্ষণ করিতেছে।

আমাদিগের আর্য্য ঋষিগণ অতি প্রাচীনকালে এই স্বরশক্তির প্রভাব উপলব্ধি করেন। তাঁহাদের বেদগানের মহিমাতে যুদ্ধে জয়লাভ, আকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি ও শস্যলাভ, পশুবৃদ্ধি এবং অসভ্যজাতির বশীকরণ সাধিত হইত। ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা অভিজ্ঞতম ছিলেন, তাঁহারা বেদমন্ত্রে ঐ সকল শক্তি দেখিতেন না, মন্ত্রসকলের উচ্চারণে যে যে স্বরের প্রয়োগ হয় তাহারই ক্রিয়াশক্তি ইহা বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য বৈদিক ব্যাকরণে স্বর বিষয়ে যেরূপ বিচার করা হইয়াছে তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না। এইরূপ বোধপ্রাপ্ত মহর্ষিগণ কেবলমাত্র নাদেরই অনুসন্ধান করিতেন, ওঙ্কার প্রভৃতি বীজমন্ত্রের অনুশীলনে বিভিন্ন নাদতরঙ্গ জাগাইয়া তাহার ক্রিয়া লক্ষ্য করিতেন, এবং প্রসন্ন হইয়া শরণাগত ব্যক্তিকে তাহার অভীষ্ট ফলপ্রদ বীজমন্ত্রের উপদেশ দিতেন। বৈদিকমন্ত্রের প্রচলন বন্ধ হওয়ার পর এই বীজমন্ত্রই একমাত্র উপাসনার বস্তু হইল, এবং কোথাও বা বীজমন্ত্র সহ নামমন্ত্র যোজিত হইল। যাহার গায়নের দ্বারা দুঃখ হইতে ত্রাণ হয়, সেই গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা বেদান্তর্ধান কালে প্রথম প্রচলিত হয়, এবং গায়ত্রী বিলুপ্ত স্বরশক্তির অভ্যাসকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল।

যেখানে ভাষাবাক্যে উপাসনা করা হয়, সেখানেও যিনি যে ভাষাতে উপাসনা করুন না কেন, তাঁহার উপাসনার বাক্য যে স্বরে উচ্চারণ করেন তাহাতে ভক্তি প্রেম কাতরতা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। স্বরের ঐ বৈচিত্রতা দ্বারা চিত্ত একাগ্র হয়, হৃদয় প্রেমার্দ্র হয়, ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হয়। ঈশ্বরের মহিমাগান, নামসংকীর্ত্তন, বেদিস্থ আচার্য্যের ধর্ম্মব্যাখ্যান, সর্ব্বত্রই স্বরশক্তির ক্রিয়া—উদ্দেশ্য নীচ প্রবৃত্তি সকল দমন করিয়া প্রেম ভক্তির প্রণয়ন।

কালসহকারে আমাদের বীজমন্ত্রের ঐ স্বরশক্তি আমরা বিস্মৃত

হইয়াছি। উপদেষ্টা ব্যক্তিগণ এদিকে প্রায় শিষ্যের চিত্তাভিনিবেশ আকর্ষণ করেন না, কেবল "জপাৎসিদ্ধিঃ" এই পর্য্যন্ত উপদেশ দেওয়ার ফলে বৌদ্ধ লামাগণের মন্ত্রচক্র ঘুরাণ মত শিষ্য তাহার জপসংখ্যার বৃদ্ধির দিকেই লক্ষ্য রাখেন। আগম কিন্তু উপদেশ দিতেছেন—"শক্তিযুক্তো জপেন্মন্ত্রং ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ"—কুণ্ডলিনীরূপ স্বর-শক্তির সংযোগে মন্ত্রজপ করাই বিধি, কেবল অক্ষর মাত্রের আবৃত্তি-দ্বারা মন্ত্রজপ হয় না।

অধুনা আমাদের ধর্ম্মসংস্কার কল্পে নানামতের অভ্যুত্থান হইতেছে। সনাতন ধর্ম্ম ঠিকই আছে, তবে লৌকিক ব্যবহারে তাহার অপকর্ষ হইয়া আসিতেছে। পুরাকালে সকলেই নিজে আপনার অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। যুদ্ধাদি রাজ্যপালন কার্য্যে নিরত আর্য্যগণ যখন পৃথক্ বর্ণবিভাগে ক্ষত্রিয় হইলেন, তখন তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ভার অপরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই সকল প্রতিনিধি অন্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অধ্যয়ন যজন যাজন তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মে রত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলেন। এইরূপ কৃষি বাণিজ্যাদিতে নিরত আর্য্যগণ বৈশ্যবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইলেন, এবং তাঁহারাও রাজন্যগণের অনুকরণে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। অনার্য্য জাতিরা শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়া আর্য্যদিগের সেবাতে নিযুক্ত রহিলেন, এবং সমাজচ্যুত পতিত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পৌরহিত্য করিতে লাগিলেন। যে সকল দেবযজ্ঞ বা পিতৃযজ্ঞ শাস্ত্রমধ্যে বিহিত হইল, তাহাতেই প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইলেন, এবং ব্রাহ্মণেরাও আপনাদের অনুষ্ঠেয় ঐ সকল যজ্ঞের নিমিত্ত অপর ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিলেন। বৈদিক যজ্ঞের বিনিময়ে যখন পৌরাণিক দেব-যজনের ব্যবস্থা হইল তখনও পূর্ব্বযুগের প্রথা অনুসারে পুরোহিত

প্রতিনিধি চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে এই প্রতিনিধি পদে তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রহ্মতেজ বিশিষ্ট ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা হইত। পৌরহিত্য বংশানুগত হওয়াতেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও পুরোহিত পদে বৃত হইলেন। কালক্রমে পৌরহিত্য বৃত্তি পূর্ব্ববৎ অর্থপ্রদ না হওয়াতে শিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তানেরা অন্যবৃত্তি পরিগ্রহ করিতে থাকিলে, ব্রাহ্মণবংশীয় যে কেহ ঐ পরিত্যক্ত বৃত্তি স্বীকার করিতে লাগিলেন। নিত্য ও নৈমিত্তিক দেবার্চ্চনা শ্রাদ্ধ ও ব্রতাদিতে ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই তাঁহার যাজকত্বে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু ঐ সকল ক্রিয়াকাণ্ড উৎসব মাত্র, তাহা ছাড়া নিত্য ঈশ্বরোপাসনা পৃথক্ কর্ম্ম, সে উপাসনাতে পুরোহিত নিযুক্ত হন না, কুলগুরুর নিকট উপাস্য দেবতা ও উপাস্য মন্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়, এবং উপাসনা নিজে করিতে হয়। কুলগুরু বলিতে 'কুল' অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ গুরুকেই বুঝায়। ব্রহ্মশক্তির পরিচয়ের নামই দীক্ষা, এবং তাহা আণবী শাম্ভবী ও শাক্তী এই ত্রিবিধ দীক্ষাতেই প্রত্যক্ষ হইত। সিদ্ধমন্ত্রী গুরু শিষ্যের কুণ্ডলিনী শক্তিকে নিজশক্তি প্রভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মশক্তির সাক্ষাৎকার করাইতেন, তাহাই শাক্তী দীক্ষা। প্রকৃত আণবী দীক্ষাতে পরমাণুর সাক্ষাৎকার, এবং শাম্ভবী দীক্ষাতে শিবশক্তির পরিচয়, উভয় স্থলেই পরানুগ্রহে সমর্থ যোগসিদ্ধ গুরুর প্রয়োজন। এখনকার প্রচলিত দীক্ষার নাম মান্ত্রী দীক্ষা, এবং তাহার প্রধান অঙ্গ মন্ত্রবিচার, দেবতার অর্চ্চনা, ও মন্ত্রোপদেশ। এই দীক্ষাতেও কুলাভিজ্ঞ গুরুর অধিকার, কিন্তু কুলগুরুর অর্থ গুরুবংশীয় ব্যক্তি যখন হইল তখন হইতেই পুরোহিতের ন্যায় গুরুও আর আগমোক্ত লক্ষণানুসারে বিচার্য্য হইলেন না। অবস্থা এরূপ হইলেও হিন্দু সমাজের পুনরায় বর্ণবিভাগ না

হওয়া পর্য্যন্ত এখনকার ব্রাহ্মণ সন্তানের হস্তেই গুরুত্ব এবং পৌরহিত্য রাখিতে হইবে। আচার্য্য এবং যাজকের জন্য পৃথক বর্ণ নিরূপিত থাকা চাই, এবং তাহাতে পূর্ব্বাবধি ব্রাহ্মণেরই অধিকার চলিয়া আসিতেছে। অন্য বর্ণের কেহই এই বৃত্তির উপযোগী হইবেন না, কারণ তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু বা স্বল্পে সন্তোষ হইবেন না, উপেক্ষা অনাদর ব্যঙ্গোক্তি সহ্য করিতে পারিবেন না। বংশগত গুণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহাতে পুনরায় ব্রাহ্মণের পূর্ব্বতন গুণ পরিস্ফুট হয় তাহার জন্য সমাজকে চেষ্টা যত্ন এবং অর্থব্যয় করিতে হইবে। ষড়ঙ্গ বেদ, স্মৃতি, ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বহুল প্রবর্ত্তিত হইলে তবে উপযুক্ত ব্যক্তি সুলভ হইবে। পূর্ব্বে যে ভার হিন্দু রাজাদিগের উপর বিন্যস্ত ছিল, এখন তাহা সমাজকে বহন করিতে হইবে। সাধন ভিন্ন সিদ্ধি নাই, সাধকের ভার গ্রহণ করিলে অবশ্যই সিদ্ধগুরুও পাওয়া যাইবে।

মন্ত্রোপাসনা ভিন্ন হিন্দুর অন্য উপাসনা কখনই ছিল না এবং এখনও নাই। সেই উপাসনার নিগূঢ় রহস্য এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যৎকিঞ্চিৎ মাত্র এই দর্শনখণ্ডে ব্যক্ত করা গেল। চল্লিশ বৎসর যাবৎ মন্ত্রমার্গের সাধনক্রিয়াতে উপার্জ্জিত জ্ঞান অথবা অজ্ঞান ইহাতে লিপিবদ্ধ হইল। অতঃপর মন্ত্রযোগের সাধনখণ্ডে প্রতিদেবতার মন্ত্রসাধন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। শিক্ষিত বঙ্গ নরনারীর তৃপ্তিলাভেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

কাশীধাম
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ } অবধূত জ্ঞানানন্দ

মন্ত্রযোগ

মন্ত্রযোগের স্থান ও ভাগ।

দেবতা পূজাই আজকাল হিন্দুগৃহস্থের উপাস্য ধর্ম্ম। সকল পূজাতেই পঞ্চশুদ্ধির আবশ্যক। স্থানশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি, দেবশুদ্ধি ও মন্ত্রশুদ্ধি, এই পঞ্চশুদ্ধি। ইহাদের মধ্যে আত্মশুদ্ধি সর্ব্বপ্রধান। আত্মশুদ্ধি না হইলে কোন পূজা সিদ্ধ হয় না—

"নাদেবো পূজয়েদ্দেবং দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।"

দেবতা না হইয়া দেবতার পূজা করিতে নাই। ভূতশুদ্ধির দ্বারা মর্ত্ত্যদেহবিশিষ্ট জীব আপনাকে দেবতাময় করিবেন, তবে তিনি দেবতা পূজাতে অধিকারী হইবেন। ভূতশুদ্ধি করিতে গেলে কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে উঠাইতে হয়, সুষুম্নাপথে মূলাধারাদি ষট্‌চক্র ভেদ করিতে হয়। আগমশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপ বিধি দেওয়া আছে—যাহা আছে, তাহাও একস্থানে পাওয়া যায় না। উপযুক্ত সদ্‌গুরুর উপদেশ ভিন্ন কেহ ভূতশুদ্ধি বুঝিতে পারেন না। কুণ্ডলিনীর ক্রমমার্গ জ্ঞাত না হইলে, মন্ত্রমার্গে দেবতাপূজা বা মন্ত্রযোগের অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

ঘড়ির যেমন স্প্রীং—জীবদেহের কুণ্ডলিনীও সেইরূপ। স্প্রীংএর দম থাকিলে ঘড়ি বন্ধ হয় না, কুণ্ডলিনীর নিয়মিত চিন্তাতে অকালমৃত্যু হয় না—আধিব্যাধি স্পর্শ করে না—প্রারব্ধও খণ্ডন হয়, না হয় স্বল্প ভোগের উপর দিয়া যায়। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব শিষ্যভাবাপন্ন রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

"আত্মভাবনয়া সাধো নিত্যমন্তর্ম্মুখং স্থিতঃ।
বজ্রধারাপি তে রাম পতিতা যাতি কুণ্ঠতাম্॥"

'হে সাধো রামচন্দ্র! যদি আত্মভাবনাতে রত হইয়া নিত্য অন্তর্ম্মুখচিত্তে অবস্থান কর, তাহা হইলে তোমার উপর বজ্রধারা পতিত হইলেও তাহা ব্যর্থ হইবে।' কুণ্ডলিনীর ভাবনাই আত্মভাবনা—কুণ্ডলিনী জীবদেহে মনোরূপে অবস্থিত—কুণ্ডলিনী জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার এবং বাক্য উচ্চারণের মূলযন্ত্র—সেই জন্য কুণ্ডলিনীর চিন্তা করিতে গেলে আত্মচিন্তা করা হয়, মন অন্তর্ম্মুখী হয়, তখন ঋষিবাক্যমত প্রারব্ধ খণ্ডন হয়। কেবল মন্ত্রজাপীর জন্য নয়—অথবা কেবল হিন্দু-জাতির জন্য নয়—শিক্ষিত এবং বিচারকুশল সর্ব্বজাতীয় নরনারীর জন্য কুণ্ডলিনীর পরিচয় অবশ্য প্রয়োজন।

জন্মান্তরের সুকৃতি ও যোগানুষ্ঠানজনিত ঈশ্বরে পরাভক্তি চিত্তে আজন্ম রূঢ় থাকিলে, কেবল ভক্তিযোগ দ্বারা সমাধিযোগ আসিতে পারে। যাহার মন সর্ব্বদা ঈশ্বরে অর্পিত, যাহার ইন্দ্রিয়গণ কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আপনার বলিয়া যাহার কিছুই নাই, সেই মহাপুরুষের মন্ত্রজপের কি প্রয়োজন? হঠযোগের কি প্রয়োজন? ধ্যান ধারণা সমাধি অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন? কোন বাসনা না থাকাতে নিশ্বাসবায়ু সহজেই মন্দীভূত—জনসঙ্গ বা বিষয়সঙ্গ তিরোহিত হইলে তাঁহার চিত্তে কেবল ঈশ্বরের মহিমা বিরাজ করে, অঙ্গ শিথিল হয়, গাত্র পুলকাঞ্চিত হয়, নেত্র প্রেমাশ্রুধারা বর্ষণ করে, তিনি আপনাকে ভুলিয়া যান, জগৎ ভুলিয়া যান, তখন চিত্ত ও পবন উভয়ের লয় হয়। সাকার উপাসকের এই লয় প্রথমে ধ্যেয়মূর্ত্তিতে হইয়া থাকে, তখন লয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়া কথিত হয়।

যাহারা জন্মান্তরের তীব্র সাধনা না থাকাতে ঐরূপ পরাভক্তি লইয়া

জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের কোনও এক যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে হয়। সেই সাধনার চরম ফল রাজযোগ। রাজযোগ পৃথক্ যোগ নয়, লয়াবস্থা বা সমাধির নাম রাজযোগ, এবং জীব ও ঈশ্বরে অভেদজ্ঞানই উহার লক্ষণ। ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, মন্ত্রযোগ ও জ্ঞানযোগ—সকল যোগমার্গই বিধিপূর্ব্বক সেবিত হইলে ঐ অভেদ জ্ঞান প্রসব করে। মন্ত্রযোগে অন্যান্য যোগের কিছু কিছু ক্রিয়া আছে, সেই জন্য প্রথম ভূমির সাধকের পক্ষে মন্ত্রযোগ বিহিত হইয়াছে, এবং গৃহস্থ সাধকের জন্য মন্ত্রযোগই প্রশস্ত। ভক্তিযোগের মূল বিশ্বাস —বিশ্বাস না থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না—শ্রদ্ধা না হইলে ভজন বা সেবা হইতে পারে না—

"ভজ ইত্যেষ ধাতুর্বৈ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী॥"

'ভজ' ধাতুর অর্থ সেবা, সেইজন্য প্রাজ্ঞগণ ভূয়সী (অর্থাৎ বারম্বার এবং অধিকতর) সেবাকে ভক্তিশব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সেবা কায়িক বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ—

"ভজনং ভক্তিরিত্যুক্তা বাঙ্মনকায়কর্ম্মভিঃ॥
সত্যঃ সর্ব্বগ ইত্যাদি শিবস্য গুণচিন্তনা।
রূপোপাদানচিন্তা চ মানসং ভজনং বিদুঃ॥
বাচিকং ভজনং ধীরাঃ প্রণবাদিজপং বিদুঃ।
কায়িকং ভজনং সদ্ভিঃ প্রাণায়ামাদি কথ্যতে॥"

বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা ভজন অর্থাৎ সেবাকে ভক্তি বলা হয়। সেই মঙ্গলময় ঈশ্বর একমাত্র সত্য, এবং তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত, এইরূপ গুণ চিন্তাসহ ঈশ্বরের গুণানুরূপ মূর্ত্তির চিন্তা করার নাম মানসিক ভজন। ঐরূপ চিন্তাসহ প্রণবাদি মন্ত্রের জপকে (এবং স্তব কবচ মাহাত্ম্য পাঠ

ও নামসংকীর্ত্তনকেও) বাচিক ভজন বলা হয়; এবং প্রাণায়ামাদি যোগমুদ্রা ও পুষ্পাদি উপচার প্রদানরূপ কর্ম্মকে কায়িকভজন বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রীতির জন্য দেবতা প্রতিষ্ঠা, সেতু ও আরাম প্রদান, কূপাদি খনন, দরিদ্রদিগকে অন্নাদি দান, এবং অন্য সদনুষ্ঠান সকল কায়িক ভজনের অন্তর্গত। এ সমস্ত ভক্তির ক্রিয়া মন্ত্রযোগেও বিহিত। মন্ত্রযোগেও ঈশ্বরের স্বরূপচিন্তা, মূর্ত্তিধ্যান, মন্ত্রজপ, প্রাণায়াম ও ন্যাসাদি আছে। ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানে বিশ্বাসের হানি হইলে যোগভঙ্গ হয়—নাস্তিকতা আসিয়া পড়ে।

আমি কর্ত্তা নই, কেবল কর্ম্মের নিমিত্ত মাত্র—এইরূপ বিশ্বাস যাঁহার চিত্তে দৃঢ় হইয়াছে, যিনি সর্ব্বদা আপনাকে ঈশ্বরের ক্রীড়া পুত্তলিকা মনে করেন, এবং সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন—তিনিই কর্ম্মযোগের প্রকৃত অধিকারী। যতক্ষণ জীব কাম ও ক্রোধের বশীভূত থাকে, ততক্ষণ সে আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, অন্ততঃ যে সকল কর্ম্মে পৌরুষ প্রকাশ বা যশোলাভের সম্ভাবনা আছে সে সকল কর্ম্মে ত বটেই—আর ইষ্টফল লাভ না হইলে অথবা অনিষ্টের উৎপত্তি হইলে তখন অপরের উপর দোষারোপ করিবার সুযোগ থাকে ত ভাল, নচেৎ নিজের বা পরিজনের ভাগ্যকে নিন্দা করে, কিম্বা জ্যোতিষী মহাশয়কে কোষ্ঠী দেখাইয়া গ্রহ বেচারিকে দোষী করে। এই অবস্থায় কর্ম্মযোগ হইতে পারে না। ভক্তিযোগের ন্যায় কর্ম্মযোগেও ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক। হঠযোগ বা মন্ত্রযোগ ভিন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। হঠযোগে লয়াবস্থার দ্বারা, এবং মন্ত্রযোগে নাদানুভূতি দ্বারা, ঐ বিশ্বাস আনীত হয়। হঠযোগের অধিকারী এখন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ'—হঠযোগীর শুক্রপাত হইলে মৃত্যু সংঘটিত

হয়, শুক্ররক্ষা হইলে যোগসিদ্ধি এবং দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। প্রবল কলির ব্রহ্মচর্য্যবিহীন জীবের সন্তান বাল্যাবস্থাতেই শুক্রক্ষরণদোষে দূষিত হয়, তাহারা কখনই হঠযোগের অধিকারী হইতে পারে না। বিশেষতঃ যোগমঠে থাকিয়া উপযুক্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে হঠযোগ সাধন করিতে হয়। অতিভোজন, নিষিদ্ধ ভোজন, কায়িক পরিশ্রম, বহুভাষণ, প্রাতঃস্নানাদি নিয়ম, জনসঙ্গ, এবং কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হওয়া হঠযোগীর নিষিদ্ধ। ঐ সকল অহিত সেবাতে নানাপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়, মৃত্যুও ঘটিতে পারে। গৃহস্থের পক্ষে—বিশেষতঃ বিবাহিত ব্যক্তির, অথবা যাঁহাকে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় তাঁহার—হঠযোগ গ্রহণ নিষিদ্ধ।

জ্ঞানযোগ প্রকৃত সন্ন্যাসীর জন্যই বিহিত। যিনি বাল্যে বিদ্যোপার্জ্জন, যৌবনে অর্থোপার্জ্জন এবং দারাপত্যের রক্ষণ করিয়াছেন, এবং ন্যায়পথে নিয়মিত বিষয়ভোগ করিয়া পরে বিষয়ের অনিত্যতা ও ভোগস্পৃহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দর্শনে তৃষ্ণাক্ষয়কে তাহার পরমৌষধ জ্ঞানে বৈরাগ্যবান্ হইয়াছেন—সেই বিবেকী—ভোগবিতৃষ্ণ পুরুষ জ্ঞানবিচারের অধিকারী। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় বিষয়ের আকর্ষণে পড়িবার সম্ভাবনা আছে, সেই পতন নিবারণের জন্য তাঁহাকেও ধ্যান ধারণা সমাধির অনুষ্ঠান করিতে হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হইয়াছে, তিনিই কর্ম্মসন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিতে সক্ষম।

এই যে কর্ম্মসন্ন্যাস বলা হইল, তাহা কি? কর্ম্ম কি, তাহার সন্ন্যাস কি, তাহাতে জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে কি না, এই সকল প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। সৃষ্টি যখন অনাদি, প্রলয়ের পর রূপান্তরে পুনঃ প্রকাশিত হইলেও পূর্ব্ব সর্গের ভাব লইয়াই নূতন সৃষ্টির কলেবর, তখন জীবও অনাদি মানিতে

হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবের কর্ম্মও অনাদি আসিয়া পড়ে। একমাত্র ব্রহ্মপ্রকৃতিই যে জীবভাবে অবস্থিত হইয়া এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, তাহা গীতাতে শ্রীভগবান্ নিজেই বলিতেছেন। যাহা ভগবানের পরা প্রকৃতি, তাহার ক্ষয় বা পরিণাম ঘটিতে পারে না, এবং সেই ব্রহ্মপ্রকৃতিময় জীবের কর্ম্মবন্ধনও ঘটিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার কর্ম্মত্যাগই বা কোথায়? তিনি সর্ব্বদাই মুক্তাত্মা। তুমি আমি যে জীব, তাহা কিন্তু ঐ পরাপ্রকৃতি জীব নয়, অথচ তাহা হইতে ভিন্নও নয়। তিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়াও আমাদিগের হইতে পৃথক্—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

গীতা ৯ অধ্যায়।

"জগতের স্রষ্টা আমি আমার অব্যক্ত কারণমূর্ত্তিদ্বারা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছি। চরাচর ভূতগণ আমার সেই কারণ শরীরে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু আমি তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিত নহি। আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, সুতরাং সেই ভূতগণও আমাতে অবস্থিত নয়। আমি তাহাদিগের ধারণ ও পালন করিলেও কিন্তু ভূতগণমধ্যে অবস্থিতি করি না, ইহাই আমার ঐশী শক্তি।" ভগবানের পরা প্রকৃতিই তাঁহার কারণ শরীর, এবং তাহাই জগৎকে সৃজন করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। সেই কারণরূপী জীবাত্মা অহঙ্কারশূন্য বলিয়া তাঁহার সৃষ্ট ভূতগণে নির্লিপ্ত ভাবে রহিয়াছেন—তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন না। আমরা সেই কারণাত্মার কল্পিত ভূতগণ, কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ আমাদের ভৌতিক দেহমধ্যে আবদ্ধ ও লিপ্ত রহিয়াছি।

আমাদের অহঙ্কারজনিত কর্ম্মপাশ আমাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন সেই অহঙ্কার বিগলিত না হয়, ততদিন অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত কর্ম্মপরম্পরা আমাদিগকে ত্যাগ করিবে না। যখন আমরা আপনাকে ভগবানের পরাপ্রকৃতিরূপ নির্লিপ্ত নিরহঙ্কার কারণশরীর হইতে অভিন্ন জানিব তখনই আমাদের কর্ম্মসন্ন্যাস হইবে। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীব ও তাহার কর্ম্ম সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়, সেই জন্যও জীবের কর্ম্মত্যাগের অধিকার নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে শ্রীভগবানের মুখে বলা হইয়াছে—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥

"পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাসৃজনের সঙ্গে যজ্ঞসৃজন করিয়া তৎকালে প্রজাগণকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধিলাভ করিবে, এই যজ্ঞ তোমাদের অভিলষিত ভোগাদি ফল প্রদান করুক।" এখানে ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বরচিত গীতাভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে প্রজা অর্থে 'ত্রয়োবর্ণাঃ'—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ, (কারণ শূদ্রের ত যজ্ঞ করিবার অধিকার নাই, সুতরাং প্রজাপতি যজ্ঞের সহ শূদ্রেরও সৃজন করিয়াছিলেন ইহা ভাষ্যকার শঙ্কর সঙ্গত মনে করেন নাই)। শ্রীধর স্বামীও 'সহযজ্ঞাঃ' কথার অর্থ 'যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্তে ইতি সহযজ্ঞা যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ'—'যাহারা নিত্য যজ্ঞযুক্ত, সুতরাং যাহাদের যজ্ঞে অধিকার আছে, সেই ব্রাহ্মণাদি প্রজা' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শাঙ্করভাষ্যের অনুগমন করিয়াছেন। কিন্তু স্বামী শেষে বলিতেছেন, 'অত্র চ যজ্ঞগ্রহণম্ আবশ্যক কর্ম্মোপলক্ষণার্থম্'—'এস্থলে যজ্ঞ শব্দের গ্রহণ দ্বারা আবশ্যক কর্ম্মমাত্রের জ্ঞাপক বা নিদর্শন বুঝিতে হইবে।' তবেই বুঝা গেল যে স্বামী ভাষ্যের মতানুবর্ত্তী হইয়াই 'সহযজ্ঞ' শব্দের

অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে এস্থলে 'যজ্ঞ' অর্থে বৈদিক যাগক্রিয়া মাত্র বোধ করেন নাই, জীবের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম মাত্রই এখানে যজ্ঞ শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহা শেষে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রজাপতি যজ্ঞের সহ প্রজা সৃজন করিয়াছেন, সমগ্র জীবজগৎ সেই প্রজা, সেই জীবগণের স্বাভাবিক কর্ম্মই ঐ যজ্ঞ, এবং জীবগণ নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও বাসনার অনুরূপ ভোগাদি লাভ করিবে, ইহাই শ্লোকের বক্তব্য ভাব। শ্রীধরস্বামীও বলিতেছেন যে এস্থলে কাম্যকর্ম্মের প্রশংসা সঙ্গত না হইলেও, কেবল কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই যে শ্রেষ্ঠ তাহাই সাধারণতঃ বুঝান হইয়াছে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন প্রজাসৃজন হয়, তখনকার এই কথা। জিজ্ঞাসা করি তখন কি প্রজাগণের বর্ণবিভাগ হইয়াছিল—না তাহা প্রজাগণের গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে পরে নিরূপণ করা হয়? গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ নিজেই বলিতেছেন—'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।'—"ঈশ্বর আমি মনুষ্যলোকে চারি বর্ণের সৃজন করিয়াছি—তাহাদিগের গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ অনুসারে চারিবর্ণের উৎপাদন করিয়াছি। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ। যাহাদিগের সত্ত্বগুণ অধিক, এবং অপর দুই গুণ অল্প, তাহাদিগের শম দম তপস্যা তিতীক্ষা প্রভৃতি শাস্তকর্ম্মে প্রবৃত্তি হেতু তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়াছি। যাহাদিগের রজোগুণের ভাগ অধিক, তদপেক্ষা সত্ত্ব গুণের ভাগ কম, এবং তমোগুণ অতি অল্প, তাহাদিগের শৌর্য্য যুদ্ধ প্রজাপালনাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি—তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়াছি। যাহাদের সত্ত্বগুণ আরও কম, সত্ত্বাপেক্ষা তমোগুণের ভাগ অধিক, এবং রজোগুণ প্রধান, সেই রজঃ ও তমঃ প্রধান ব্যক্তি-গণের কৃষি বাণিজ্য পশুপালন ও ধনবৃদ্ধি প্রভৃতি কর্ম্মে প্রবৃত্তি হেতু

তাহাদিগকে বৈশ্য করিয়াছি। যাহাদের তমোগুণই প্রধান, রজোগুণ খুব কম, এবং সত্বের বিকাশ লক্ষিত হয় না, সেই তমঃ প্রধান মনুষ্যেরা আলস্যাদি দোষে অভিভূত থাকে, তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কোন কর্ম্মে অগ্রসর হয় না, ভরণপোষণের জন্য তাহাদিগকে অন্য তিন বর্ণের আশ্রয় লইতে হয় এবং তাঁহারা ইহাদিগকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন ইহারা জীবিকার জন্য তাহাই করিতে বাধ্য হয়, সেই অধম-দিগকে শূদ্র করিয়াছি।"

ভগবানের এই বাক্যে প্রমাণ হইতেছে যে বৈদিক যজ্ঞ সাধনের অধিকারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির পৃথক্ সৃজন হয় নাই। মনুষ্য সৃজনের পর তাহাদিগের গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারি বর্ণের পৃথক্ বিভাগ হইয়াছে, উৎপত্তি কালে এই বর্ণবিভাগ ছিল না। বিশেষতঃ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকের 'সহযজ্ঞ' ও 'প্রজা' শব্দদুইটির শাঙ্কর ভাষ্যের ঐরূপ সংকীর্ণ ব্যাখ্যাতে আরও দোষ ঘটে। যিনি সৃজন কর্ত্তা তাঁহাকেই শঙ্কর প্রজাপতি বলিতেছেন। সেই প্রজাপতি যাহা কিছু সৃজন করেন সে সমস্তই তাঁহার প্রজা। দেবতা, মনুষ্য, দানব, রাক্ষস, এবং অন্য সমস্ত জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিদ্ সকলই তাঁহার প্রজা। 'প্রজা স্যাৎ সন্ততৌ জনে'—সন্ততি ও জন এই দুই অর্থে প্রজাশব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। পিতার বংশ তাঁহার সন্ততি, আর উৎপন্ন ব্যক্তিমাত্রের নাম জন। প্রজাপতি এই স্থাবর জঙ্গম জগতের আদি পিতা—তাই তাঁহার আর এক নাম পিতামহ—জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার সন্ততি বা প্রজা। তিনি সেই প্রজা সৃজনের সঙ্গে তাহাদের প্রত্যেকের কর্ম্মও সৃজন করিয়াছেন, এবং সেই সেই কর্ম্মই ঐ প্রজাগণের যে বৃদ্ধির হেতু তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ শ্লোকে যজ্ঞশব্দের অর্থ যে সামান্যতঃ কর্ম্ম-

মাত্র তাহা শ্রীধরস্বামী ঠিকই বলিয়াছেন। যেমন ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি যখন প্রথম রচিত ও গীত হইয়াছিল, তখন প্রাকৃতিক মহিমার স্তুতি-দ্বারা আর্য্যগণ নিজেদের অভীষ্টপূরণ মাত্র কামনা করিয়াছিলেন, অথবা কখনও বা তাঁহাদের অভিলষিত বৃষ্টি বা শস্য বা জয় লাভ জন্য তাঁহাদের বুদ্ধিগোচর ঐ সকল বস্তুর প্রদাত্রী শক্তিকে ঐ সকল স্তুতি-বাণী দ্বারা প্রসন্ন করিয়াছিলেন। তখন ঐ স্তুতিবাণী দ্বারাই তাঁহাদের 'যজ্ঞ' সাধিত হইত। পরবর্ত্তী কালে ঐ স্তুতিবাণী সহযোগে পশুহত্যা, অগ্নিতে বস্তু সম্প্রদান, এবং অন্নাদি উৎসৃজন ক্রিয়া যজ্ঞনামে অভিহিত হইল—দেবপূজা কার্য্য এখন যজ্ঞশব্দের ব্যুৎপত্তি হইল। যজ্‌ ধাতু হইতে যজ্ঞশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং যজ্‌ধাতুর বর্ত্তমান অর্থ দেবপূজা। কিন্তু বোধ হয় যে 'দেব' ও 'পূজা' এবং 'দেবপূজা' এই সকল ভাবের উন্মীলন হইবার অনেক পূর্ব্বে যজ্‌ ধাতু ভাষামধ্যে পরিগণিত হইয়া-ছিল, এবং হয়ত তখন ইহার অন্য অর্থ ছিল। ধাতুগুলি মনুষ্যলোকের আদিবাক্য—তখন ধাতুমাত্র উচ্চারণ দ্বারা লোকে মনোভাব প্রকাশ করিত, ধাতুনিষ্পন্ন শব্দ তখনও গঠিত হয় নাই। সেই হেতু মনুষ্য লোকের আদিম ধাতুগুলি মূলে একজাতীয় মনুষ্য মধ্যে অদ্যাবধি এক অর্থে প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে।

ভগবানের পরাপ্রকৃতিই সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি রূপে আবির্ভূত হন। তিনি যে প্রণালীতে প্রজা সৃজন করিলেন, তাহাতে প্রজা-গণের কর্ম্মসৃষ্টিও সাধিত হইল। আগম মতে পরাপ্রকৃতি নাদরূপিণী, নাদ অব্যক্ত অনাহত ধ্বনি মাত্র। অব্যক্ত নাদ বর্ণাকারে বিশিষ্ট ধ্বনিরূপে পরিণত হয়, তখন তাহার নাম শব্দব্রহ্ম। বর্ণাবলীরূপে পরিণত ব্যক্ত নাদকলাগুলি এই জগৎ সৃষ্টির উপাদান স্বরূপ। সেই নাদকলা সমূহের মিশ্রণ ও সংমিশ্রণ হইতে জগতের স্থাবর জঙ্গম,

দেবতা মনুষ্য ও নিকৃষ্ট প্রাণী—সমস্ত প্রজাবর্গের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা কিছু আছে বা হইতেছে, সমস্তই নাদের বিকার মাত্র। নাদের ক্রিয়া দুই প্রকার—আত্মাভিমুখে কর্ষণ, তাহাকে আগম 'সঙ্কোচ' বলেন; আর ব্যাপ্তি অর্থাৎ আকাশ মধ্যে প্রসরণ বা বিস্তৃতি, তাহাকে আগম 'বিকাশ' বলেন। এই সঙ্কোচ ও বিকাশ ক্রিয়া সর্ব্বজগতে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। প্রাণীদেহে এই ক্রিয়া প্রধানতঃ প্রাণবায়ুর ত্যাগ ও গ্রহণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। উদ্ভিদ্‌গণ রসাকর্ষণ ও মলপরিত্যাগ দ্বারা, এবং শাখা পত্রাদি বিস্তার দ্বারা, সেই সঙ্কোচ ও বিকাশ ক্রিয়া সাধন করিতেছে। আকর্ষণ ও প্রসরণ ভিন্ন অন্য ক্রিয়া সৃষ্টিকালে উদ্ভূত হয় নাই, এবং পরে যে সকল ক্রিয়া হইতে লাগিল তাহার মূল ঐ আকর্ষণ ও প্রসরণ। মনুষ্য দেবতাদি শ্রেষ্ঠ জীবে 'আকর্ষণ' বুদ্ধিরূপে কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতেছে, এবং 'প্রসরণ' মনোরূপে বিষয় সমূহে ধাবিত হইতেছে। নিকৃষ্ট সৃষ্টিতে সঙ্কোচ বা আকর্ষণ 'গ্রহণ'-রূপে, এবং বিকাশ বা প্রসরণ 'ত্যাগ'রূপে ক্রিয়া নিষ্পত্তি করিতেছে। মন্ত্রশাস্ত্রের 'হংসঃ' এই 'অজপা' মন্ত্র ঐ বিকাশ ও সঙ্কোচের, ত্যাগ ও গ্রহণের, যন্ত্র স্বরূপ। জীবমাত্রে না জানিয়াও এই হংস-মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিতেছে। জপ না করিলেও, অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত জপ না হইলেও যাহার জপ স্বভাবসিদ্ধ, তাহারই নাম 'অজপা'। 'হং' এই মন্ত্র জপে শ্বাস বহির্গত হইতেছে, এবং 'সঃ' এই মন্ত্রে শ্বাস অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতেছে। জীবদেহ ছাড়া অন্যত্র গ্রহণ ও বিসর্জ্জন ক্রিয়া দ্বারাই হংসের ক্রিয়া হইতেছে। যাহাতে এই হংস নাই এমন বস্তুর সৃজন হয় নাই, এবং তাহা জগতেও নাই। 'হং' ধ্বনিতে জগৎ প্রকৃতি হইতে নির্গত হইয়াছে, এবং 'সঃ' ধ্বনিতে পুনরায় তাহাতে বিলীন হইবে। প্রজাগণ সকলেই হংসরূপে নাদকলা সমূহের লীলা মাত্র—এবং আকর্ষণ

ও বিসর্জ্জন, সেই হংসাত্মার মৌলিক ক্রিয়াদ্বয়, প্রজাগণের উৎপত্তির সঙ্গে তাহাদের কর্ম্মরূপে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহাই 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ' শ্লোকের আধ্যাত্মিক অর্থ। যিনি সাধন বলে আপনাকে হংসরূপে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর অহঙ্কারজনিত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হইতে পারে না—তখনই কেবল তাঁহার কর্ম্ম সন্ন্যাসের উপযুক্ত অবস্থা। ব্রহ্ম-শক্তিই সর্ব্বত্র আকর্ষণ ও বিসর্জ্জন রূপ কর্ম্ম করিতেছেন, তিনিই একমাত্র কর্ত্রী, আমি স্বতন্ত্র কর্ত্তা কখনই নহি—এই জ্ঞানে সেই পরাশক্তিতে সমস্ত ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সমর্পণের নামই 'কর্ম্মসন্ন্যাস' অর্থাৎ কর্ম্মকে তাহার প্রকৃত আধারে সংস্থাপন। কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়ার নাম কর্ম্মসন্ন্যাস নয়, এবং গীতাতে ভগবানও তাহা বলেন নাই। এইরূপ ব্যুৎপত্তি হেতু সন্ন্যাসীর হংস ও পরমহংস আখ্যা হইয়া থাকে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাসংখ্যা যাহা ছিল, সেই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ভাবের বৃদ্ধি হইতেই প্রজার বৃদ্ধি। যে সকল বস্তু এখন জগতে উৎপন্ন হইতেছে, সে সকল যে আবহমান কাল হইতে ঐরূপে বিদ্যমান আছে তাহা নয়, এবং পরেও যে তাহারা ঐরূপে থাকিবে তাহাও নয়। আমাদের আকাঙ্ক্ষা হইতে বিভিন্ন নূতন বস্তু সকল কাল সহকারে উৎপন্ন হইতেছে, এবং কালে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন বস্তুরূপে আবির্ভূত হইবে। যাহা আমাদের আকাঙ্ক্ষা তাহাই সেই ব্রহ্মপ্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। পূর্ব্বসৃষ্টির সংস্কার নিবন্ধন তাঁহাতে সত্ত্বাদি গুণের আবির্ভাব হয়। নাদময়ী মূলাপ্রকৃতির নাদতরঙ্গের স্বচ্ছত্ব মলিনত্ব হইতে গুণত্রয়ের পৃথক সত্ত্বা। সেই আদি গুণত্রয়ই তাঁহার নিজ সন্ততি। গুণত্রয় হইতে শক্তিত্রয় সমন্বিত মূর্ত্তিত্রয় রূপে প্রজাপতি ঈশ্বরের আবির্ভাব, এবং তাঁহারই সংকল্প বা বাসনা হইতে

ভূতজগতের সৃষ্টি। ভূতজগতের অধিবাসীগণের বাসনা হইতে অন্য সঙ্কল্প পুরুষগণ তাহাদের সন্ততিরূপে উৎপন্ন হইতেছে, এবং ভোগাভিলাষ পূরণের জন্য নূতন ভোগ্য পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে। আমাদের জন্মান্তরীয় সংকল্পই আমাদের পুত্রাদিরূপে আসিতেছে। আদি সংকল্পাত্মা প্রজাপতি হইতে ভূতজগতের জীব সমষ্টি লইয়া এক বিরাট্ কায়ব্যূহ বা সমষ্টিদেহ রচিত হইয়াছে—কোন অংশে তাহার বৃদ্ধি বা বিস্তার হইতেছে, কোথাও বা সঙ্কুচিত হইতেছে। এ সমস্তই নাদময়ী ব্রহ্মশক্তির নাদকলা সমূহের স্পন্দন হেতু আকর্ষণ ও বিসর্জ্জন ক্রিয়ামাত্র। ব্রহ্মাকাশে উদিত বাসনা নাদময়ী ব্রহ্মশক্তিরূপে স্ফুরিত হইতেছে, সেই জন্য ব্রহ্মাকাশের নাম সনাদন, যাহা সনাদন তাহাই সনাতন। সেই নাদশক্তি বিভক্ত হইয়া ত্রিশক্তিরূপিণী ত্রিদেবতার উৎপাদন করিতেছেন। ত্রিদেবের মধ্যে স্ফুরিত নাদকলা পুনঃ প্রসারিত ও বিভক্ত হইয়া ভূতজগৎরূপে স্পন্দিত হইতেছে। ভূতজগতের অন্তর্গত এবং তাহার প্রাণস্বরূপ বাসনাময়ী নাদকলা সমূহ পুনঃ স্পন্দিত প্রসারিত ও বিভক্ত হইয়া নূতন পদার্থের ও নূতন জীবের সৃষ্টি করিতেছে। জগতের মূল নাদ, জগতের উপাদান নাদ, এবং জগৎ নাদের স্পন্দন ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়; সেই স্পন্দন রোধ হওয়ার সঙ্গেই জগতের প্রলয়, এবং ব্যক্তিগত মৃত্যু। নাদের বিভিন্ন বিকাশ হইতেই বিভিন্ন মন্ত্র, মন্ত্রের সাধন সেই নাদের অনুসন্ধান, এবং মন্ত্রের সিদ্ধি আপনাকে নাদ সমুদ্রে মিশাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়—'অপুনর্ভবায়' পুনঃ পুনঃ দেহধারণ রূপ সংসৃতি নিবারণের জন্য।

আমারা নানা দেবতার উপাসনা করি বলিয়া অন্যধর্ম্মাবলম্বীগণ আমাদের ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন। আমাদের উপনিষদাদি শাস্ত্রে

ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, এবং জগৎ ব্রহ্মময় প্রতিপাদিত হইলেও, উপনিষৎ মধ্যেই আমাদের উপাস্য দেবতাগণের মন্ত্র তন্ত্র রহিয়াছে। স্বর্গাদি ফলকামনা করিয়া পশুহত্যাদি ঘটিত বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা কখনই শান্তিরসের আস্বাদন হইতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা কখনই ভোগের দ্বারা প্রশমিত হয় না, ঐশ্বর্য্য কখনই চিরস্থায়ী হয় না। দীর্ঘকাল ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠানের পরিণামে আর্য্যগণ যখন এইরূপ প্রবোধিত হইলেন, সেই প্রবুদ্ধাবস্থাই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসব করিবার জন্য উপনিষদ্‌রূপ গর্ভধারণ করিল। আদি উপনিষদ্‌গুলিতে ব্রহ্মতত্ত্ব অবধারণ ও জগতের অনিত্যতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল জ্ঞানকাণ্ড আলোচনার ফলে বীতরাগ বিবেক সম্পন্ন সন্ন্যাসধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। পরবর্ত্তী উপনিষদ্ মধ্যে সন্ন্যাসীকে ব্রহ্মান্বেষণ মার্গে দৃঢ়নিবিষ্ট করিবার জন্য যোগোপদেশ বর্ণিত হইল। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড বা যোগোপদেশ কখনই সাধারণ লোকের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এদিকে উপনিষদ্ প্রাদুর্ভাবের পরিণামে এবং বৌদ্ধ ও পাষণ্ড সম্প্রদায়ের বিস্তার হেতু, বেদমন্ত্রগুলি উপাসনা ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছিল। এই সময়ে যে সকল উপনিষদ্ রচিত হইল তাহাতে জ্ঞান যোগ ও ক্রিয়ানুষ্ঠান একত্র সন্নিবিষ্ট হইল। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ঐ সকল উপনিষদ্ মধ্যে ব্রহ্মশক্তির নানাভাবের তত্ত্ব নিরূপণ করিলেন, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের সাধনোপযোগী বীজমন্ত্র উদ্ধার করিলেন; ঐ সকল মন্ত্রের যে সাধন পদ্ধতি সন্নিবিষ্ট করিলেন তাহাতে ব্রহ্মের ও ব্রহ্মশক্তির পরিচয়, এবং আপনাকে সেই শক্তিতে শক্তিমান্ করিবাব প্রকৃষ্ট যোগোপদেশ বর্ণনা করিলেন। এই সকল শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বনে তন্ত্র নামে আর এক আগম শাস্ত্র প্রকটিত হইল। প্রথমে আগম বেদকেই বুঝাইত, তত্ত্বজ্ঞানের আধার উপনিষদ্ গুলিও আগম, এবং তন্ত্র শেষোক্ত আগমের সাধনোপযোগী প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়াই

আগম নামে অভিহিত হয়। তন্ত্র প্রচলিত হইবার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সাধকমণ্ডলীমধ্যে আগমোক্ত দেবদেবীর পূজারূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমাদের পুরাণগুলির মধ্যে যে সমস্ত দেবতার্চ্চন বিধি ও মন্ত্রাদি রহিয়াছে, সে গুলিও আগমোক্ত বিধি ও মন্ত্র, এবং পুরাণের তত্তৎ অংশ তন্ত্রমধ্যে পরিগণিত না হইলেও তন্ত্র স্বরূপ। নানা দেবতার উপাসনা সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলিতেছেন—

অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্।
স্বভাবাজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মসঙ্কুলে॥
তত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চ্চাজপসাধনে।
শ্রেয়স্তদেব জানন্তু যত্রৈব দৃঢ় নিশ্চয়াঃ॥
অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া॥

"যাহাদের জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব জ্ঞান হয় নাই, যাহারা সর্ব্বদা কামনাপূরণের জন্য ব্যগ্র সেই সকল মনুষ্যের স্বভাবতঃ নানাবিধ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা (ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া) ধ্যান পূজা ও জপ করিতে ভালবাসে, এবং যাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ঐ সকল পূজাদি করিলে তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে—আমার (সদা-শিবের) ইচ্ছা যে তাহারা ঐ ধ্যান পূজা ও জপকে তাহাদের মঙ্গলজনক বলিয়াই জানুক। তাহাদের হিতের জন্যই আমি বহুপ্রকার নাম ও রূপ কল্পনা করিয়াছি, এবং তাহাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য আমি নানাবিধ উপাসনার বিধিও বলিয়াছি।" কিন্তু নানা নামে এবং নানা ভাবে উপাসনা করিলেও সেই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয় তাহা মহানির্ব্বাণ বলিয়াছেন—

একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্বার্চ্চয়া তদর্চ্চা স্যাৎ যতো বিশ্বং তদন্বিতম্॥

"সমস্ত জগতে একমাত্র পরং ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, তিনিই সমগ্র জগদ্রূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন। অতএব বিশ্বের (বিশ্বমধ্যস্থ শক্তিপুঞ্জের) অর্চ্চনা করিলে সেই পরব্রহ্মেরই অর্চ্চনা করা হয়।" গীতাতে শ্রীভগবানও সেই কথা বলিয়াছেন। বিশেষতঃ সংসারী জীব যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে একমাত্র উপায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, সেই-রূপ উপাসনা ক্ষেত্রে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের অনুভূতি আস্বাদন না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞ জীব আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত তাহার সহজ বোধগম্য দেবতামূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। পরে যখন তাহার জ্ঞানের বিকাশ হয়, যখন সে জানিতে পারে যে সমস্ত সংসার মধ্যে সর্ব্বত্র সেই এক পরমেশ্বরের শক্তিপুঞ্জ ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে, তখনই তাহার হৃদয়ে একাত্ম দৃষ্টি উন্মীলিত হয়। দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করাই ধর্ম্মের মহান্ উদ্দেশ্য, দৃঢ় বিশ্বাস না আসিলে ঐহিক কর্ম্মও সুচারুরূপে সাধিত হয় না, দৃঢ় বিশ্বাস অজ্ঞাত বা দুর্ব্বোধ বিষয়ে হইতে পারে না, যে ভাব হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে না তাহাতেও দৃঢ় বিশ্বাস আসিতে পারে না। আমার বিশ্বাসের বস্তু আমার সহজ ধারণার বিষয় হওয়া চাই, আমার হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই, আমার মন প্রাণ যেন সহজে তাহাকে দিতে পারি এমন হওয়া চাই। এই মন প্রাণ ঢালা না হইলে কোনও ধর্ম্ম জীবিত থাকে না।

অজ্ঞ হৃদয়ের ধারণার নিমিত্ত নানাভাবের নানা মূর্ত্তির উপাসনা প্রচলিত হওয়াতে একটী মহান্ দোষের সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষ প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ হইতে আজ অবধি বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়

মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ চলিয়া আসিতেছে, বৈষ্ণব শৈবকে দ্বেষ করিতেছেন, শাক্ত ও বৈষ্ণবের এক ভাবেরই সাধন হইলেও পরস্পর ঘৃণা করিতেছেন, প্রত্যেকে নিজের উপাস্য 'বস্তুকে শ্রেষ্ঠ করিতেছেন তাহাতে দোষ নাই কিন্তু অন্যের দেবতাকে নিকৃষ্ট অবধারণ করিয়া পাপভাগী হইতেছেন। আমাদের পুরাণ শাস্ত্রের রচয়িতাগণই এজন্য অপরাধী। পুরাণগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের রচিত বলিয়া, প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনাদের ইষ্টদেবতাকে শ্রেষ্ঠ করিতে গিয়া ঈশ্বরের সর্ব্বাত্ম ভাব বিস্মৃত হইয়াছেন। সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, এবং তাঁহারই উপাসনা সকলে নিজ নিজ ভাব ও শ্রদ্ধা অনুসারে করিতেছেন এইটুকু মনে রাখিলে আর ছোট বড় জ্ঞান আসে না। ফলে ধর্ম্মের বিবাদই হিন্দুস্থানের একতা না থাকিবার প্রধান হেতু। সাধকের ইষ্টমূর্ত্তি গুহ্য হইতেও গুহ্যতম বস্তু, তিনি নিজের ধারণার নিমিত্ত উপাস্য দেবতামূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেও তাহা সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী কালে সেই মূর্ত্তি অর্থোপার্জ্জনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। প্রায় তীর্থক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ দেবতা মূর্ত্তি গুলি আদিতে কোনও সাধকের নিজস্ব ছিলেন, কোথাও বা কোন এক সম্প্রদায়ের সাধক মণ্ডলীর উপাস্য ছিলেন, সাধারণের দর্শনের জন্য এবং পূজা বা দান লইবার জন্য স্থাপিত হয় নাই। পরে যখন দেবতা মূর্ত্তির প্রকাশ্য স্থাপন পুণ্যকর্ম্ম মধ্যে লিপিবদ্ধ হইল, তখন হইতে সাধারণ দেবালয়ের স্থাপনা চলিতে লাগিল।

শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম ও অতিপ্রাচীন উপাস্য মূর্ত্তি। যাহাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লয় হয় তাহার নাম "লিঙ্গ"। লিঙ্গশব্দের আর এক অর্থ হেতু বা কারণ। যাহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইতে লয় পর্য্যন্ত সাধিত হয় তাহার নাম লিঙ্গ। শিবলিঙ্গ নাদ ও বিন্দুর প্রকাশ্য

চিহ্ন মাত্র—ঊর্দ্ধভাগ জ্যোতিস্বরূপ, তাহাই বিন্দু, এবং অধোভাগ নাদরূপিনী ব্রহ্মশক্তি বা বৈষ্ণবী মায়া। সেইজন্য হস্তপদাদি অঙ্গ-বিশিষ্ট মূর্ত্তি অপেক্ষা শিবলিঙ্গ (বা ব্রহ্মবোধক প্রকৃতিপুরুষাত্মক চিহ্ন) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার উপাসনা ভিন্ন অন্য উপাসনা নিষ্ফল বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই নাদ ও বিন্দুর প্রতিকৃতি সাধারণকে বুঝাইবার জন্য যোনি এবং বীজপ্রদ লিঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং তাহা হইতে নানাবিধ পৌরাণিক আখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। কাশীর কেদারেশ্বর লিঙ্গ নাদবিন্দুর চিহ্ন নয়। আমাদের সমস্ত দেহমধ্যে মস্তকই প্রধান, এবং মস্তকের অস্থিময় আবরণ উন্মুক্ত করিলে শ্বেতবর্ণ মস্তিষ্ক পদার্থ দেখা যায়। সেই মস্তিষ্কের সন্মুখদিকে ঠিক্ মধ্যভাগে একটী খাত দেখা যায়, ঐ খাত ললাটের মধ্য দিয়া পশ্চাৎদিকে গিয়াছে এবং উহা মস্তিষ্ককে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। খাতের উভয়পার্শ্বে কুণ্ডলাকার উন্নতস্থান সকল দেখা যায়, সেইগুলি বিশেষ বিশেষ মানসিক বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট স্থান, এবং সামুদ্রিক পণ্ডিতগণ উহাদিগের বৃদ্ধি হইতে মনুষ্যের ভক্তি শ্রদ্ধা স্মৃতি ধৃতি কাম ও ক্রোধাদি মানসিক বৃত্তির পরিচয় লাভ করেন। শ্রীকেদারেশ্বর লিঙ্গ এই মনুষ্যদেহের মনঃ-শক্তির প্রধান কেন্দ্র মস্তিষ্কের প্রতিমূর্ত্তি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিঙ্গের খাতগুলি অষ্টবন্ধন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়াতে ঐ লিঙ্গের ভাব লোপ হইয়াছে।

বীজমন্ত্রগুলির রহস্য চিন্তা করিলেও ভেদদৃষ্টি নষ্ট হয়। আগমের বীজমন্ত্রগুলি এরূপ গঠিত যে প্রত্যেক বীজের অবসান ভূমি সেই নাদ-বিন্দ্বাত্মক পরব্রহ্ম। প্রত্যেক বীজই ভোগ ও মোক্ষ প্রদানে সমর্থ। সেইজন্য বীজমন্ত্রগুলি সর্ব্বতোমুখী। বীজমন্ত্রের এই সর্ব্বতোমুখী গুণ থাকাতে আগম বলিয়াছেন 'একো মনুশ্চ সংসিদ্ধস্তদা সর্ব্বোপি সিদ্ধিদাঃ'

—একটী মন্ত্র সম্যক্ সিদ্ধ হইলে তখন অন্য সকল মন্ত্রই (বিনা পুরশ্চরণে) সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। তুলসীদাস প্রভৃতি সাধকগণও বলিয়া গিয়াছেন যে 'এক সাধে সব পায়, সব সাধে সব যায়।' সত্যাদি যুগে মহর্ষিগণ একটীমাত্র বীজমন্ত্রের জপেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পাতঞ্জল যোগদর্শনেও কথিত হইয়াছে—'তৎপ্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বাভ্যাসঃ'—সেই দুঃখ দৌর্মনস্য ব্যাধি প্রভৃতি বিক্ষেপবহুলতাবশতঃ একাগ্রতার অভাব জন্য যোগ হয় না, তাহাদের নিবারণ জন্য একতত্ত্বের অভ্যাস বিধেয়। এখনকার মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃই বিক্ষিপ্ত, সেইজন্য আমাদের পক্ষে একটী মাত্র বীজমন্ত্রই উপদেশ হওয়া উচিত। তন্ত্রে বহুবীজ ঘটিত যে সকল মন্ত্র উদ্ধার হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান কালের সাধারণ মনুষ্যের অনুপযোগী এবং অসাধ্য। নানা বীজের দ্বারা সাধ্য সেই এক ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মপ্রকৃতিই সাধনার বস্তু, যাহা প্রকৃতির অতীত তাহা প্রকৃতির তত্ত্ব বিজ্ঞানের পরপারে চরম জ্ঞান মাত্র—সাধনার বস্তু নয়। যিনি যে বীজের সাধন করুন, যে দেবমূর্ত্তির উপাসনা করুন, ফলে তিনি ব্রহ্মশক্তিরই উপাসক। সুতরাং আমরা একেরই উপাসনা করি, বহু ঈশ্বরের বা দেবতার উপাসক বলিয়া যাঁহারা আমাদিগের নিন্দা করেন তাঁহারা আমাদের উপাসনা রহস্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমাদের উপাসনা মার্গের বৈজ্ঞানিক রহস্য অন্যের দুর্ভেদ্য, এবং এখন তাহা আমাদেরই পক্ষে তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে!

একেশ্বরবাদী ক্রিশ্চিয়ান ও মুসলমানদিগের ঈশ্বর, এবং বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীগণের ঈশ্বর এক বস্তু নয়। তাঁহাদের ঈশ্বর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ মাত্র—জগৎ তাঁহার সৃষ্ট এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলেও কিন্তু তিনি জগৎ হইতে পৃথক্, তিনি নিরাকার হইলেও নির্গুণ নহেন। আমাদের ঈশ্বর নির্গুণ ও নিরাকার, অথচ তিনিই সর্ব্বময়—জগৎ তাঁহা-

তেই অবস্থিত ও প্রতিভাসিত। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, কারণ তাঁহা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নাই। তাঁহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, সেই জন্য তিনি জীবের ভক্তি অথবা উপাসনার ভিক্ষুক নহেন—কেহ তাঁহাকে অভক্তি অশ্রদ্ধা করিলেও তিনি ক্রুদ্ধ হন না, অথচ যিনি যে ভাবের উপাসনা করুন না তিনি সেই ভাবে উপাসকের নিকট প্রকাশ হন ও তাহার অভীষ্ট প্রদান করেন। নির্গুণ নিরাকার সর্ব্বময় সর্ব্ব-সাক্ষী ঈশ্বর স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী ভিন্ন সাধারণ জীবের ধারণার অতীত, সেই জন্য ঈশ্বরের নানা শক্তির উপাসনা প্রাথমিক সাধকের জন্য বিহিত হইয়াছে। জীব এক প্রকৃতির নয়—জীবের প্রকৃতিতে ঐশী শক্তির নানাত্ব প্রতিফলিত। শক্তি ভাবরূপেই প্রকাশিত হয়, নতুবা শক্তির অন্য রূপ নাই। জীবের প্রকৃতি ভাব ছাড়া আর কিছু নয়, ঐশীশক্তিই জীবভাবে অবস্থিত, অজ্ঞানের আবরণ জন্য জীবাবস্থা, সেই আবরণ মুক্ত হইলেই জীব ও ঈশ্বর এক হইয়া যায়। ঐ আবরণ ঐশীশক্তির কল্পিত, সেই জন্য ঐশীশক্তিরই উপাসনা প্রয়োজন। ঐশীশক্তির জ্ঞানই এখানে প্রকৃত উপাসনা—শ্রদ্ধা ভক্তি ও উপচার প্রদান প্রভৃতি কার্য্য চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য প্রাথমিক সাধকেব পক্ষে বিহিত। ঐশীশক্তি নানা-ভাবে বিজৃম্ভিত, জীবের প্রকৃতি অনুসারে তদনুরূপ শক্তির উপাসনার প্রয়োজন, সেই জন্য নানা নামের নানামূর্ত্তির ও নানামন্ত্রের উপাসনা আমাদের ধর্ম্মে বিহিত হইয়াছে, এবং তাহা হইলেও কিন্তু সেই এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই হইতেছে, কারণ ঈশ্বর ও ঐশীশক্তি অভিন্ন। যাহা পরিপূর্ণ, তাহার অংশও পরিপূর্ণ—যাহা অনন্ত তাহার অংশও অনন্ত—অর্থাৎ যাহা পরিপূর্ণ বা অনন্ত তাহার অংশ কল্পিত হইতে পারে না, যদি কল্পনা করা যায় তবে তাহাও পরিপূর্ণ বা অনন্ত হইবে।

জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতা হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত আর কোথাও স্বীকৃত হয় নাই। সেই জীবেশ্বরের একত্ব সমাধি বা লয়াবস্থা দ্বারা অনুভূত হয়। ভিন্ন ভিন্ন যোগমার্গের ঐ লয়াবস্থার প্রাপ্তিই একমাত্র উদ্দেশ্য। সালোক্য সামীপ্য সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির মধ্যে সালোক্য ও সামীপ্য মুক্তি হিন্দু মুসলমান ও ক্রিশ্চিয়ানের সাধারণ সম্পত্তি। সালোক্য ও সামীপ্য মুক্তি ভক্তিলভ্য। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টির প্রয়োজন নাই—লয় বা সমাধির প্রয়োজন নাই—কেবলমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁহাতে ভক্তি, তাঁহার সেবা, তাঁহার ইচ্ছাই সকল কার্য্যের মূল জ্ঞানে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ এবং নিজের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধির পরিহার; হিংসা মিথ্যা পরদার পরস্বাপহরণ প্রভৃতি পাপ হইতে নিবৃত্তি, রোগ শোক পাপ ও মৃত্যুর ক্ষেত্রস্বরূপ ধরাধাম হইতে নিষ্কৃতির জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা, এবং ঈশ্বরের নিকটে থাকিয়া তাঁহার সহ একত্র বাসাকাঙ্ক্ষা, এই সকল বুদ্ধি ও আচরণ অব্যভিচারী হইলে মানুষ তাহার বাসনা ও বিশ্বাসের অনুরূপ সালোক্য অথবা সামীপ্য মুক্তির অধিকারী হয়। এরূপ মুক্তিকামীর ঈশ্বর জ্যোতিরূপে অথবা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিরূপে প্রকট হন, তাঁহার ধামও জ্যোতির্ম্ময় লক্ষিত হয়, এবং তত্রত্য পারিষদ্‌গণও জ্যোতির্ম্ময় মুক্ত পুরুষ রূপে কল্পিত হয়। এই সালোক্য বা সামীপ্য মুক্তিলাভের পর, যখন মর্ত্ত্যধামের স্মৃতির বা বাসনার উদয় হইয়া তদভিমুখে আকর্ষণ করে তখনই জ্যোতির্লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জীব পুনরায় ধরাতে জন্মগ্রহণ করে। সালোক্য ও সামীপ্য মুক্তির প্রভেদ এই যে উভয়ের ধাম এক হইলেও, সালোক্যে সর্ব্বদা ঈশ্বরের সহবাস ঘটে না, সামীপ্যে মুক্তাত্মা নিরন্তর তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। এই উভয়বিধ মুক্তিতে জীবের অহংজ্ঞান বিদ্যমান থাকে। সাযুজ্য এবং নির্ব্বাণ মুক্তিতে জীবের অহন্তা ঈশ্বরে বিলীন হয়। ঐশীশক্তিতে চিত্তসমাধানের দ্বারা

যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, তাহার চরম ফল সাযুজ্য মুক্তি। শক্তির চিন্তা করিতে গেলে শক্তিমানের চিন্তা অনিবার্য্য। শক্তিমানের ভাবনা নিরাধার হইতে পারে না। আধার চিন্তা করিতে গেলে নাদ জ্যোতি বা মূর্ত্তির চিন্তা উপস্থিত হয়। সেই চিন্তার ফলে অহংজ্ঞান ধ্যেয় মূর্ত্তিতে বা নাদে বা জ্যোতিতে বিলীন হওয়ার নাম সাযুজ্য মুক্তি। যেরূপ ঐশী শক্তির ধ্যানে চিত্ত সমাহিত হইয়াছিল, জীব এখন সেই শক্তিতে মিশিয়া গেল, সেই শক্তির আবির্ভাবে জীবের আবির্ভাব, শক্তির তিরোধানে তাহারও তিরোধান। আর যদি জ্যোতি বা মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত জ্যোতি ও মূর্ত্তি ছাড়িয়া তাহার অন্তর্নিহিত শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রে আসক্ত হয়, তাহা হইলে বিদেহ কৈবল্যরূপ নির্ব্বাণমুক্তি সংঘটিত হয়। এখানে চৈতন্য মাত্র অবশেষ থাকে—নির্গুণ নিরাকার শুদ্ধ চৈতন্যের রূপান্তরে পুনরাবির্ভাব হইতে পারে না বলিয়া তাহাকে কৈবল্য ও নির্ব্বাণ নামে বলা হয়।

মন্ত্রযোগে চিত্ত নাদরূপ ব্রহ্মশক্তিতে আসক্ত হয়। নাদ এই জগদ্রূপ প্রপঞ্চের মূল কারণ। নাদে জগৎ প্রতিষ্ঠিত—নাদরূপ মহাশক্তি এই জগৎরূপে প্রকাশিত—নাদের জ্ঞানে জগতের জ্ঞান হয়—নাদ আয়ত্ত হইলে জগৎ আয়ত্ত হয়, অসাধ্য সাধনের শক্তি হয়—সেই জন্য জীবের শক্তিসঞ্চয়ের একমাত্র উপায় নাদের সম্যক্ জ্ঞান। পরকাল অদৃষ্ট, মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাইব কি হইব সে সকলই কল্পনা মাত্র। ইহ-জীবনে যদি আমাকে জানিতে না পারি—যদি আমার শক্তির সম্যক্ বিকাশ না হয়—যদি জড়দেহ ও জড়মন মাত্র হইয়া জড়পদার্থের প্রাপ্তি ও ক্ষয় রূপ সুখ ও দুঃখ লইয়া বিব্রত থাকি—তবে পরিণামে যে আমি সেই জড়বুদ্ধিই থাকিব তাহার সন্দেহ নাই। মন্ত্রযোগের দ্বারা আপ-নাকে নাদরূপী জ্ঞান হইলে আর জড়বুদ্ধি থাকিবে না—যে পরিমাণে

নাদের পরিচয় হইবে তদনুরূপ শক্তিসম্পন্ন হইতে পারিব —পরিণামে আর কিছু না হউক আমি আপনাকে নাদরূপে জানিলে আমার স্থূলদেহ থাকিবে না। আর যদি নাদানুসন্ধান করিতে করিতে আমি নাদের বিশ্রামভূমি অব্যক্তধামে উপনীত হইতে পারি, তবে নির্বীজ সমাধি এবং কৈবল্য মুক্তিও আমার আয়ত্ত হইবে। নাদানুসন্ধান রূপ মন্ত্রযোগই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। মন্ত্রযোগ এই নাদানুসন্ধানকেই বলা হয়—মন্ত্র প্রয়োগের সহকারে যে সাকার উপাসনা তাহা ভক্তিযোগের অন্তর্গত—সেখানে মন্ত্র ভক্তিযোগের অঙ্গমাত্র।

অন্য যোগাপেক্ষা মন্ত্রযোগের বিশিষ্টতা এই যে ইহাতে অন্যান্য যোগমার্গের ন্যায় কোনও বিশেষ নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা নাই। পাপাদি অসদ্বৃত্তির পরিহার, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন, সত্য বাক্য, সত্য ব্যবহার, সাধ্যমত পরোপকার, দ্বেষ হিংসা বর্জ্জন, এগুলি দেহী মাত্রের অবশ্য পালনীয় এবং সকল ধর্ম্মেই বিহিত। এ সকল সাধারণ নিয়ম সর্ব্বদেশের ভদ্র সমাজে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত আছে, এগুলিকে ভঙ্গ করিলে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়, আর স্বাস্থ্যের নিয়ম অপালনে দেহ রোগগ্রস্ত হয়। যাঁহারা বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জনে রত থাকায়, অথবা গার্হ্যস্থ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায়, অন্য যোগানুষ্ঠানে অক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিমাত্র বিহিত হইতে পারে—কায়িক ও বাচিক উপাসনার অবসর না থাকিলেও মানসিক উপাসনার প্রতিবন্ধক কিছুই নাই, যদি থাকে তাহা আলস্য বা ঔদাসীন্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সেই মানসিক উপাসনার জন্য এক মন্ত্রযোগই প্রশস্ত ও সুগম পন্থা। মন্ত্রের স্মরণ সহকারে সকল কার্য্যই করিতে পারা যায়, এবং মন্ত্রশক্তির প্রভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ় অভিনিবেশ হওয়াতে তাহা অল্পায়াসে সুসম্পন্ন হইবে। মন্ত্রশক্তি ঠিক প্রযুক্ত হইলে তাহার প্রভাবে

ইন্দ্রিয়গণ উন্মার্গগামী হইবে না, সুতরাং অসদাচরণের প্রবৃত্তির নিরোধ হইবে। ঈশ্বর প্রমাণের অতীত পুরুষ। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমান এই ত্রিবিধ প্রমাণ—আর আপ্তবাক্য চতুর্থ প্রমাণ। যিনি যোগাদি সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তির বাক্যকে আপ্তবাক্ বলা হয়—তাঁহার বাক্যমত সাধন করিলে অন্যে তাঁহার বাক্যের সত্যতা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। মন্ত্রযোগ সাধন দ্বারা আপ্তবাক্যের সত্যতা বিষয়ে সংশয় দূরীভূত হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত ঈশ্বরকে জানিতে হইলে কোন এক আপ্ত-বাক্যের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তদনুসারে সাধন করিতে হয়, তাহাতে ক্রমে সংশয়চ্ছেদ হইয়া বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকে। মন্ত্রের উৎপত্তি বর্ণনকালে জানা যাইবে যে মন্ত্র আপ্তবাক্ ভিন্ন আর কিছুই নয়। মুসলমান ক্রিশ্চিয়ান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যে সকল শব্দপ্রয়োগে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাহা যদিও সর্ব্বত্র আপ্তবাক্ না হইতে পারে, তথাপি সেই সেই মতাবলম্বীর শ্রদ্ধেয় আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ভাষিত বলিয়া সেই সেই সম্প্রদায়ের পক্ষে আপ্তবাক্ স্থানীয়—সুতরাং মন্ত্র স্বরূপ। জীব ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনাতে যাহা মনন করে তাহাই মন্ত্র—তবে আমাদের বীজমন্ত্র সকল কেবলমাত্র সাঙ্কেতিক ভাষা নয়—বীজমন্ত্রগুলি ঐশী-শক্তির ক্রমবিকাশ, সুতরাং নিত্য বস্তু। জীবমাত্রের আকাঙ্ক্ষা একরূপ নয়—এবং সকলে ঈশ্বরের একমেবাদ্বিতীয়ম্ জ্ঞানের অধিকারীও নয়। আকাঙ্ক্ষার ভিন্নত্ব হইতে অধিকারীর ভিন্নত্ব—অধিকারীর ভিন্নত্ব জন্য উপাস্য ব্রহ্মশক্তির বিভিন্ন বিকাশ, এবং ঐ বিকাশই বিভিন্ন মন্ত্ররূপে প্রকটিত ও উপাসিত হইয়া আসিতেছে। এখন যেমন বংশগত গুণ ও শীল পুরুষানুক্রমে ব্যতিক্রম হইতেছে, সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে উপাস্য মন্ত্র (সুতরাং উপাস্য দেবতা) পুরুষানুক্রমে

বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুসারে মন্ত্র ও দেবতা নিরূপণ করা সদ্‌গুরুর একটা প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

পিতামাতার দেহ হইতে উৎপন্ন জীব অবশ্য পূর্ব্বপুরুষগণের মেধা ও বীর্য্যের অধিকারী হয়, কিন্তু উত্তরোত্তর সেই মেধা ও বীর্য্যের হ্রাস হইতে থাকে—তাহার প্রধান কারণ কাল-ব্যবধান ও পুরুষ-ব্যবধান। যে সময় কোন এক মনুষ্যজাতির জাতীয় জীবন প্রথম বিকশিত হয়, তখন সেই জাতিতে উন্নতির দিকে প্রধান লক্ষ্য থাকে, এবং ক্রমোন্নতির দ্বারা তাহাদের মেধা ও বীর্য্য সার্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টতা লাভ করে। কালক্রমে তাহাদের উদ্যম ও চেষ্টার হ্রাস হইতে থাকে। অন্য জাতির সহ সংঘর্ষ না থাকাতে উদ্যমের হ্রাস হয়, আধিপত্য নিবন্ধন নিজের উৎকর্ষ জ্ঞান আর এক অন্তরায়, কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য হইতে উৎপন্ন ভোগ্য সামগ্রীর সহজলভ্য হওয়াতে চেষ্টার হ্রাস হয়, এবং সুখভোগ ও বিলাসিতা চিত্তকে আকর্ষণ করে। পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু পুরুষের সন্ততি ক্রমে বিলাস পরায়ণ হয়। ক্রমোন্নতির এই সকল অন্তরায়গুলি কাল-ব্যবধানে আসিয়া পড়ে। কাল-ব্যবধানের সঙ্গে পুরুষ ব্যবধান ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। উদ্যমের বীজ হইতে উদ্যম উৎপন্ন হয়, আর বিলাসের সন্ততি বিলাসের দিকে আরও অগ্রসর হয়। কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভের জন্য, অথবা কোন বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য, যখন মানুষের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়চিন্তা আপনি আসিয়া পড়ে। সেই চিন্তা চিত্তকে দৃঢ়রূপে অধিকার করিলে এবং নিয়মিত কাল স্থায়ী হইলে উন্নতির পথ আবিষ্কার হয়—ইহাও একপ্রকার যোগজ সিদ্ধি। বিজ্ঞানের উন্নতি এই ধরণের আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে। সুখের দশাতে লালিত মনুষ্যের এই চিন্তা কিন্তু প্রগাঢ় হয় না,

অথবা ফল প্রসব পর্য্যন্ত তাহা নিয়মিত কাল স্থায়ী হয় না। সেই জন্য মনুষ্য সুখ ও ঐশ্বর্য্য প্রিয় হইলে তখন আর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি বস্তু সুলভ হইলে সমাজের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। কষ্টের অনুভব যত তীব্র হয়, কষ্ট নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য ততই তীব্র উদ্যম অঙ্কুরিত হয়। উদ্যম না আসিলে মনঃশক্তির সম্যক্ চালনা হয় না। সুখাসক্ত বিলাসী মনুষ্যেরা কখনই দীর্ঘকাল কোন উন্নত চিন্তাতে চিত্তনিবেশ করিতে পারে না। কষ্টের সহ সংঘর্ষই চিত্তকে মেরুমধ্যস্থ চিন্তাপথে অবরোধ করিতে সমর্থ হয়—এই অবরোধই ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত। ব্রহ্মচর্য্য যে কেবল ঈশ্বর আরাধনাতেই প্রয়োজন তাহা নয়। আত্ম-সংযম রূপ ব্রহ্মচর্য্য না থাকিলে মনুষ্য ঐহিক বিভূতি লাভেও বঞ্চিত হয়। নীরোগ সবল দেহ, কাম ক্রোধ ও লোভের অবশীভূততা, কর্ত্তব্য বিষয়ে অনবধানতা না থাকা, বিচারকুশলতা, পরিপুষ্ট স্মৃতি, দৃঢ় ও স্থির সংকল্প, অধ্যবসায় প্রভৃতি ঐহিক বিভূতি না থাকিলে প্রভূত ধনজন সত্বেও জীবন মরুতুল্য। কালের লীলাতে এখন আমরা ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক বিভূতির ক্ষয় হইয়াছে, ধ্বংসের চরমসীমা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। মন্ত্রযোগ ঠিক উপদিষ্ট হইলে, প্রথম জীবনে বীজ বপন হইলে, পুনরায় মন অন্তর্নিবিষ্ট হইবে—ব্রহ্মচর্য্য আপনি আসিবে—চিত্তসত্ব পরিপুষ্ট হইবে—আয়ু বল মেধা তেজ ধৃতি ও স্মৃতি পুনরায় উজ্জীবিত হইবে। কিন্তু উপদেশ ঠিক এবং কালে হওয়া চাই। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'—সেই কৌশল যিনি নিজে জ্ঞাত নহেন তিনি উপদেশ দিবার যোগ্য গুরু হইতে পারেন না। কেবল মন্ত্রমাত্র শ্রবণ করাইলে মন্ত্রযোগের উপদেশ হইতে পারে না।

তন্ত্র বলেন যে মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্রের চৈতন্য, এবং যোনিমুদ্রা না জানিয়া মন্ত্রজপ করিলে কোটি কল্পেও ফললাভ হইবে না। কেবল মন্ত্র ও তাঁহার ধ্যেয় মূর্ত্তির উপদেশ, এবং আনুষঙ্গিক ন্যাসাদি ও পূজাপ্রণালীর উপদেশ দ্বারা কখনই ইষ্টফল লাভ হইবে না। সকল মন্ত্রই বর্ণ ঘটিত—প্রত্যেক বর্ণ সৃষ্টিক্রমের এক এক শক্তি—বর্ণস্থিত শক্তি সমূহের পরিচয়কে বীজমন্ত্র পক্ষে মন্ত্রার্থজ্ঞান বলা হয়; আর অধিকাংশ নামমন্ত্র পক্ষেও সেই নিয়ম লক্ষিত হয়, যেমন 'হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক হরিনাম মন্ত্রে হকার রকার ইকার প্রভৃতি প্রতিবর্ণের বীজশক্তি লইয়া শ্রীরাধাতন্ত্র তাহার অর্থ করিয়াছেন, তবে অনেক স্থলে নামমন্ত্রের শব্দার্থ অনুসারেও অর্থ হইয়া থাকে। মন্ত্রস্থিত শক্তির সহ উপাস্য দেবতার সম্বন্ধ জ্ঞানকে মন্ত্রচৈতন্য বলা হয়—'মন্ত্রচৈতন্যমেতত্তু তদধিষ্ঠাতৃদেবতা' মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই মন্ত্রের চৈতন্য। কুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্না পথে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাওয়ার নাম যোনিমুদ্রা। অগ্নির শিখা যেমন ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, যোনিমুদ্রাতে মন্ত্রশক্তির দীপ্তি মূলাধার হইতে মস্তিষ্কাভ্যন্তরে সহস্রার পর্য্যন্ত ভাসমান হয়—সেই জন্য যোনিমুদ্রাকে মন্ত্রের শিখা বলা হয়। কুণ্ডলিনী শক্তির বিশেষ পরিচয় মন্ত্রমার্গে অতীব আবশ্যক, অথচ কেবল মন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থপাঠে সেই পরিচয় হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা প্রায় গুহ্য বিষয়গুলি গুরুমুখে জ্ঞাতব্য বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের অভিপ্রায় যে দক্ষ ও কৃতী গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া তদনুসারে যোগানুষ্ঠান করিলেই ঐ সমস্ত বিষয় যোগজ প্রত্যক্ষ দ্বারা সাধকের নিকট পরিচিত হয়, নতুবা কোটিশাস্ত্র অধ্যয়নেও সে জ্ঞান লভ্য হয় না। কথা অতীব সত্য তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এখন সেরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়ই দুর্লভ। অতএব যখন আমাদের

মন্ত্রযোগই একমাত্র অনুষ্ঠেয় ও উপাস্য ধর্ম্ম, তখন সে বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা নিষ্প্রয়োজন হইতে পারে না। একজনের ভ্রান্ত মত বা সিদ্ধান্ত আর একজন সাধক সংশোধন করিবেন, ক্রমশঃ সত্য আবিষ্কার হইবে, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই বর্ত্তমান সমালোচনার অবতারণা করা হইতেছে।

মন্ত্রের উৎপত্তি।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল আগম। আগম কি? যাহা সাধকের সমাধিকালে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সত্য অভ্রান্ত জ্ঞানের নাম আগম। এই জগৎ কে নির্ম্মাণ করিল? তাঁহার স্বরূপ কি? আমি কে? আমার সহিত, জগতের সহিত, সেই সৃষ্টিকর্ত্তার সম্বন্ধ কি? এই সকল অনুসন্ধান প্রবৃত্তি চিত্তমধ্যে উত্থিত হইলে যখন অন্য চিন্তা মন হইতে অপসৃত হয়, কেবল সেই একমাত্র চিন্তাস্রোত অনবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়, ক্রমে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান তিরোহিত হয়, ক্ষুধা পিপাসা সুখ দুঃখ বোধ থাকে না, নিজের দেহজ্ঞানও লোপ হয়, শেষে আমিত্ব জ্ঞানও চলিয়া যায়—এইরূপ একাগ্রভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ক্রমে সমাধিতে পরিণত হয়, কেননা তখন চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইয়া ঐ একভাবে সম্যক্ স্থিতিলাভ করিয়াছে। মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া লইয়া চিত্তের বৃত্তি অর্থাৎ নাড়াচাড়া। সেই নাড়াচাড়া বন্ধ হইলেই চিত্ত আপন স্বভাব প্রাপ্ত হয়—তাহাই আত্মজ্ঞান। পূর্ব্বে দেহবিশিষ্ট আমিত্বে আত্মজ্ঞান ছিল, এখন সে আমি নাই, সঙ্গে সঙ্গে জগৎও নাই, আছেন কেবল—যাহা সত্য,

যাহা সদাস্থায়ী, যাহার কখনও ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত, অথচ যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। জীবের চিত্ত যখন ঐ আদিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে ব্রহ্মজ্যোতির দর্শন হয়, জ্যোতি দর্শনের সঙ্গে এক অপূর্ব্বশ্রুত ধ্বনিরও উপলব্ধি হয়। চিত্তের মনবুদ্ধিরূপ উপাধিশূন্য অবস্থা সর্ব্বপ্রকার ভাবশূন্য—বিকারশূন্য—অনন্ত। সেই অনন্ত ব্রহ্মনামে কথিত হন।

যাহার কোনরূপ অন্ত বা সীমা কল্পিত হইতে পারে না, তাহাই অনন্ত। দেশব্যাপী ও কালব্যাপী ভেদে সীমা দ্বিবিধ। যাহাতে দেশ ও কাল উভয়ের ব্যবচ্ছেদ নাই, তাহাকেই অনন্ত বলা যায়। আমাদের এই পরিদৃশ্যমান আকাশ দেশব্যাপী, ইহা অনন্ত হইতে পারে না। যদিও আকাশের সীমা নির্দ্দেশ নাই, সীমা কল্পনা করিতে গেলে সীমার অন্তে পুনরায় আকাশ উপস্থিত হয়—কিন্তু এই বিস্তার থাকাতেই আকাশ দেশব্যাপী হইতেছে। মনের বিস্তারের সঙ্গে আকাশের বিস্তার—কল্পনার সীমার সঙ্গে আকাশের সীমা। এই আকাশ শূন্য নয়, গ্রহনক্ষত্রাদি খেচর বস্তুতে পূর্ণ—আমাদের জাগ্রৎ জ্ঞানের আধার। স্বপ্নে যে আকাশ দেখি, তাহা এ আকাশ না হইলেও ইহার চিত্র বা আভাস, কারণ স্বপ্ন জাগ্রৎ জ্ঞানের অনুবৃত্তি মাত্র। যাহাকে সুষুপ্তি বলি, সে অবস্থায় মনের ক্রিয়া না থাকায় কোনও বস্তুর জ্ঞান থাকে না, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অল্পক্ষণ অধিকক্ষণ এরূপ কালজ্ঞানও থাকে না। মন ও তাহার বিষয় না থাকাতে সুষুপ্তি শূন্য অবস্থা, দেশ ও কাল না থাকাতে কোন সীমা তখন নাই। কিন্তু সুষুপ্তিতে আত্মতত্ত্বের প্রকাশ না থাকায়, সুষুপ্তি অজ্ঞান ভূমি—প্রলয়ে জগৎ এক দীর্ঘ সুষুপ্তিতে লীন থাকে। সমাধিতেও চিত্ত শূন্য

পদবী প্রাপ্ত হয়—অনন্তে মিশিয়া যায়—কিন্তু তখন আত্মতত্ত্বের প্রকাশ হয়, চিদানন্দের অনুভূতি হয়। সমাধি অজ্ঞান ভূমির পরপারে—উহা জ্ঞানভূমি। যে জ্যোতি-দর্শন ও ধ্বনি-শ্রবণ বলা হইয়াছে তাহা সমাধির প্রথম অবস্থায় উপলব্ধি হয়। যাহাকে নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়, তাহাতে জ্যোতি ও ধ্বনি থাকে না—তখন নিঃশব্দ নিস্পন্দ অনির্ব্বচনীয়, ভাব ও অভাব বিমুক্ত, চৈতন্যমাত্র বিরাজ করেন।

জ্যোতি ও ধ্বনি সীমাবিশিষ্ট। অনন্ত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে সীমাবিশিষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম জ্যোতিও নন, অন্ধকারও নন, তাঁহাতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কিছুই নাই। তবে জ্যোতিদর্শন ও ধ্বনিশ্রবণ হয় কেন? প্রথম উত্তর এই—সাধকের পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে। কোন বিষয় দীর্ঘকাল চিত্তমধ্যে আবর্ত্তিত হইলে, তাহা পরবর্ত্তীকালেও মনোমধ্যে উদয় হয়, পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইলেও তাহার এই পুনরাবির্ভাব তিরোহিত হয় না। ইহারই নাম সংস্কার। স্বপ্নাবস্থায় এমন অনেক বিষয় দেখা যায় যাহা বর্ত্তমান জন্মে কখনও দৃষ্ট শ্রুত বা অনুভূত হয় নাই। ঐ স্বপ্ন জন্মান্তরের অনুভূত বিষয়ের সংস্কার মাত্রের পুনরাবির্ভাব। পূর্ব্ব অনুভূতির তীব্রতা বা মৃদুতা অনুসারে ঐ সংস্কারের তীব্রতা বা মৃদুতা হইয়া থাকে। সাধক যখন সেই মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার হৃদয়ে সেই বস্তুর সাক্ষাৎকারের আকাজ্ক্ষা উদ্দীপিত হয়—চিত্ত ক্ষীণমল হইলেও সেই আকাজ্ক্ষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না, সূক্ষ্ম ভাবে লুক্কায়িত থাকে। জগতের শিক্ষা অনুসারে ঐ সাক্ষাৎকারের বাসনা আবার হয়ত চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের কল্পনারূপে সূক্ষ্মাকারে চিত্তমধ্যে থাকিয়া যায়, এবং সেই কারণে জ্যোতিদর্শন ঘটে। অথবা

যদি সাধকের চিত্তে ব্রহ্মবস্তুর হস্তপদাদি অঙ্গবিশিষ্ট কোন মূর্ত্তি পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, তবে সেইরূপ মূর্ত্তিও ঐ জ্যোতিমধ্যে সাধক দেখিতে পান। কিন্তু এই জ্যোতি বা মূর্ত্তি দর্শন কালে সাধকের আমিত্ব জ্ঞান থাকে না—তাঁহার মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ পূর্ব্বেই বিলীন হইয়াছে, সুতরাং এই দর্শন তাঁহার মনের কল্পনা বা চাক্ষুষ দর্শনও হইতে পারে না। এখানে দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই ভেদজ্ঞানও নাই—ইহা কেবল দর্শন মাত্র, সে দর্শনে দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন সবই এক চৈতন্য।

আর ধ্বনিশ্রবণ হয় কেন, তাহারও প্রথম উত্তর এই যে—সাধক ব্রহ্ম হইতে তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের বাসনা করেন, অথবা তাঁহার আত্মনিবেদনের ফলস্বরূপ কোন আকাঙ্ক্ষাপূরণের বাসনা করেন। এই বাসনা বশতঃ ব্রহ্মজ্যোতির দর্শনের সঙ্গে তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় লাভ করেন। সেই জ্ঞান সাধকের বোধগম্য তাৎকালিক ভাষাতে ব্যক্ত হয়—এবং ঐ ভাষা নাদযুক্ত বাণী। যেমন প্রথমে জ্যোতি দর্শন, পরে সাধকের সংস্কার অনুসারে মূর্ত্তি দর্শন—সেইরূপ এখানেও প্রথমে নাদশ্রবণ, এবং পরে নাদমধ্যে বর্ণসমষ্টিরূপ বাণীর আবির্ভাব। যে ধ্বনি বস্তুর সহ বস্তুর আঘাতজনিত নয়, তাহাকে অনাহত ধ্বনি বলে—অনাহত ধ্বনির অপর নাম নাদ। নাদ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নিত্য স্ফুরিত হইতেছে। নাদের শ্রবণ কর্ণে হয় না, শ্রোতা বলিয়া ব্যক্তিও থাকে না, শ্রবণরূপ কার্য্যও থাকে না—একমাত্র নাদচৈতন্যে সমস্ত বিলীন হয়। পূর্ব্বে যে জ্যোতিদর্শন বলা হইয়াছে, সেই জ্যোতি এবং তাহার অন্তর্গত মূর্ত্তি নাদে মিশিয়া যায়—কারণ নাদ এবং জ্যোতি যে অভিন্ন বস্তু তাহা পরে প্রকাশ হইবে। নাদমধ্যে যে বাণীর আবির্ভাব হয়,

তাহাও নাদ ও জ্যোতি হইতে অভিন্ন, সেই জন্য ঐ বাণীর নাম বর্ণশব্দ—জ্যোতি এবং ধ্বনির মিশ্রণ বা একাত্মভাব।

এই বর্ণশব্দই মন্ত্ররূপী দেবতা। "মন্ত্রার্ণা দেবতা প্রোক্তা দেবতা মন্ত্ররূপিণী"—মন্ত্রগত বর্ণই দেবতা, এবং দেবতা মন্ত্রময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। আমাদের বর্ণমালা অন্য ভাষার বর্ণমালার ন্যায় শব্দোচ্চারণের সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র নয়। সংস্কৃত বর্ণমালার এক এক বর্ণ এক এক শক্তি—এক এক দেবতা—কারণ শক্তিই দেবতারূপে প্রকাশ হন। যাহা দীপ্তি মোদ (আনন্দ) ও ক্রীড়া বিশিষ্ট, তাহাই দিব্ ধাতু নিষ্পন্ন দেবতাশব্দ বাচ্য—ব্রহ্মশক্তি যেরূপে দ্যোতিত হইয়া নিজানন্দে জগতে স্বীয় লীলারূপ ক্রিয়া বিস্তার করিতেছেন, তাহাই বর্ণ। আমাদের বর্ণমালার পঞ্চাশৎ বর্ণ হইতে তৎসংখ্যক রুদ্র ও রুদ্রশক্তি—বিষ্ণু ও বিষ্ণুশক্তি—পঞ্চাশৎ কাম ও কামশক্তি—পঞ্চাশৎ গণপতি ও গণপশক্তি—সৃষ্টির আদিতে উদ্ভূত হইয়া জগৎপ্রপঞ্চের বিস্তার করিয়াছেন, এবং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রক্ষা ও পালন কার্য্যের সাধন করিতেছেন—তাঁহাদের অপরিজ্ঞানে সাধকের বিঘ্ন সমুত্থিত হয়, সেই জন্য মন্ত্রযোগী স্বীয় অঙ্গে তত্তৎকল্পোক্ত তাঁহাদের ন্যাস করিয়া যোগারম্ভ করেন। সৃষ্টি বিকাশের নিমিত্ত ব্রহ্মশক্তি যে যে অবস্থাতে পরিণত হইয়াছেন, সে সমস্ত তত্ত্বই মৌলিক দেবতা। তাহার পর সাধকগণের ব্রহ্মচৈতন্যে চিত্তসমাধান জনিত তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত দেবতার আবির্ভাব—যেমন, অসুরবধের নিমিত্ত দেবগণের স্তবে শ্রীদুর্গা, প্রহ্লাদের রক্ষার জন্য নৃসিংহ, কশ্যপের তপস্যাতে বিষের প্রতীকার জন্য শ্রীমনসা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সৃষ্টির রক্ষা ও পালন জন্য সময়ে সময়ে রাম-কৃষ্ণাদি দিব্যশক্তির অবতারগুলিও দেবতারূপে উপাসিত হইতেছেন।

ফলতঃ এই বিশ্বই দেবতাময়—আদিদেব পরমেশ্বর হইতে যাহা কিছু বিজৃম্ভিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা দেবতাভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

এই যে দিব্য বাণীর কথা বলা হইল, উহা পুরুষ বিশেষের দ্বারা উচ্চারিত নয় বলিয়া—অপৌরুষেয়। তত্ত্বজ্ঞান উহার অর্থ বলিয়া উহা বেদ—"ন বেদো বেদমিত্যাহুর্ব্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্"—লোকে যে ঋগাদি মন্ত্র সমষ্টিকে বেদ বলিয়া জানে তাহা বেদ নয়, সনাতন ব্রহ্মকেই বেদ বলা যায়। ঐ বাণী সমাহিত অবস্থায় অন্তরাত্মাতে শ্রুত হয় বলিয়া উহার নাম শ্রুতি। সমাহিত অবস্থায় সাধকের নিকট স্বয়ং আগত বলিয়া উহা সেই সাধকের 'স্বাগম'। যাহা সিদ্ধাত্মার স্বাগম, তাহাই জগতের নিকট আগম বলিয়া পরিচিত। এই স্বাগমই বেদ স্মৃতি ও তন্ত্রের মূল ভিত্তি—কোন না কোন সমাহিত আত্মার লব্ধ বস্তু, সেই জন্য উহার আর এক নাম আপ্তবাক্। এই স্বাগম সম্বন্ধে তন্ত্র বলিতেছেন—

স্বাগমং পরমং জ্ঞানং চতুঃ প্রজ্ঞানসংযুতম্।
বিজ্ঞানেন মতং দেবি দেবমাতরমেব চ॥
বেদাশ্চ পরমেশানি বিধেয়ানি যথা তথা।
দর্শনানি তথা দেবি সফলানি পৃথক্ পৃথক্॥
চতুর্দ্দশানি তন্ত্রাণি তথা নানাবিধানি চ।
স্বাগমাশ্চ প্রসূয়ন্তে সততং পরমেশ্বরি॥
মম প্রাণসমং দেবি স্বাগমং মম সম্পুটম্।
হৃদয়ে মম দেবেশি সংস্থিতং কমলাননে॥
যস্মিন্ ক্ষণে মহেশানি অন্তর্ধ্যাত্মা হরোহ্যম্।
স্বাগমং ভাবিতং দেবি তৎক্ষণে পরমেশ্বরি॥

অন্তর্ধ্যানং হৃতং দেবি স্বাগমং হৃদয়ে স্থিতম্।
অন্তর্ধ্যানং সমাহৃত্য বাহ্যদৃষ্টির্যদা মম॥
তদাহং সহসা দেবি কথয়ামি তবাগ্রতঃ।
বিভাব্য পরমেশানি স্বাগমং কথয়ামি তে॥
স্বাগমং লক্ষগ্রন্থং হি নানাবিদ্যা শুচিস্মিতে।
নানাশাস্ত্রে চ বিদ্যাসু স্বাগমস্ত প্রশস্যতে॥

"দেবি! স্বাগমই পরম জ্ঞান, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ও তুরীয় জ্ঞান সেই স্বাগম। বিজ্ঞান রূপ নানা বিদ্যা স্বাগম হইতে উদ্ভূত (জড় বিজ্ঞানের আবিষ্কার সকলের মূলও স্বাগম)—স্বাগম সমস্ত দেবতার মাতৃরূপিণী। বেদ সকল, ক্রিয়াকাণ্ডের বিধি সকল, দর্শনশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, সমস্তই স্বাগম-প্রসূত। স্বাগম আমার প্রাণতুল্য, আমার রত্নভাণ্ডারস্বরূপ, এবং সর্ব্বদা আমার হৃদয়মধ্যে সংস্থিত। যখন আমি বাহ্যজ্ঞান সংহরণ করিয়া হররূপে অন্তর্ধ্যানে নিমগ্ন থাকি, তখন আমি স্বাগম ভাবনাতে ভাবিত থাকি। আমার অন্তর্ধ্যান বিমুক্ত হইলে যখন বাহ্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়, তখন আমি তোমার নিকট সেই হৃদয়স্থিত স্বাগম প্রকাশ করিয়া থাকি। শিবশক্তির সম্বাদ রূপ তন্ত্রশাস্ত্রে আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সমস্তই আমার স্বাগম ভাবনা হইতে বলিয়াছি। স্বাগমই লক্ষ গ্রন্থরূপে এবং নানা বিদ্যারূপে প্রকাশ পাইতেছে। সমস্ত শাস্ত্র এবং বিদ্যা মধ্যে এক স্বাগমই প্রধান।" আবার বলিয়াছেন—

স্বাগমং হি বিনা দেবি ন কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে প্রিয়ে।
সর্ব্বং হি পরমেশানি ব্রহ্মাণ্ডং স্বাগমে স্থিতম্॥
স্বাগমাচ্চ প্রসূয়ন্তে কোটিশঃ কুণ্ডরাশয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডং কোটিশো দেবি নির্ম্মাণং স্বাগমাৎ প্রিয়ে॥

পুরাণানি মহেশানি তন্ত্রাণি বিবিধানি চ।
যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যতে দেবি স্থূল সূক্ষ্মং শুচিস্মিতে॥
তৎসর্ব্বং পরমেশানি স্বাগমাৎ কমলাননে।
সৃষ্টিং চ কুরুতে ব্রহ্মা স্বাগমাৎ পরমেশ্বরি।
স্থিতিঞ্চ কুরুতে বিষ্ণুঃ স্বাগমাৎ নগনন্দিনি॥
সংহরামি জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বে স্বাগমরূপিণঃ॥
স্বাগমো ব্রহ্মণো রূপং স্বাগমং পরমং পদম্।
তেজঃ পুঞ্জং মহেশানি স্ত্রীরূপং স্বাগমং প্রিয়ে॥

"হে দেবি! এক স্বাগম ব্যতীত ত্রিভুবনে অন্য বস্তুই নাই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বাগমে অবস্থিত, স্বাগম ব্যতীত আর কিছুর সত্তা নাই। স্বাগম কোটি কোটি কুণ্ডরাশি প্রসব করিতেছে—(সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মশক্তি নাদরূপে স্ফুরিত হন, সেই নাদ বক্রগতি দ্বারা ত্রিরেখাতে ত্রিকোণাকার যোনিরূপে পরিণত হন, সেই ত্রিশক্তিরূপিণী যোনিকে এখানে 'কুণ্ড' বলা হইয়াছে, ঐ কুণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থান এবং যোগশাস্ত্রে অকথাদি ত্রিরেখাত্মক বলিয়া পরিচিত, তাহা পরে বিবৃত হইবে। শ্রীভগবানও গীতাতে বলিয়াছেন—'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্যাং গর্ভং দধাম্যহম্।' আগমে এই কুণ্ডকে চিৎকুণ্ডও বলা হয়, যে হোমকুণ্ডে হবনক্রিয়া সাধিত হয় তাহাও এই চিৎকুণ্ডের প্রতিরূপ)। স্বাগম হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ হইতেছে—স্বাগম বিবিধ পুরাণ এবং তন্ত্র রচনা করিতেছে—স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু দেখা যায় সে সমস্ত স্বাগম-সম্ভূত। স্বাগমের বলে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন—বিষ্ণু সেই সৃষ্টির রক্ষা করিতেছেন—আমি রুদ্ররূপে চরাচর সহ ত্রৈলোক্যের সংহার করিতেছি। অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্র

ইহাঁরা স্বাগম ভিন্ন অন্য নন। স্বাগম পরম পদ ব্রহ্মের স্বরূপ, স্বাগমই তেজঃপুঞ্জময় স্ত্রীরূপ।"

মহিষাসুর বধের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রমুখ দেবতাগণ পরমাত্মাধ্যানে রত হইলে তাঁহাদের তেজোরাশি পৃথক্ পৃথক্ নির্গত হইয়া একত্র মিলিত হয়, এবং সেই মিলিত তেজোরাশি হইতে মহা-শক্তিরূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন। যাহা তেজঃপুঞ্জ তাহা ধ্যানের ফল স্বাগম—তেজঃপুঞ্জ শক্তির বিকাশ—সেই জন্য স্ত্রীমূর্ত্তি তেজঃপুঞ্জে নিত্য বিরাজমানা। শক্তিই জগতের একমাত্র উপাদান, সেই শক্তি প্রথমে তেজোরূপে আবির্ভূত হন, সেই জন্য স্ত্রীরূপকে স্বাগম (আত্মার আবির্ভাব) বলা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্যের প্রাধানিক রহস্যে ব্রহ্মশক্তির আদি বিকাশ—মহালক্ষ্মী মহাকালী ও মহাসরস্বতী রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে সৃষ্টির বিকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আদিমূর্ত্তি 'গোপালসুন্দরী' রূপ প্রকটিত হইয়াছে। আগম ও নিগম ভেদে তন্ত্রশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ব্রহ্মশক্তির নারীরূপকে প্রধান ও সর্ব্বাদি বলিয়া কথিত হইয়াছে—এমন কি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই নারীময় বলা হইয়াছে—যিনি পুরুষ তিনি তুরীয় চৈতন্য এবং সর্ব্বশক্তির আধার—তিনি গুণাতীত বলিয়া তাঁহার রূপকল্পনা হইতে পারে না। সেই পরম পুরুষ ভিন্ন দেহীমাত্রেই নারীমূর্ত্তি—অর্থাৎ মূর্ত্তিমাত্রেই নারীমূর্ত্তি।

চণ্ডীর প্রাধানিক রহস্য বলিতেছেন—সকলের আদিতে একা মহালক্ষ্মীই ছিলেন, তিনি ত্রিগুণা এবং তিনিই পরমেশ্বরী; তিনি লক্ষ্যস্বরূপা (ব্যক্তরূপিণী) এবং অলক্ষ্যস্বরূপা (অব্যক্তরূপিণী মূলা প্রকৃতি); যখন লক্ষ্য স্বরূপা তখন তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা (ইহাই ইচ্ছা শক্তির রূপ)। সেই মহালক্ষ্মী সমস্তই শূন্য দেখিলেন—অর্থাৎ

শূন্যই আকাশরূপ প্রথম কল্পনা; তখন তিনি সেই শূন্যকে আপনার তেজে পরিপূর্ণ করিলেন—অর্থাৎ শূন্য আকাশে জ্যোতি ও ধ্বনি-রূপিণী নাদশক্তি প্রসারিত হইলেন—ইহাই ইচ্ছা শক্তির বিকাশ। তৎপরে মহালক্ষ্মী শুদ্ধতমোময় অপর রূপ ধারণ করিলেন—সেই দ্বিতীয়া মূর্ত্তি এক কৃষ্ণবর্ণা তনুমধ্যমা বিশাললোচনা নারী হইলেন, এবং তিনি মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা একবীরা কালরাত্রি নামে অভিহিতা হন, এবং ঐ সকল নামের অনুরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করেন। অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি হইতে উদিত নাদ ঘনীভূত হইয়া বিন্দুতে পরিণত হইলেন—ব্যাপ্তি রূপিণী নাদশক্তির সঙ্কর্ষণ হেতু বিন্দুর উৎপত্তি, ঐ সঙ্কর্ষণ তমোগুণের ক্রিয়া, সেইজন্য তামসী মহাকালী মূর্ত্তি বিন্দুরূপিণী ক্রিয়াশক্তি, ইহাই দ্বিতীয়া মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক রহস্য। তাহার পর মহালক্ষ্মী শুদ্ধসত্বময়ী আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন—এই তৃতীয়া মূর্ত্তি অক্ষমালা অঙ্কুশ বীণা ও পুস্তক ধারিণী, এবং তাঁহার নাম মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী আর্য্যা ব্রাহ্মী মহাধেনু বেদগর্ভা ও সুরেশ্বরী—ইনিই জ্ঞানশক্তি। অর্থাৎ বিন্দুর উৎপত্তির পর মহালক্ষ্মী ঐ বিন্দুর স্বরূপ কি তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন, সেই জ্ঞানেচ্ছাই মহাস্বরস্বতীরূপিণী জ্ঞান শক্তি। ঐ জানিবার ইচ্ছার ফলে বিন্দুটি বিদীর্ণ হইলেন—না ভাঙ্গিলে তাহার ভিতর কি আছে কিরূপে জানা যাইবে? বিন্দুর ভেদ হওয়াতে পুনরায় সেই বিন্দু হইতে ত্রিশক্তিরূপিণী ত্রিমূর্ত্তি মিথুনাকারে নির্গত হইলেন। পুরাণ রূপকচ্ছলে এই বিষয়ের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—মহালক্ষ্মী তাঁহার অপর মূর্ত্তিদ্বয় মহাকালী ও মহাসরস্বতীকে বলিলেন 'তোমরা মিথুন সৃষ্টি কর,' এই বলিয়া নিজে এক রক্তবর্ণ কমলাসনস্থ পুরুষ এবং এক রক্তবর্ণা কমলাসনস্থা নারী এই মিথুনরূপ সৃষ্টি করিলেন,

অর্থাৎ তাঁহার নিজের তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ব্যক্তমূর্ত্তি এই পুরুষ ও নারীরূপে পরিণত হইল। ঐ পুরুষের নাম হইল ব্রহ্মা বিধি বিরঞ্চ এবং ধাতা; এবং ঐ মিথুনের নারীর নাম হইল—শ্রী পদ্মা কমলা ও লক্ষ্মী। মহাকালী যে পুরুষ ও নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, সেই মিথুনের পুরুষটির নাম হইল—রুদ্র শঙ্কর স্থাণু কপর্দ্দী ও ত্রিলোচন, এবং তিনি শ্বেতাঙ্গ রক্তবাহু নীলকণ্ঠ ও চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মহাকালীর সৃষ্ট নারীমূর্ত্তি শ্বেতবর্ণা হইলেন, এবং তাঁহার নাম হইল ত্রয়ী বিদ্যা কামধেনু ভাষা অক্ষরা ও স্বরা। মহাসরস্বতী যে মিথুনরূপে পরিণত হইলেন, তাহার নারীমূর্ত্তি গৌরবর্ণা হইলেন, এবং মিথুনের পুরুষটি কৃষ্ণবর্ণ হইলেন; পুরুষটির নাম হইল—বিষ্ণু কৃষ্ণ হৃষিকেশ বাসুদেব ও জনার্দ্দন; আর নারীর নাম হইল—উমা গৌরী সতী চণ্ডী সুন্দরী সুভগা ও শিবা। এইরূপে মহালক্ষ্মী মহাকালী এবং মহাসরস্বতী নিজ নিজ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া নরনারী মিথুনে পরিণত হইলেন। প্রত্যেক মিথুনের পুরুষ ও নারী—ভ্রাতৃভগিনী যুগল সম্বন্ধ, যেহেতু তাঁহারা সৃজন কর্ত্রীর পুত্র ও কন্যা স্থানীয়। আদিমাতা অলক্ষ্যরূপা মহালক্ষ্মী এখন ব্রহ্মার সহ শ্বেতবর্ণা ত্রয়ীর বিবাহ দিলেন; রুদ্রের সহ বরদা গৌরীর, এবং বাসুদেবের সহ লক্ষ্মীর বিবাহ দিলেন। তাহার পর ত্রয়ী সহ ভগবান বিরিঞ্চি এক অণ্ড সৃজন করিলেন, সেই অণ্ডটি গৌরী সহ ভগবান রুদ্র ভেদ করিলেন, এবং ঐ অণ্ডমধ্যে অহঙ্কারাদি তত্ত্ব সকল, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, এবং স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইল। লক্ষ্মী সহ ভগবান কেশব সেই জগতের পোষণ ও পালন করিতে লাগিলেন।

নারীমূর্ত্তি যে জগতের আদিসৃষ্টি, সুতরাং সমগ্র জগৎ যে নারী-মূর্ত্তির বিকাশ মাত্র, সেই প্রসঙ্গে পৌরাণিক রূপকচ্ছলে বর্ণিত

সৃষ্টিতত্ত্ব এখানে কথঞ্চিৎ প্রকাশ করা গেল। কুণ্ডলিনীর উৎপত্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা এই রূপকের অন্তরালে নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব। আদিমাতা মহালক্ষ্মীর অলক্ষ্যমূর্ত্তিই অব্যক্ত চিদাকাশ; তাঁহার ত্রিমূর্ত্তি ধারণ হইতে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের আবির্ভাব। মিথুনোৎপত্তি এবং মিথুনস্থ নরনারীর বিবাহ—গুণত্রয়ের ত্রিবৃৎকরণ। এই ত্রিবৃৎ করণ কি? ইহা পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের পঞ্চীকরণের ন্যায়—বিভাগ ও সংযোগ ক্রিয়া দ্বারা নূতন বস্তু উৎপাদন। সত্ত্বাদিগুণ পৃথক্ অবস্থায় বিদ্যমান থাকিলে সৃষ্টি হইতে পারে না, কারণ সৃষ্টি বিকাশের জন্যই তাহাদের উৎপত্তি, এবং গুণবৈষম্য হইতেই সৃষ্টির বিচিত্রতা। গুণত্রয় উৎপন্ন হইবা মাত্র তাহাদের প্রত্যেকে দ্বিধা বিভক্ত হন, এবং প্রত্যেকের এক অর্দ্ধাংশ পুনরায় দ্বিখণ্ড হন; এইরূপে প্রত্যেক গুণ তিন খণ্ড হইলেন—এক খণ্ড অর্দ্ধাংশ, ও অপর দুই খণ্ড প্রত্যেকে চতুর্থাংশ। সত্ত্বগুণের অর্দ্ধাংশ সহ রজোগুণের চতুর্থাংশ এবং তমোগুণের চতুর্থাংশ মিলিত হইয়া নূতন এক মিশ্রগুণ উৎপন্ন হইলেন, এবং ইহাতে সত্ত্বাধিক্য থাকাতে ইহাই এখন সত্ত্বগুণরূপে সৃষ্টিমধ্যে স্থাপিত হইল। এইরূপ রজোগুণের অর্দ্ধাংশ সহ সত্ত্বের চতুর্থাংশ এবং তমোগুণের চতুর্থাংশ মিলিয়া নূতন এক রজোপ্রধান গুণ উৎপন্ন হইলেন; এবং তমোগুণের অর্দ্ধাংশ সহ সত্ত্বের চতুর্থাংশ ও রজোগুণের চতুর্থাংশ মিলিয়া নূতন তমোপ্রধান গুণ উৎপন্ন হইলেন। এইরূপ বিশুদ্ধ গুণত্রয় হইতে যে ভাবে মিশ্র ত্রিগুণের উৎপত্তি হইল, তাহাকেই আগমে ত্রিবৃৎকরণ বলিয়াছেন। এই ত্রিবৃৎকরণ হইতে হরি-হর-ব্রহ্মা ত্রিদেবতা এবং তাঁহাদের ত্রিশক্তি উৎপন্ন হইলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রসিদ্ধ টীকাকার নাগোজীভট্ট এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—(১) স্বয়ং মহালক্ষ্মীর

দ্বারা উৎপন্ন ব্রহ্মা কর্ম্মতঃ রজোময় হইতেছেন, কারণ ইচ্ছাশক্তি মহালক্ষ্মী রজোগুণময়ী, এবং ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ আখ্যা প্রদান করাতে ব্রহ্মা রূপতঃও রজোময় হইতেছেন, তাঁহাতে সেই জন্য দুই ভাগই রজোগুণ হইতেছে। ব্রহ্মার পত্নী ত্রয়ী মহাকালী হইতে উৎপন্ন, সেই জন্য ত্রয়ী কর্ম্মতঃ তমোগুণময়ী; কিন্তু ত্রয়ীকে শ্বেতবর্ণা বলা হইয়াছে, অতএব রূপতঃ তিনি সত্বময়ী হইতেছেন, সুতরাং ত্রয়ীতে তমঃ ও সত্ব সমভাগে অবস্থিত, এবং ব্রহ্মা ও ত্রয়ী এই দম্পতিতে দুইভাগ রজঃ একভাগ সত্ব ও একভাগ তমোগুণ ব্যবস্থিত হইতেছে। (২) বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এই দম্পতিতে দুই ভাগ রজোগুণ একভাগ সত্ব এবং একভাগ তমঃ ব্যবস্থিত। কারণ মহাসরস্বতী শুদ্ধসত্বময়ী, তাঁহার উৎপাদিত বিষ্ণু সেইজন্য কর্ম্মতঃ সত্বগুণ বিশিষ্ট, আর কৃষ্ণ নামে অভিহিত বলিয়া তিনি রূপতঃ তমোময়, যেহেতু তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ। অতএব বিষ্ণুতে একভাগ সত্বগুণ এবং একভাগ তমোগুণ অবস্থিত। তৎপত্নী লক্ষ্মী মহালক্ষ্মী হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি ব্রহ্মার ন্যায় কর্ম্মতঃ এবং রূপতঃ রজোময়ী, সেই জন্য লক্ষ্মীতে কেবল রজোগুণ দুইভাগ রহিয়াছে, এবং বিষ্ণু ও লক্ষ্মী দম্পতির পূর্ব্বোক্ত গুণবিভাগ হইতেছে। (৩) শুদ্ধ তমোগুণময়ী মহাকালীর উৎপাদিত বলিয়া, রুদ্র কর্ম্মতঃ তমোময়, এবং তাঁহাকে শ্বেতাঙ্গ বলাতে তিনি রূপতঃ সত্বময় হইতেছেন। অতএব রুদ্রে একভাগ সত্ব এবং একভাগ তমঃ এই গুণদ্বয় সাম্যাবস্থাতে অবস্থিত। তাঁহার পত্নী গৌরী গৌরবর্ণা হেতু রূপতঃ সত্বময়ী, এবং শুদ্ধসত্বমূর্ত্তি মহাসরস্বতীর উৎপাদিত বলিয়া গৌরী কর্ম্মতঃ সত্বগুণময়ী। অতএব গৌরীতে দুইভাগই সত্বগুণ অবস্থিত, এবং রুদ্র ও গৌরী দম্পতিতে সেই হেতু সত্বগুণের তিন ভাগ এবং তমোগুণের একভাগ ব্যবস্থিত হইতেছে। এই দম্পতিতে রজোগুণ আদৌ নাই।

মন্ত্রযোগের আচারকাণ্ডে এই গুণত্রয়ের বিভাগ জানা বিশেষ প্রয়োজনীয়—কারণ উপাস্য দেবতামূর্ত্তির গুণানুসারে উপাসনার বিধির প্রভেদ হইয়া থাকে। শুদ্ধ সাত্বিক দেবতা সাত্বিক ভাবেই পূজনীয়। রজোমূর্ত্তির উপাসনাতে উপচার বাহুল্য এবং কর্ম্মের পারিপাট্য আবশ্যক, আর তমোময় দেবতার জন্য কৃষ্ণপক্ষ অমানিশা মধুমাংস উপহার বিহিত হইয়াছে।

যে সমস্ত উপাস্যমূর্ত্তি এপর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে, সে সমস্তই এই ত্রিশক্তির অংশ বিশেষ, এবং সত্বাদি গুণের পরিমাণ বিভিন্নতা হইতেই তাঁহাদের পৃথক্ সত্বা। জগতের নারীমূর্ত্তিগুলিও এইরূপ ত্রিশক্তির মধ্যে কাহারও না কাহারও অংশ। নারীশক্তি সেই আদ্যাশক্তির স্থুল পরিণাম। জীবের মোহ হেতু তাহারা নারীতে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন শক্তিকে চিনিতে পারে না। জগতের আদিপুরুষ বিন্দুরূপে এবং আদ্যাশক্তি নাদরূপে অবস্থিত। জগতের নারীগণ সকলেই নাদরূপিণী, কিন্তু পুরুষগণ সকলে যে বিন্দুরূপী তাহা নয়। যাঁহারা প্রকৃতিকে—আপনার বুদ্ধিরূপিণী প্রকৃতিকে—সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহারাই পুরুষের অংশ। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছেন এবং আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহারা শক্তির ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র, শক্তির দ্বারা চালিত এবং প্রেরিত হইলেও তাঁহারা শক্তির স্বতন্ত্রতা বুঝিতে অক্ষম। জগতের পুংসৃষ্টি সমস্তই প্রচ্ছন্ন নারীশক্তি, তাহাদের নারীপ্রকৃতিতে (পত্নীতে) সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির লক্ষণ প্রতিভাসিত হয়। সেই শক্তিকে জানিতে পারিলে তিনি প্রসন্না হইয়া পুরুষত্ব প্রদান করেন। দেহগত পুংস্ব এবং স্ত্রীত্ব পরিচায়ক লক্ষণ নয়, জন্ম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জীবের পুংস্ব গিয়া স্ত্রীত্ব ঘটিতেছে, এবং স্ত্রীত্বের পুংস্ব লাভ হইতেছে, জীবের কর্ম্ম এবং বাসনা হেতু এই পরিবর্ত্তন

প্রধানতঃ সাধিত হয়। পুরাণে কথিত আছে যে পরস্ত্রী অপহরণকারী জন্মান্তরে বালবিধবা হইয়া থাকে। মন্ত্র গ্রহণের পর বিবাহ করিলে মন্ত্রশক্তির অনুরূপ ভার্য্যা গ্রহণ করা উচিত। বিবাহের পর মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইলে পত্নীর প্রকৃতি অনুসারে দেবতা ও মন্ত্র নির্ণয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নারীগণের প্রকৃতি অনুসারে তাঁহাদের দেবতা ও মন্ত্র বিচার করাও আবশ্যক।

অণিমাদি সিদ্ধিগুলি সকল যোগেরই যোগজ বিভূতি, বিশেষ বিশেষ সংযমের বিভিন্ন ক্রিয়াফল। স্বাগম—ব্রহ্মে চিত্ত সমাধানের নিজস্ব সিদ্ধি। স্বাগমের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে যোগভঙ্গ হইলে সাধক যোগভ্রষ্ট হন, তাঁহার প্রকৃতিলয়রূপ সাযুজ্যমুক্তি ঘটে না। স্বাগমে দিব্যবস্তুর দর্শন এবং দিব্যবাণীর শ্রবণ উভয়ই ঘটিয়া থাকে। স্বাগম মন্ত্ররূপী দেবতার প্রকাশ মাত্র—স্বাগমে দেবতার দিব্যজ্যোতির দর্শন হয়, সাধকের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জ্যোতিমধ্যে দিব্যমূর্ত্তির প্রকাশ হয়, এবং সেই সঙ্গে দিব্য নাদ ধ্বনিত হয়, ঐ নাদ যোগীর অহন্তাকে দিব্যমূর্ত্তিতে লয় করিয়া দেয়। যেমন জ্যোতির্ম্মধ্যে মূর্ত্তিপ্রকাশ, সেইরূপ নাদমধ্যে মন্ত্রপ্রকাশ। যদি সাধকের হৃদয়ে মূর্ত্তিদর্শনের অথবা দিব্যবাণী শ্রবণের বাসনা বা সংস্কার না থাকে, এবং সাধক নির্গুণ শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যে সমাহিত হইতে চান, তাহা হইলেও তাঁহার সমাধিকালে শুদ্ধজ্যোতির দর্শন এবং অব্যক্ত নাদধ্বনির শ্রবণ হইয়া থাকে। নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার—নিজে নির্গুণ না হইলে হইতে পারে না। সেই নির্গুণ অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে সগুণ ব্রহ্ম প্রকৃতির আবরণ অবশ্যই ভেদ করিতে হইবে। সাধকের আমিত্ব প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, তিনি নিজের বৈকারিক সত্তার মূল না পাইলে তাহার পরপারে যাইবার অধিকারী হইতে পারেন না। বিন্দু ও নাদ সেই মূল। বিন্দু ও নাদের উপলব্ধি সময়ে

জ্যোতির্দর্শন ও ধ্বনিশ্রবণ হইয়া থাকে। অতএব সকল যোগই পরিণামে মন্ত্রযোগে অবসিত হয়।

স্বাগমের মন্ত্র প্রায় বীজাত্মক—নাদযুক্ত বাণী, একটি মাত্র বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি—কোথাও বা 'তৎসৎ' প্রভৃতি স্বল্পাক্ষর বাক্য। পাণিনী যে চতুর্দ্দশ শিবসূত্র শিবারাধনার ফলে মহেশ্বর হইতে প্রাপ্ত হন, এবং তদ্দ্বারা ব্যাকরণের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ রচনা করেন, সেই চতুর্দ্দশ মাহেশ্বরসূত্র স্বাগম-লব্ধ। যে সিদ্ধাত্মার নিকট ঐ স্বাগমরূপী মন্ত্রময় দেবতার প্রথম আবির্ভাব হয়, তিনি তাঁহার সেই স্বাগম মন্ত্রের ঋষি নামে অভিহিত হন। স্বাগমপ্রাপ্ত ঋষির মুখ হইতে যে সকল সত্য-বাণী স্বতঃ নিঃসৃত হয়, তাহাই বেদ ও তন্ত্রাদিরূপ আগম। ব্রহ্মভাবে আবিষ্ট অবস্থায় উচ্চারিত হয় বলিয়া এই সকল বাণীও অপৌরুষেয়, কারণ সঙ্কল্পিত রচনাকেই পুরুষকৃত বলা যায়।

প্রত্যেক বেদমন্ত্রের এবং প্রত্যেক তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ঋষি নির্দ্দিষ্ট আছে। ঋষি তাঁহার দৃষ্ট মন্ত্রের প্রথম গুরু। কিন্তু আগমে মহাকালকে সর্ব্বমন্ত্রের আদিগুরু বলা হইয়াছে—যথা যোগিনী তন্ত্রে—

> আদিনাথো মহাদেবি মহাকালো হি যঃ স্মৃতঃ।
> গুরুঃ স এব দেবেশি সর্ব্বমন্ত্রেষু নাপরঃ॥
> শৈবে শাক্তে বৈষ্ণবে চ গাণপত্যে তথৈন্দবে।
> মহাশৈবে চ সৌরে চ স গুরুর্নাত্র সংশয়ঃ।
> মন্ত্রবক্তা স এব স্যান্নাপরঃ পরমেশ্বরি॥

"হে মহাদেবি! যাঁহাকে মহাকাল বলা হয়, সেই আদিনাথ সকল মন্ত্রের গুরু। শৈবে, শাক্তে, বৈষ্ণবে, গণপতিমন্ত্রে, চন্দ্রদৈবত মন্ত্রে, মহাশৈব এবং সূর্য্যমন্ত্রে, সকল মন্ত্রেই সেই মহাকাল একমাত্র মন্ত্রবক্তা গুরু, তিনি ভিন্ন আর কেহ গুরু হইতে পারেন না।" সৃষ্টিতত্ত্বের

বর্ণনাতে দেখা যাইবে যে এই মহাকাল স্বয়ং বিন্দুরূপী, এবং বিন্দু হইতে সমস্ত মন্ত্রদেবতা উদ্ভূত হইয়াছেন, সেইজন্য মহাকালকে সকল মন্ত্রের আদিনাথ বা আদিগুরু বলা হয়। মহাকাল সূক্ষ্ম তত্ত্বরূপে আছেন। যোগী সমাহিত অবস্থায় ঐ বিন্দুরূপ সূক্ষ্মতত্ত্বকে সাক্ষাৎকার করেন, এবং সেই সাক্ষাৎকার ফলে তাঁহার স্বাগম মন্ত্র প্রাপ্ত হন, সুতরাং মূলে বিন্দুরূপ মহাকালই সমাহিত যোগীর গুরু হইতেছেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি জগতে তাঁহার সমাধিলব্ধ বস্তু প্রথম প্রকাশ করেন, সেইজন্য তাঁহাকে মন্ত্রের প্রথম গুরু বলা যাইতে পারে। ফলতঃ আগমশাস্ত্রে—গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, এবং পরমেষ্ঠী গুরু ভেদে চারিজন গুরু, প্রতিমন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছেন—

আদৌ সর্ব্বত্র দেবেশি মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ।
পরাপরগুরুস্ত্বং হি পরমেষ্ঠী ত্বহং গুরুঃ॥

"সর্ব্বত্র অর্থাৎ সকল মন্ত্র বিষয়ে, যিনি আদিতে মন্ত্র প্রকাশ করেন তিনি সেই মন্ত্রের পরম গুরু। ব্রহ্মশক্তি তুমি সকল মন্ত্রের শক্তি—মন্ত্রের চৈতন্যরূপিণী, কারণ মন্ত্র-সাধকের নিকট তুমি মন্ত্রময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও—সেইজন্য তুমি সকল মন্ত্রের পরাপরগুরু—অব্যক্তরূপিণী তোমা হইতে মন্ত্রের উৎপত্তি বলিয়া তুমি 'পর', এবং তুমিই মন্ত্ররূপে ব্যক্ত হও বলিয়া 'অপর'। সদাশিব আমি মন্ত্রশক্তির আধার বলিয়া সকল মন্ত্রের পরমেষ্ঠী গুরু।" অতএব আদিনাথ মহাকাল মন্ত্রের পরমেষ্ঠী গুরু, মন্ত্রশক্তি পরাপর গুরু, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি পরমগুরু, এবং পরবর্ত্তী উপদেষ্টাগণ গুরুপদবাচ্য। মন্ত্রোপদিষ্ট সাধক উপদিষ্ট মন্ত্রের সিদ্ধিদ্বারা দেবতার সাক্ষাৎকার পাইলেও তিনি ঋষি হইতে পারেন না। মন্ত্রদেবতার প্রথম দ্রষ্টাই ঋষিপদবাচ্য।

যখন পৃথিবী প্রলয়ের জলপ্লাবনে মগ্ন ছিলেন, সেই একার্ণব মধ্যে

মধু ও কৈটভ নামে দুইজন ভাসিতেছিলেন। পুরাণে তাঁহারা অসুর নামে কথিত হইয়াছেন। 'মন' ধাতু নিষ্পন্ন 'মধু' আসক্তি ও বাসনার মূর্ত্তি; আর 'কীট' ধাতুর অর্থ রঞ্জিত করা, কীটের ন্যায় প্রভা যাহার সে 'কীটভ', এবং কীটভ হইতে উৎপন্ন ব্যক্তি 'কৈটভ'। বিষয় চিত্তকে রঞ্জিত করে, সেই অনুরাগ প্রত্যাহত হইলে ক্রোধে অথবা ক্ষোভে পরিণত হয়—অতএব 'কীটভ' অর্থে বিষয়, এবং 'কৈটভ' অর্থে বিষয়-নাশ জনিত ক্রোধ বা ক্ষোভকে বুঝাইতে পারে। সৃষ্টি জলমগ্ন হইলেও বাসনা ও বিষয়জ্ঞান লয় হয় নাই, কারণ যে প্রলয়ে পঞ্চভূতের একভূত জল অবশেষ রহিল তাহা কখনই মহাপ্রলয় হইতে পারে না, কেবল সৃষ্টির ঘনীভূত কঠিনাবস্থা তিরোহিত হইয়া তখন দ্রবরূপে পরিণত হইয়াছিল মাত্র। আকাশ বায়ু এবং তেজ ইহারাও লয় হইয়াছিল বলা যায় না—কারণ উহারা জলতত্ত্বের আদিভূত। জীবের বাসনা কঠিনা-বস্থাপন্ন মহীতে আবদ্ধ, মহী জগতের স্থূল আধার, জীবের ভোগ্য বিষয় মহীতে লভ্য, সেই জন্য চণ্ডীস্তবে বলিয়াছেন—'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি'—মহীরূপে তুমি জগতের এক-মাত্র আধার হইয়া আছ। মহী জলপ্লাবনে অন্তর্হিত হওয়াতে জীবের ভোগ্য বিষয় চলিয়া গেল। ভোগ্য বিষয়ের হরণে ক্ষোভের উদয় অবশ্যম্ভাবী, সেই ক্ষোভ ক্রোধেরই রূপান্তর—যেখানে অপহর্ত্তা কোন ব্যক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে, সেখানেই ক্রোধ হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষ কেহ না থাকাতে বিষয়চিন্তা এবং বিষয়নাশ জনিত ক্ষোভই উৎপন্ন হইয়াছিল। জীবজগৎ স্থূলদেহ হারাইল বটে, কিন্তু তাহাদের বাসনা এবং ভোগ্য দেহাদি বিষয়ের নাশজনিত ক্ষোভ রহিয়া গেল—মধু ও কৈটভ সেই বাসনা ও ক্ষোভের রূপক মাত্র। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মধু বিষয়বাসনা, এবং কৈটভ বিষয়নাশজনিত ক্ষোভ ভিন্ন আর

কিছু হইতে পারে না। পুরাণে ইহারা বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন অসুরদ্বয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহারও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই যে অপশব্দকেই কর্ণমল বলা যায়—যে সকল শব্দ ব্রহ্মবাচক অথবা ব্রহ্মচৈতন্যের ভাবব্যঞ্জক, যাহা শুনিলে অথবা যাহার অর্থ হৃদয়ে বোধিত হইলে চিত্ত অন্তর্মুখী হয় এবং প্রত্যক্‌চৈতন্যের অনুভূতি আস্বাদনে আকৃষ্ট হয়, সেই শব্দই প্রকৃত সংস্কৃত শব্দ। আর যে সকল শব্দ ভোগ্যবিষয়-বাচক, যাহার শ্রবণে মন এবং ইন্দ্রিয়গণ ভোগাভিলাষ পরায়ণ হয় বা বিষয়রসে রঞ্জিত হয়, ঐ শব্দ জীব ও ব্রহ্মের একাত্মভাব ভুলাইয়া দেয়, সেই জন্য উহা কর্ণের মলস্বরূপ। সমস্ত বাসনা বিষয়ক শব্দ, এবং মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়বাচক শব্দ, প্রত্যক্‌চৈতন্য বিষ্ণুর কর্ণমল। আবার এই দুই জন আদি অসুরও বটে। যাঁহারা আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভেদ বলিয়া জানেন, সচ্চিদানন্দ রস যাঁহাদের একমাত্র আস্বাদনের বস্তু, তাঁহারাই নির্ম্মল ব্রহ্মজ্যোতি-বিশিষ্ট দেবতা পদবাচ্য—সুর। আর যাহারা আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত, সর্ব্বদা ভৌতিক বিষয়রসে মগ্ন, সুতরাং কামনার বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটিলে ঘোর কর্ম্মের জন্য উদ্যত হয়, যে সকল প্রকৃতি নিরন্তর ক্রূরকর্ম্মা—তাহারা সাম্যরসে সম্পূর্ণ বর্জ্জিত, স্নিগ্ধ ব্রহ্মজ্যোতির প্রকাশ তাহাদের আদৌ নাই, তাহারাই অসুর নামে কথিত হয়। সুর ও অসুরের মধ্যবর্ত্তী মানব সৃষ্টিতে উভয়ের গুণ কিছু কিছু আছে। সমগ্র সুরলোক যে আত্মজ্ঞানপূর্ণ তাহা নয়, আর অসুরযোনিতে সকলেই আত্মজ্ঞান বিহীন নয়। সৃষ্টির সর্ব্বত্র ক্রমবিকাশ একটা নিত্য ধর্ম্ম। শুদ্ধ সত্ত্ব, শুদ্ধ রজঃ, এবং শুদ্ধ তমঃ কোথাও থাকিতে পারে না। তিন গুণের মিশ্রণে সৃষ্টির বিকাশ। বিশেষ বিশেষ গুণের অংশাধিক্য জনিত তারতম্য সকল যোনিতেই লক্ষিত হয়—আবার একযোনি মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ যেমন আছে,

সেইরূপ শ্রেণীমধ্যেও অবান্তর শ্রেণী এবং ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে গুণের তারতম্য অনুসারে কেহ উর্দ্ধভূমি লাভ করিতেছেন, কেহ বা নিম্নভূমিতে পতিত হইতেছেন। আত্মধর্ম্ম যেখানে সুরক্ষিত সেখানে উর্দ্ধগতি না হউক, পতনের আশঙ্কা নাই—

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

"ধারণ করা অর্থে ধর্ম্মশব্দ কথিত হইয়াছে। ধর্ম্মই প্রজাগণকে ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদের অধোগতি নিবারণ করে—যাহা কিছু এই ধারণশক্তি বিশিষ্ট, সে সমস্ত নিশ্চয়ই ধর্ম্মপদ বাচ্য।" এখন গল্পচ্ছলে পুরাণ যাহা বলিতেছেন তাহার অনুসরণ করিতেছি।

যখন মধু ও কৈটভ প্রলয়ের জলরাশিতে ভাসিতেছিলেন, তখন অন্য দেহধারী ব্যক্তির সৃষ্টি হয় নাই। আর কেহ তখন সেখানে ছিলেন না, কারণ ব্রহ্মার আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে উহারা জলে ভাসিতেছিল। তখন তাহারা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল—"কারণ ভিন্ন ত কোন কার্য্য হইতে পারে না, এবং আধার ব্যতীতও আধেয় থাকিতে পারে না, অতএব এই জলরাশি কাহার দ্বারা এবং কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে—কেই বা এই জল ধারণ করিয়া আছে? আমরাই বা কিরূপে এবং কোথা হইতে, ও কি জন্য উৎপন্ন হইয়াছি? কেনই বা আমরা এই জলমধ্যে পড়িয়া আছি? আমরা ত জলে মগ্ন হইতেছি না, কিন্তু যেন কোনও অচলা মহাশক্তি আমাদিগকে জলের উপর ধারণ করিয়া আছেন। যে শক্তির প্রভাবে আমরা এই জলের উপর অক্লেশে অবস্থান করিতেছি, আমাদের অনুমান হয় যে সেই শক্তি এই জলেতেই আছেন—এই জলরাশিও সেই শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং শক্তিরূপ আধারে আমরা অবস্থিত রহিয়াছি। সেই শক্তি হইতেই আমরা উৎপন্ন

হইয়াছি—এবং তিনিই মূলকারণ।” দানবদ্বয় এইরূপ বিচার করিয়া সকলের মূল কারণ যে শক্তি, ইহাই নিশ্চয় করিল। এইরূপ বোধপ্রাপ্ত হইলে তখন তাহারা আকাশে এক সুমনোহর ধ্বনি শ্রবণ করিল। ঐ ধ্বনি ঐঁ এই শব্দময়, তন্ত্রে যাহার নাম বাক্‌বীজ বা বাগ্‌ভববীজ। ঐ ধ্বনি তাহাদের চিত্তমধ্যে দৃঢ় নিবিষ্ট হইল, তাহারা নিরন্তর ঐ ধ্বনির চিন্তারূপ অভ্যাসে রত হইল। কোন বিশিষ্ট ধ্বনির নিরন্তর মনোমধ্যে আবর্ত্তন করিবার নাম জপ।, তাহারা ঐ জপরূপ অভ্যাস করিতে থাকিলে একদিন আকাশে তড়িৎলতার ন্যায় জ্যোতি দর্শন করিল। তখন তাহাদের পুনরায় বিচার জনিত এইরূপ ধারণা হইল—“এই জ্যোতি আমাদের পূর্ব্বশ্রুত ধ্বনির মূর্ত্তি। যে শক্তিকে আমরা সকলের মূলাধার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলাম, তিনিই ধ্বনিরূপে প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এখন আবার জ্যোতিরূপে প্রকাশ হইলেন। ধ্বনি সেই আদিকারণ শক্তির মন্ত্র, এই জ্যোতি সেই মন্ত্রের ধ্যান।” এইরূপ জপ ও ধ্যানাসক্ত হইয়া তাহারা সিদ্ধিলাভ করে এবং অন্যের অবধ্য হয়—তাহাদের স্বেচ্ছাতেই তাহারা বিষ্ণুর বধ্য হয়।

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণ এই উপাখ্যান ছলে বুঝাইতেছেন যে মন্ত্র এবং মন্ত্রের ধ্যেয় মূর্ত্তি—আদিকারণ ব্রহ্মশক্তিতে চিত্তের অভিনিবেশের ফল। সাধক ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য একান্ত পিপাসু হইয়া যখন বিষয়ান্তরের চিন্তা হইতে বিরত হয়, তখনই সংযম আসে। সেই সংযত অবস্থাতে চিত্ত একনিষ্ঠা লাভ করে, তাহাকেই চিত্তের সমাধান বলে, এবং চিত্তের সমাধানই যোগশব্দবাচ্য—যোগঃ সমাধিঃ। এই সমাধি অর্থাৎ চিত্তসমাধান—একমাত্র ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তকে সংস্থাপন—না হইলে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ ঘটে না।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কি? এই চিন্তাতে সমাহিত চিত্তে—

'তৎ সবিতুর্বরেণিয়ম্'—সমগ্র ঋগ্বেদের সারস্বরূপ. ব্রহ্মবিদ্যা সাবিত্রী মন্ত্রের প্রথম পাদ, মহামন্ত্র উদ্ধার হইয়াছিল। এ সমস্ত দৃশ্যমান বাহ্য-জগৎ, এবং যাহা আমাদের অন্তরাকাশে উদিত হয় তাহাও—'তৎ' (=পরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্)—যে অবিনাশী সত্য বস্তু সর্ব্ব-ব্যাপিরূপে অবস্থিত, সুতরাং যাহা সর্ব্বাতীত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (পরম্)—এ সমস্ত সেই পরবস্তু। সেই পরবস্তু এই জগতের আদি কারণ, সুতরাং তিনি সবিতা। ষূ ধাতুর অর্থ প্রেরণ করা, 'সুবতি স্ব স্ব ব্যাপারে প্রেরয়তি যঃ সঃ সবিতা'—যিনি চরাচর বিশ্বকে নিজ নিজ কার্য্যে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই সবিতা। যে হেতু এই বিশ্ব সেই 'সবিতুঃ' অর্থাৎ জগন্নিয়ামক পরবস্তুর অজ্ঞাসম্ভূত, অতএব তাঁহারই কিরণমালা-স্বরূপ, সেইজন্য আমাদের 'বরেণিয়ম্'—মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-গণকে সংযত করিয়া বরণীয়, উপাসনীয়।

এইরূপ, উপাসনা কি? এই চিন্তার ফলে যজুর্ব্বেদের সার মর্ম্ম, ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ উদ্ঘোষিত হইয়াছে—'ভর্গো দেবস্য ধীমহি'—যিনি নিজ মহিমাতে সর্ব্বদা দীপ্তিমান, এই বিশ্বের সৃজন পালন ও সংহরণ যাঁহার ক্রীড়া, যিনি শরণাগতকে তাহার অভীষ্ট প্রদান করেন এবং তাহার তাপত্রয় নাশ করেন, যিনি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অতীত স্বীয় দিব্যধামে নিয়ত আত্মানন্দে বিরাজ করেন, সেই পরমেশ্বর দেবশব্দে অভিহিত হন। আমরা সেই দেবকে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি না, কিন্তু জগদভ্যন্তরে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী জগৎসাক্ষী তাঁহার 'ভর্গ' অর্থাৎ জ্যোতিকে আমরা দেখিতেছি। ঐ তেজ আমাদের পাপসকল এবং সংসারজনিত জরা মরণ ও দুঃখকে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে সক্ষম বলিয়া সেই তেজের নাম ভর্গ—ভ্রস্জ্ ধাতুর অর্থ পাক বুঝায়, 'ভর্জ্জন্তি নশ্যন্তি পাপানি সংসারজরামরণদুঃখানি যেন

তদ্‌ভর্গঃ।' অতএব সেই পরমেশ্বরের দৃশ্যমান এবং হৃদয়মধ্যে চিন্ত্যমান জ্যোতিই আমাদের উপাস্য, এবং সেই জ্যোতির ধ্যানই আমাদের উপাসনা।

উপাসনার প্রয়োজন কি?—জীবের আকাঙ্ক্ষাপূরণ এবং কর্ত্তব্য পালন। কেবল আকাঙ্ক্ষাপূরণ লক্ষ্য থাকিলে জীবের ক্রমোন্নতি হইতে পারে না—নিষিদ্ধাচরণ করিয়াও অনেক অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু নিকৃষ্ট গতিই তাহার ফল; আবার কর্ত্তব্যের অবহেলা জনিত প্রত্যবায় দ্বারাও অধোগতি হয়, যেমন অসমর্থ পিতামাতা পত্নী বা সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাড়্‌ধর্ম্ম গ্রহণ করা। এক কর্ত্তব্য পালন লক্ষ্য থাকিলে নিষিদ্ধের ত্যাগ আপনিই হয়, কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে গেলেই অকর্ত্তব্য গুলির পরিহার করিতে হয়। সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় পাদ সামবেদরূপিণী সরস্বতী শিক্ষা দিতেছেন—'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—পরমেশ্বরের সেই ভর্গ আমাদের মন প্রাণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ বিষয়ে প্রেরণ করুন। অজ্ঞ জীব চতুর্ব্বর্গ লাভের জন্য পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করে কেন?—নিজের বুদ্ধিবলের উপর নির্ভর করিয়া জীব ভ্রান্তমার্গে ধাবিত হইতে পারে, সেই জন্য যাহাতে তাহার মন প্রাণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ উদ্দেশ্য সফলের জন্য ঠিক পথে চালিত হয়, তাই সে পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করে। 'ধিয়ঃ' এই বহুবচন নির্দ্দেশের দ্বারা জীবের বুদ্ধি মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ এবং তাহাদের কর্ম্ম সমস্তই গৃহীত হইয়াছে। 'প্রচোদয়াৎ' অর্থে প্রকর্ষেণ প্রেরয়েৎ—প্রকৃষ্টরূপে চালিত করুন, যাহাতে বুদ্ধি প্রভৃতি বিপথগামী না হয়, তাহাই জীবের প্রার্থনা। প্রকৃষ্ট জ্ঞানের নাম প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা থাকিলে জীবকে ভ্রমজালে পড়িতে হয় না, প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবী

সরস্বতী সেই জন্ম এই তৃতীয় পাদের দেবতা। জ্ঞানলাভই উপাসনার চরম উদ্দেশ্য, তাই ব্রহ্মবিদ্যার শেষ পাদ জীবকে জ্ঞানদাত্রী সরস্বতীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা দিতেছেন। সামবেদ নাদ স্বরূপ। সামবেদ গানের দ্বারা নাদেরই অভ্যাস হয়—নাদ হইতে জগৎ উৎপন্ন এবং নাদেই জগতের লয়—নাদ হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ লাভ হয়—সরস্বতীও স্বয়ং নাদরূপিণী—তাই ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় পাদও নাদ হইতে অভিন্ন সামবেদ স্বরূপ, এবং তিনি উপাসনার প্রয়োজন কি তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

সংকল্প-পুরুষ সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা যখন আবির্ভূত হন, তখন (পুরাণমতে) তিনিও আত্মবিস্মৃত ছিলেন। তখন তিনি আত্ম-চিন্তাতে সমাহিত হইলে চিদাত্মা বিষ্ণুর কৃপায় তাঁহার স্মৃতি উদিত হয়—পূর্ব্বকল্পের সংস্কার বিকসিত হয়—অকার উকার মকার ও বিন্দু এবং নাদ ঘটিত ত্রয়ীবিদ্যাময় প্রণব প্রস্ফুরিত হয়। অমনি প্রণবের প্রথম তিন মাত্রারূপ ব্যাহৃতিত্রয়ের আবিষ্কার হইল। প্রথম মাত্রা অকার হইতে ভূর্লোকের আবিষ্কার, দ্বিতীয় মাত্রা উকার হইতে ভুবর্লোকের এবং তৃতীয় মাত্রা মকার হইতে স্বর্লোকের প্রতীতি হইল। এই ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ সমগ্র চেতন ভূমির সমাহার বলিয়া ইহাদের নাম ব্যাহৃতি। চিদাকাশ চেতন আকাশে পরিণত হওয়াই সৃষ্টিবিকাশ। চিদাকাশ অব্যক্ত, আর চেতনাকাশ ব্যক্তভূমি। সৃষ্ট জগতের সর্ব্বত্রই চেতনাকাশ। সেই সমগ্র সৃষ্ট জগতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোকের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া উহাদের নাম ব্যাহৃতি—বা সমুচ্চয়, একত্র সংগ্রহ। চেতন-ভূমির পরপারে এবং চিদাকাশে বিন্দুরূপী মহাকাল, তাহার পর নাদরূপিণী চিৎশক্তি। শৈব ও শাক্ত দর্শনমতে বিন্দু মহাকাল,

বৈষ্ণবদর্শনে তিনি মহাবিষ্ণু। চিৎশক্তিকে আগমে ত্রিপুরসুন্দরী (ষোড়শী-বিদ্যা) বলা হয়—তিনিই মহাদুর্গা মহাকালী এবং মহাতারা, তিনি ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই ত্রিশক্তিরূপে ত্রিকোণাকারে যোগীর ধ্যান গোচর হন বলিয়া তাঁহার নাম ত্রিপুরা। সমগ্র প্রণব মধ্যে ব্যক্ত অব্যক্ত সমস্তই রহিয়াছেন বলিয়া প্রণবের জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, প্রণবই ব্রহ্মার নিঃশ্বসিত মূল বেদ, প্রণবের প্রথম তিনমাত্রা যথাক্রমে ত্রিবেদরূপে স্ফুরিত হইয়াছে। প্রথম মাত্রা অকার হইতে ঋগ্বেদ, দ্বিতীয় মাত্রা উকার হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং তৃতীয় মাত্রা মকার সামবেদ স্বরূপ। সেই জন্য প্রণবের নাম আগমে বেদাদিবীজ। প্রণবে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রণব ও ব্রহ্ম অভেদ—

ভূর্ভুবঃ স্বরিমে লোকাঃ সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতাঃ।
যস্য মাত্রাসু তিষ্ঠন্তি তৎ পরং জ্যোতিরোমিতি॥
ত্রয়ঃ কালাস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ঃ স্বরাঃ।
ত্রয়ো দেবাঃ স্থিতা যত্র তৎ পরং জ্যোতিরোমিতি॥
ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং ব্রাহ্মী রৌদ্রী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥
অকারশ্চ উকারশ্চ মকারো বিন্দুসংজ্ঞকঃ।
ত্রিধা মাত্রা স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥
বচসা তজ্জপেদ্বীজং বপুষা তৎসমভ্যসেৎ।
মনসা তৎ স্মরেন্নিত্যং তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥

"ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোক, চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি এই তিন দেবতা—যাহার তিন মাত্রাতে অবস্থিত, তাহাই সেই ওঙ্কাররূপ পরম জ্যোতি। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কাল, ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন চৈতন্য,

উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিন স্বর, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতা—এ সমস্ত সেই ওঁকাররূপ পরম জ্যোতি। ইচ্ছা-রূপিণী ব্রাহ্মী শক্তি, ক্রিয়ারূপিণী বৈষ্ণবী শক্তি, জ্ঞানরূপিণী রৌদ্রী শক্তি—এই তিন শক্তি যাহাতে অবস্থিত, তাহাই সেই ওঁকাররূপ পরম জ্যোতি। অকার উকার এবং বিন্দুসংজ্ঞক মকার—এই তিন মাত্রা—যাহাতে অবস্থিত তাহাই সেই ওঁকাররূপ পরম জ্যোতি। সেই পরম জ্যোতি—ওঙ্কারকে সর্ব্বদা উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করিবে, প্রাণায়াম দ্বারা শরীরে অভ্যাস করিবে, এবং মনের দ্বারা সর্ব্বদা স্মরণ করিবে।" প্রথম মাত্রা অকার সূর্য্যস্বরূপ—সূর্য্যের দ্বাদশ কলা—অতএব দ্বাদশবার প্রণবের জপ সহকারে সূর্য্যমণ্ডল ধ্যান করিয়া বায়ুর পূরক করিতে হয়। দ্বিতীয় মাত্রা উকার চন্দ্রমণ্ডল, ষোড়শ কলা যুক্ত—চন্দ্র মণ্ডল ধ্যান করিয়া ষোড়শবার ওঁকার জপে কুম্ভক করিতে হয়। তৃতীয় মাত্রা মকার বহ্নিমণ্ডল, দশকলা যুক্ত—বহ্নিমণ্ডল ধ্যান সহকারে দশবার প্রণবজপে রুদ্ধবায়ুকে রেচন করিতে হয়। প্রাণায়াম কালে এইরূপ প্রণবজপই প্রণবের কায়িক অভ্যাস। ইহা ছাড়া সূক্ষ্ম অন্তঃপ্রাণায়ামে প্রণবের মাত্রা চিন্তা করা, নিজের দেহ প্রাণ মন প্রণবধ্বনিময় চিন্তা করা, প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক সকল কার্য্যে শক্তি প্রয়োগ—অন্য বিবিধ উপায়ে প্রণবের অভ্যাস শরীরে হইতে পারে।

চিদাকাশে সমাহিত অবস্থায় ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রণবরূপী বেদ উদ্ভাসিত হয়, প্রণবগঠিত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, তাই ভাগবত বলিতেছেন—'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে'—যে পরমাত্মা আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদরূপ ব্রহ্ম (চিদ্‌জ্যোতি) সঞ্চারিত করিয়াছেন। ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহার প্রথম সৃষ্ট মানস পুত্রগণ চিদাত্মাতে সমাহিত হইয়া দিব্য বস্তুর দর্শন ও দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া প্রজাপতিত্ব পাইয়াছেন। যিনি

যখন যে কামনা সিদ্ধির জন্য ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন, তিনি তদনুরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কেহ বা নিজের জন্য, কেহ পুত্রাদি আত্মীয়-গণের জন্য, আবার কোন মহাত্মা জগতের মঙ্গল কামনায় ব্রহ্মধ্যানে রত হইয়া অভীপ্সিত ফল পাইয়াছেন। ব্রহ্মধ্যান কোন যুগে কোন ব্যক্তির জন্য কখনই নিষ্ফল হয় নাই, কখনও নিষ্ফল হইবে না। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনিই সাক্ষাৎ ভূদেবতা, কারণ জীবন্মুক্তি অবস্থাতেই মনুষ্য মানব দেহে দেবত্ব লাভ করে, এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জনিত জ্ঞানই বেদ। ব্রহ্মের সহ জীবের অভেদ জ্ঞানই আত্মজ্ঞান, এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তা দর্শনই ব্রহ্মজ্ঞান।

জগতের সর্ব্বত্রই ক্ষোভ—চিত্তের চঞ্চলতার নামই ক্ষোভ। কোথাও অভাবজন্য, কোথাও ভয় ও কষ্টের জন্য, কোথাও অভিনব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা জন্য, চিত্ত নিরন্তর ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছে। এই ক্ষোভ থাকিতে শান্তি আসিতে পারে না, আর শান্তি না হইলেই বা সুখ কোথায়—'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্।' ক্ষোভের শান্তি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় চিত্তচাঞ্চল্যের শমতা। যিনি এই ক্ষোভ নিবৃত্তির উপায় অন্বেষণে পরমাত্মাতে সমাহিত হইয়াছিলেন, তিনিই ব্রহ্মময়ী শ্রীতারা মূর্ত্তির প্রথম দ্রষ্টা—অক্ষোভ্য ঋষি। শ্রীতারা প্রকৃতির বিরাট্ মূর্ত্তি—ব্রহ্মের স্থূলদেহ। জগৎকে বিরাট্‌রূপিণী তারা বলিয়া জানিলে, সাধকের আর ক্ষোভজনিত ত্রাস হয় না, অভাব বোধ থাকে না, তখন 'নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ' এই ভাব আসাতে জীব অকিঞ্চন হইয়া যায়।

কোন্ মহাশক্তির বলে শূন্য গগনে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি অবস্থিত রহিয়াছে? কাহার আকর্ষণে তাহারা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট মার্গের অতিক্রম করিতে সমর্থ নয়? কে সমুদ্রতল হইতে পর্ব্বতকে তুলিতেছে,

পর্ব্বতকে সমুদ্রতলে নিমগ্ন করিতেছে? অগ্নির তেজ কোথা হইতে? প্রাণীগণের শক্তি কোন্ শক্তি হইতে? এইরূপে শক্তির অনুসন্ধানে সমাহিত ভৈরব ঋষি শ্রীকালী বিদ্যার আবিষ্কার করেন। শ্রীকালী বিশ্বের ক্রিয়া শক্তি। এইরূপ সৃষ্টির মূলশক্তি অনুসন্ধানে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিরও আবিষ্কার হয়। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকালী একই শক্তি—ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াশক্তি—সাধকের ভাব নিবন্ধন মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা মাত্র, উভয়ের মন্ত্রও কিঞ্চিৎ বিভিন্ন, তাহাও বৈয়াকরণের মতে ভিন্ন নয়, কারণ রকার ও লকার এবং ঋকার ও ৯কার পরস্পর সবর্ণ। মন্ত্রাচার উভয়েরই এক প্রকার। দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের ঋষি। নারদ শ্রীদুর্গা মন্ত্রেরও ঋষি, কিন্তু সে নারদ অন্য ঋষি, কারণ তাঁহার ধ্যান রহস্য দ্বারা তাঁহাকে রুদ্রাবতার বলিয়াই অবগত হওয়া যায়।

বিরাট্ জগতের মধ্যে যে চৈতন্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, অথচ যাহা আমাদের অলক্ষ্য, যে চৈতন্য বিশ্বকে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় নাচাইতেছেন—সেই সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম শক্তির অনুসন্ধানে ধ্যাননিরুদ্ধচিত্ত দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি ত্রিপুরসুন্দরী বিদ্যার প্রথম দ্রষ্টা। শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তি শিবমূর্ত্তির ভেদ। শ্রীত্রিপুরসুন্দরী শ্রীবিদ্যার সিংহাসন পঞ্চখুর বিশিষ্ট, সেই পঞ্চখুর যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর ও সদাশিব। পঞ্চখুরের উপর সিংহাসনের ফলকরূপে পরশিব শায়িত আছেন। সেই পরশিবের নাভিপদ্মের উপর শ্রীবিদ্যা সমাসীনা। এই রূপকের অন্তরালে ষট্‌চক্রস্থ ষট্‌পদ্ম ও ষট্ দেবতা, এবং ষট্‌চক্রের অতীত ঊর্দ্ধস্থ সহস্রদল কমল এবং তাহাতে অবস্থিতা মহাশক্তি, এই সকল রহস্য তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। মূলাধারে কঠিনীভূত পৃথ্বীতত্ত্বে ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠানে রসতত্ত্বে বিষ্ণু, মণিপুরে তেজস্তত্ত্বে রুদ্র, অনাহতে স্পন্দনাত্মক বায়ুতত্ত্বে ভূত-জগতের প্রেরণকর্ত্তা ঈশ্বর, কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধচক্রে আকাশতত্ত্বে সর্ব্বব্যাপী

সদাশিব, মনবুদ্ধি ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র আজ্ঞাচক্রে অন্তরাত্মারূপী পরশিব, এবং জগতের এই স্থূল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির পরপারে সকলের কারণরূপিণী শ্রীবিদ্যা সপ্তমপদ্ম সহস্রারে নির্লিপ্তভাবে রহিয়াছেন—জগৎ তাঁহার ইচ্ছাসম্ভূত, তাঁহাতেই অবস্থিত, অথচ তিনি জগতের অতীত! শ্রীদুর্গা বিদ্যার মূর্ত্তিভেদ শ্রীজগদ্ধাত্রী মহাবিদ্যা এই ত্রিপুর-সুন্দরী শ্রীবিদ্যার রূপকান্তর। শ্রীজগদ্ধাত্রী সিংহের উপরিস্থিত মহাপদ্মে অবস্থিতা। সিংহের পাদচতুষ্টয়, পৃষ্ঠ এবং স্কন্ধ যথাক্রমে ব্রহ্মাদি ষট্‌চক্রস্থ ষট্‌শিবের রূপক মাত্র। দেবী যে পদ্মে সমাসীনা, উহা তাঁহারই নাভিপদ্মস্থ মৃণালাগ্রে গ্রথিত, সুতরাং দেবী নিম্নস্থ তত্ত্ব সমুদয়ে নির্লিপ্ত অথচ তাহাদের কারণরূপিণী। শ্রীজগদ্ধাত্রী ও শ্রীত্রিপুরসুন্দরী উভয়েই শ্রীসুন্দরী নামে আগমে পরিচিত। শ্রীতারা শ্রীকালী এবং শ্রীসুন্দরী যথাক্রমে বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর বা শক্তি। একমাত্র ব্রহ্মশক্তি এই ত্রিশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ত্রিশক্তি জগতের সর্ব্বত্র ওতপ্রোত হইয়া আছেন, কেহই তাঁহাদের বিশ্লেষণ করিতে পারেন না। যাহা ত্রিশক্তির অতীত তাহাই তুরীয় (চতুর্থ)—অব্যক্ত চিৎশক্তি, যিনি পুরুষোত্তম পরমশিব নারায়ণ চিদ্ব্রহ্ম প্রভৃতি নামে কথিত হইলেও বস্তুতঃ তিনি নামরূপের অতীত নির্গুণ তত্ত্ব।

সেই তুরীয় চিদাকাশে চিত্তসমাধানই সকল যোগের চরম ফল। 'হংসঃ'—শূন্য আকাশ শক্তিময়, শিবশক্তি একাত্মভাবে অবিচ্ছেদে অবস্থিত, অতএব আমি সেই চিদ্বস্তু হইতে অভিন্ন; 'সোহম্‌'—তিনিই আমি, সেই চিদ্বস্তুই আমিরূপে অবস্থিত, বস্তুতঃ ভেদ বিবর্জ্জিত; 'তত্ত্বমসি'—তুমি জীব ও সেই চিদ্বস্তু অভিন্ন—এই সকল বেদান্তবাক্য, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধক মহামন্ত্র বা মহাবাক্য, চিদাকাশে নিষ্কাম যোগীর চিত্তসমাধানের ফলে উদ্ধার হইয়াছে।

ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরাকার হইলেও ব্রহ্মশক্তির কল্পিত জীব সেই শক্তি হইতে অভিন্ন বস্তু। জীবের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সেই শক্তি কালভেদে নানারূপে বিজৃম্ভিত হইতেছে। ব্রহ্মশক্তির এই প্রকাশ হেতু নানা দেবতার এবং নানা মন্ত্রের আবির্ভাব। মন্ত্র দেবতার ধ্বনিময় দেহ, আর জ্যোতি দেবতার দ্যুতিমান মূর্ত্তি। মন্ত্র এবং জ্যোতি একই বস্তু—সেই ব্রহ্মশক্তি। যতক্ষণ জ্যোতিদর্শন এবং তৎসঙ্গে মন্ত্রগত নাদ শ্রবণ না হয়, ততক্ষণ মন্ত্র নির্জীব। হস্তপদাদি অঙ্গবিশিষ্ট মূর্ত্তিকল্পনা কেবল তত্ত্বজ্ঞান বিহীন প্রাথমিক সাধকের ধারণার জন্য। রুদ্রযামল তন্ত্র বলিতেছেন—'অজ্ঞানিনাং হি দেবেশ ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'—অজ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিবার জন্যই ব্রহ্মের সাকার ধ্যান কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু এই রূপকল্পনা কি মনুষ্যকৃত? তাহা হইতেও পারে। যেখানে সাধকের চিত্তপটে রূপকল্পনা ছিল না, সেখানে সাধকের মনোবৃত্তির অনুযায়ী কোনও রূপ ব্রহ্মশক্তি দেখাইয়াছেন। আবার যদি সাধক অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন অথবা উপদিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাকে সেই রূপই দেখান হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কল্পতরু—জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নানারূপ প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে বেশী কিছু নয়। সাধারণতঃ বীজমন্ত্রগত বর্ণ হইতে দেবতার বর্ণ, এবং তত্তৎ বীজের নাদগত ঋজু বক্র গতি হইতে অঙ্গকল্পনা, ও নাদের মধুর ঘোর প্রভৃতি ভাব হইতে মূর্ত্তির স্নিগ্ধতা বা উগ্রতা লক্ষিত হয়। বীজগত ব্যঞ্জনবর্ণের সম্মিলন হইতে নাদের ঘোরাদি ভাব উৎপন্ন হয়—নৃসিংহ বীজ ক্ষ্রৌঁ, উগ্রতারার হূঁ, লক্ষ্মীর শ্রীঁ, ইহাদের উচ্চারণে নাদভেদ হইতে ইহা স্পষ্ট অনুমিত হয়।

তন্ত্রোক্ত বীজগুলি ব্রহ্মদ্রষ্টা ঋষিগণের দৃষ্ট বস্তু, সুতরাং সেই সকল

বীজের ধ্যানও সেই সেই ঋষির দৃষ্ট। ঐ সকল তন্ত্রোক্ত বীজ প্রত্যেকে প্রণব—কারণ যাহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনারূপ স্তুতি প্রকৃষ্টরূপে করা হয় তাহারই নাম 'প্রণব'। হয়ত কাহারও ধারণা থাকিতে পারে যে বেদমন্ত্রের অথবা ওঁকাররূপ প্রণবের প্রাদুর্ভাবের অনেক পরে, এমন কি হয় ত আধুনিক সময়ে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। এরূপ ধারণা অমূলক। তন্ত্রোক্ত মহাবিদ্যার বীজগুলির মধ্যে কাহারও ঋষি স্বয়ং রুদ্র, কাহারও ব্রহ্মা, কাহারও শ্রীহরি। যখন সৃষ্টির বিকাশ ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় নাই, সেই আদিযুগে ঐ সনাতন ঋষিত্রয় পরমা ব্রহ্মশক্তির উপাসনা করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এবং তাঁহার নিকট নিজ নিজ শক্তি—সৃজন পালন ও সংহার সামর্থ্য, লাভ করেন। ব্রহ্মা মহাসরস্বতী মূর্ত্তিতে এবং তাঁহার বাগ্‌ভব বীজরূপে —রুদ্র মহাকালী মূর্ত্তিতে এবং তাঁহার মায়াবীজরূপে—হরি মহালক্ষ্মী মূর্ত্তিতে এবং তাঁহার শ্রীবীজরূপে—সেই পরমাশক্তির দর্শন পাইয়াছিলেন। ওঁকারের অকার মাত্রাই মহাসরস্বতী, উকার মহালক্ষ্মী, এবং মকারই মহাকালী। অকার উকার ও মকারে যে ভাবে ঐ ত্রিশক্তি অবস্থিত তাহাতে সৃষ্টির স্থূল পরিণাম আসিতে পারে না। ওঙ্কারের গতি ঊর্দ্ধদিকে, আদি কারণ অভিমুখে, সুতরাং লয়াবস্থার উৎপাদনই ওঙ্কারের স্বধর্ম্ম—সেই জন্য ওঁকার নির্ব্বাণপ্রদ। যেমন সূর্য্যমণ্ডলে জগতের সমস্ত উপাদান বিদ্যমান আছে, কিন্তু এমন অবস্থায় আছে যে তাহা শৈত্য স্নিগ্ধাদি গুণে পরিণত না হইলে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহমণ্ডলের অবস্থায় আসিতে পারে না—সেইরূপ ওঁকার-রূপ সূর্য্য বাগ্বীজ দ্বারা শীতল হইলে, শ্রীবীজ দ্বারা রসার্দ্র হইলে, এবং মায়াবীজ দ্বারা ঘনীভূত হইলে তখন বিশ্বের নির্ম্মাণ পালন ও পরিবর্ত্তন কার্য্য হইতে পারে। ওঁকারের অকার মাত্রাই বাগ্বীজ, উকারই শ্রীবীজ, এবং মকারই মায়াবীজ—

বীজগুলিতে মাত্রাগুলি প্রকট ভাবে অবস্থিত, এবং মাত্রামধ্যে বীজগুলি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত, এইমাত্র প্রভেদ। পরে প্রকাশ হইবে যে ওঁকারই ত্রিদেবতার ত্রিমূর্ত্তি; কারণ হ্রস্ব প্রণবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু দীর্ঘ প্রণব, এবং রুদ্র প্লুত প্রণব—হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত ভেদে ত্রিবিধ প্রণব উপনিষদ্ মধ্যে নিরূপিত হইয়াছে। ওঁকার হইতে অভিন্ন ত্রিদেবতা সৃষ্টির জন্য ত্রিশক্তিরূপ ত্রিবীজ সাক্ষাৎ করিলেন, অথবা ওঁকারই ব্রহ্মপ্রকৃতির ইচ্ছাতে বীজত্রয় রূপে প্রকট হইলেন, উভয়ই এক কথা। ফলে সকল বীজেরই অবসান বিন্দু এবং নাদে। দীর্ঘকাল ওঙ্কারের অভ্যাসে মাত্রাগুলি তিরোহিত হইয়া নাদমাত্র অবশেষ থাকে, তেমনি অন্য বীজমন্ত্রের অভ্যাসে সেই পরিণাম আপনি সংঘটিত হয়। কেবল ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বিকাশের জন্যই বিভিন্ন বীজের আবশ্যক, এবং ওঙ্কার প্রধানতঃ অনাদিকারণ ব্রহ্মের অভিমুখেই আকর্ষণ করেন।

নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার বস্তু হইতে পারেন না—ব্রহ্মশক্তির উপাসনাই সর্ব্বযুগে সকল সম্প্রদায়ে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, অথচ সেই নিরাকারকে প্রেমের আধার এবং জীবের মঙ্গলবিধায়ক বলিয়া মনে কল্পনা করেন, তাঁহারাও সেই ব্রহ্মশক্তিরই গুণকল্পনা করিতেছেন। গুণকল্পনা আর রূপকল্পনা বাস্তবিক একই কল্পনা—গুণের কল্পনা করিতে গেলে আধার কল্পনা আপনি আসে, সেই আধারই ব্রহ্মশক্তির রূপ। ব্রহ্ম যেমন নিরাকার, ব্রহ্মশক্তিও তেমনি নিরাকার। উপাসকের চিন্তানুসারে যেরূপ ব্রহ্ম-জ্যোতি দৃষ্ট হয়, তাহাই ব্রহ্মশক্তির রূপ। নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন এক এবং অদ্বিতীয়, ব্রহ্মশক্তিও সেইরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। ব্রহ্মশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম কখনও থাকেন না। সাধক নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাসনা করিলে, ব্রহ্মশক্তি তাঁহাকে নিজের নির্গুণ নিরাকার

পদবী দেখাইয়া থাকেন। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বিশুদ্ধ চিদাকাশ, তাহাই শিবপদ। যখন সমস্ত বাসনা বিগলিত হয়, নাম রূপ ও তাহাদের অর্থাভাস চিত্তে উদয় হয় না, তখনই ঐ শিবপদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

সৃষ্টিতত্ব ও কুণ্ডলিনী।

যাহা চিরস্থায়ী নহে, নিয়ত অবস্থান্তর রূপ পরিবর্ত্তনের অধীন, তাহার নাম জগৎ। আমরা যে সকল বস্তুর উৎপত্তি ও ধ্বংস দেখিতে পাই, তাহা বাস্তবিক নূতন উৎপত্তি বা আত্যন্তিক ধ্বংস নহে। পূর্ব্বাবস্থার অদর্শনকে আমরা ধ্বংস মনে করি, এবং নূতন অবস্থার উদ্ভবকে আমরা উৎপত্তি বলি। সর্ব্বত্র এই পরিবর্ত্তন শক্তির দ্বারা সাধিত হইতেছে। শক্তি ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ হয়, এবং ক্রিয়াভেদে শক্তির বিভিন্নতা কল্পিত হয়। দহনক্রিয়া বহ্নির শক্তি, বহনক্রিয়া বায়ুর শক্তি, বস্তুভেদে এইরূপ বিভিন্ন শক্তিক্রিয়া দৃষ্ট হয়। আবার বস্তু সংযোগে নূতন শক্তির উদ্ভব দেখিতে পাই—যেমন দ্রব্যযোগে বৈদ্যুতিক শক্তি। ক্রিয়াযোগেও প্রচ্ছন্ন শক্তির নববিকাশ দেখিতে পাই, যেমন ঘর্ষণ দ্বারা তেজের উৎপত্তি। শক্তির ক্রিয়ামাত্র আমরা জানিতে পারি, এবং ক্রিয়ার বিভিন্নতা দেখিয়া শক্তির নানাত্ব কল্পনা করি—কিন্তু শক্তি কি তাহা আমরা জানি না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সমগ্র বিশ্বে একমাত্র শক্তি আছেন ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন। যে শক্তি প্রভাবে আকাশে সূর্য্য নক্ষত্র এবং গ্রহগণ অবস্থিত, সেই শক্তির

বলে বীজ হইতে অঙ্কুর এবং পুষ্প হইতে ফল হইতেছে। পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্র ও অন্য গ্রহ নক্ষত্রগণ সমস্তই আকাশে অবস্থিত, সুতরাং মানিতে হইবে আকাশ হইতেই উহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ সূক্ষ্ম পদার্থ—অতএব আকাশে এমন শক্তি আছেন যাহা দ্বারা ঐ সূক্ষ্ম আকাশ এই সকল স্থূল অবস্থাতে পরিণত হইয়াছে, এবং সেই শক্তিও আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তু, ও আকাশের সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত। যেমন আকাশ এক এবং অনবচ্ছিন্ন, সেইরূপ শক্তিও এক এবং অনবচ্ছিন্ন।

জাগ্রৎ অবস্থাতে আমাদের মনের ক্রিয়া বিশেষরূপে হইতে থাকে। তখন আকাশের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। স্বপ্নে ঐ জাগ্রৎ অবস্থার ক্রিয়া সকল সূক্ষ্মভাবে মনোমধ্যে আবর্ত্তিত হয়—কেবল স্থূলদেহ ও ইন্দ্রিয়গণ তখন নিস্পন্দ থাকে। সুষুপ্তি কালে দেহের ও মনের ক্রিয়া থাকে না, তখন আকাশও থাকে না। মনের উদয়ে আকাশের উদয়, মনের অন্তর্দ্ধানে আকাশের তিরোধান। অতএব মন হইতেই আকাশের উৎপত্তি—অথবা মনই আকাশরূপে অবস্থিত। এই মনই ঐ আকাশে অবস্থিত শক্তি—মনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। মন এক নয়—দেহভেদে মন অসংখ্য—সেইরূপ আকাশও অসংখ্য এবং সৃষ্টিও অসংখ্য। আমরা সকলে সমানভাবে যে আকাশ দেখিতেছি, তাহাই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড। যে মন হইতে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে—অর্থাৎ যে মন এই ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন—সেই মনই আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। আমাদের ব্রহ্মার সঙ্কল্পিত এই আকাশ, এবং আমরা তাঁহারই সঙ্কল্পিত অংশরূপী জীব—তাঁহার সঙ্কল্প বলে আমরা এই আকাশকে সমানভাবে দেখিতেছি। আগমে এক এক সৃষ্টির আকাশকে এক এক গোল বলা হয়—

ব্রহ্মগোলো বিষ্ণুগোলো রুদ্রগোল স্তৃতীয়কঃ।
লোকেশগোলো দেবেশি দেবগোলস্ততঃ শিবে।
ততোহি ঋষিগোলোহি ক্রমাদ্‌গোলাশ্চ কোটিশঃ।

"ব্রহ্মার সংকল্পিত গোল, বিষ্ণু রুদ্র লোকপালগণ ইন্দ্রাদি দেবতা-গণ এবং ঋষিগণের সংকল্পিত ক্রমশঃ কোটি কোটি গোল মহাকাশ মধ্যে অবস্থিত।" আমাদের ব্রহ্মার যে গোল তাহাই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড বা ভূর্লোক—কেবল এই পৃথিবীমাত্র ভূর্লোক নহে। যাহার বিদ্যমানতা আমরা সাক্ষাৎ করিতেছি, সে সমস্তই ভূর্লোক। ব্রহ্মাণ্ডে যাহার এখন বিদ্যমানতা নাই, এবং হইতেও পারে না, অথচ যাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, তাহাই ভুবর্লোক। পাণিনি ব্যাকরণের কাশিকা বৃত্তিতে "ভুবঃ" এই অব্যয়শব্দকে অন্তরীক্ষ-বাচী মহাব্যাহৃতি বলা হইয়াছে। অন্তরীক্ষ কি? পুরাণ বলিতেছেন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে অন্তরীক্ষ বলে, এবং তথায় সিদ্ধগণ অবস্থিত। সিদ্ধগণ নিত্যধাম চিত্তাকাশেই বিরাজ করেন—তাঁহাদের সূর্য্যরশ্মির প্রয়োজন নাই যে তাঁহারা সূর্য্যের সহ আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। কিন্তু যাহা অন্তরে—চিত্তমধ্যে—লক্ষিত হয়, তাহাই প্রকৃত অন্তরীক্ষ। স্থূলভোগের স্থান এই ভূর্লোক, এবং যাহা পূর্ণজ্ঞানময় তাহাই চিৎসূর্য্য। সিদ্ধাত্মা স্থূলভোগ চান না, অথচ অখণ্ড জ্ঞানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কারণ সিদ্ধি থাকিলেই তাহার বিষয় থাকিবে, সেইজন্য তিনি চিৎসূর্য্যে মিশিতে পারেন নাই বলিয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী চিত্তভূমিতে—চিত্তাকাশে, অন্তরীক্ষে থাকেন, এইরূপ ব্যাখ্যাতে পুরাণের সহ একমত হওয়া যায়। এই ভূর্লোকের প্রলয়াবসানে তখন সেই ভুবর্লোকের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় ভূর্লোকে আপতিত হইবে—হয়ত বা দুই তিন প্রলয়েও তাহার আবির্ভাব না হইতে পারে—হয়ত বা অন্য গোলে

তাহার আবির্ভাব হইতে পারে—কিন্তু যতক্ষণ সেই সংকল্পিত বিষয়ের আবির্ভাব না হয়, ততক্ষণ তাহা ভুবর্লোকে থাকিবে, এবং গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায় প্রসবকালের অপেক্ষা করিবে। সংকল্পই এই জগতের সার—সংকল্প হইতেই জগতের বিস্তার—নশ্বর জগতের মূল একমাত্র সত্যসংকল্প, সুতরাং সংকল্প কখনই ধ্বংস হইবার নয়। ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকল্পের কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু, কত রুদ্র, কত ইন্দ্র, কত কত মহর্ষি-গণ ও মনুগণ এখন ভুবর্লোকে প্রস্তুত রহিয়াছেন, কেহ বা প্রস্তুত হইতেছেন, সকলেই নিজ নিজ আবির্ভাবের কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভুবর্লোকগত ঐ সকল ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি একদিন এই ভূর্লোকে, কিম্বা অন্য গোলকের ভূর্লোকে, জীবভাবে অবস্থিত ছিলেন, এবং তৎকালের বাসনা ও সাধনা অনুসারে ভুবর্লোকে উপনীত হইয়াছেন, কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় আপন আপন কর্তৃত্ব ব্যাপারে সংযুক্ত হইবেন। যেখানে জীব ভোগাসক্তি পরায়ণ, সেখানে তাহার কর্ম্মা-নুসারে ভোগলভ্য লোক সকলে গতি হয়, কোথাও উৎকৃষ্ট গতি, কোথাও নিকৃষ্ট। আর ভোগবিতৃষ্ণ জীব যদি জগতের দুঃখ কষ্ট নিবারণের আকাঙ্ক্ষায় চিন্তাকুলিত হন, তাঁহাকে ভুবর্লোকে যাইয়া উপযুক্ত অবসরে পুনরায় ভূর্লোকে আসিতে হয়।

ভোগবিতৃষ্ণ জীব যদি মায়াময়ী ভোগবাসনাকে মায়ার খেলা জ্ঞানে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে সক্ষম হন—যদি মায়ার পরপারে নিত্যধামে বিরাজ করিতে তাঁহার চিত্ত একান্ত আকুল হয়—যদি কাম ক্রোধ লোভ মোহ তাঁহাকে আর স্পর্শ করিতে না পারে—তবেই স্বর্লোক তাঁহার অনুভূত হয়। স্বর্লোক দেশ কাল এবং ব্যক্তি বিরহিত নিত্যধাম, সুখ দুঃখ রহিত পূর্ণানন্দময়। প্রণবের প্রথম মাত্রা অকার—ভূর্লোক। দ্বিতীয় মাত্রা উকার ভুবর্লোক, এবং নাদরূপী তৃতীয় মাত্রা মকারই

স্বর্লোক। অধ্যাত্ম যোগীর মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর ও অনাহত এই চারি স্থানে চিত্ত সংযম কালে যে অনুভূতি হয় তাহা ভূর্লোক বিষয়ক জ্ঞান। বিশুদ্ধি চক্রে শুদ্ধ আকাশতত্ত্বে সংযমন দ্বারা ভুবর্লোকের অনুভূতি হয়। ভ্রূমধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্র হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধপদ্মগুলিতে স্বর্লোকের আস্বাদন হয়। পুরাণ যে সকল স্বর্গ বর্ণনা করিয়াছেন, সে সমস্তই ভোগের স্থান, সুতরাং ক্ষোভেরও স্থান, মূলাধারাদি চারি চক্রের মধ্যগত কোন এক চক্রের অনুভূতি বলিয়া ঐ স্বর্গ ভূর্লোকের অন্তর্গত। আজ্ঞাচক্র ভেদ হইলে তখন অক্ষয় ধাম সকল অধিকৃত হইতে থাকে।

কূর্ম্ম পুরাণ বলেন যে সূর্য্যরশ্মি যতদূর গমন করে, ততদূর ভূর্লোকের বিস্তার। আমাদের সূর্য্য যতদূর আলোকিত করেন, ততদূর আমাদের ভূর্লোক, তাহার বহির্ভাগে অন্য ব্রহ্মাণ্ডের ভূর্লোক। এইরূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড এক মহাকাশ মধ্যে ব্যবস্থিত রহিয়াছে। মহাকাশে ব্রহ্মাণ্ড সকলের অবস্থিতি সম্বন্ধে বাশিষ্ঠ মহারামায়ণ বলিতেছেন—"আমাদের আশ্রিত এই যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফল দেখিতেছ, ইহার বহির্ভাগের ত্বক্‌স্বরূপ দশগুণ জলময় আবরণ, তাহার বাহিরে জলের দশগুণ পরিমিত তেজ, তাহার পর তেজের দশগুণ বায়ুমণ্ডল, তাহার পর বায়ুর দশগুণ আকাশ এবং এই সকল আবরণ ব্রহ্মাণ্ডফলকে বেষ্টন করিয়া আছে। অজ্ঞগণ ইহাকে অক্ষয় বিবেচনা করে। এইরূপ সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ডফল যাহাতে দুলিতেছে, এমন এক বিশাল শাখা আছে; এমন সহস্র সহস্র শাখা বিশিষ্ট এক দুর্দ্দর্শনীয় মহাবৃক্ষ আছে; এমন সহস্র সহস্র মহাবৃক্ষ ও অনন্ত তরুগুল্ম শোভিত এক বিস্তীর্ণ বন আছে। সেইরূপ সহস্র সহস্র বন যেখানে অবস্থিত, এমন এক দশদিক্‌ভরা পর্ব্বত আছে; এবং তদ্রূপ সহস্র সহস্র পর্ব্বত যেখানে আছে, এমন এক অতি বিস্তীর্ণ দেশ আছে।

তাদৃশ সহস্র সহস্র দেশ যেখানে অবস্থিত এমন এক বৃহৎ দ্বীপ রহিয়াছে, তথায় প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ু মহাহ্রদ ও নদীরূপে বহিতেছে। সহস্র সহস্র ঐরূপ দ্বীপ বিশিষ্ট এক মহাপীঠ আছে; তাদৃশ সহস্র সহস্র মহাপীঠ যুক্ত এক মহাভুবন আছে; সহস্র সহস্র মহাভুবন এক মহৎ অণ্ডে রহিয়াছে, এবং সহস্র সহস্র ঐ অণ্ড যাহাতে ভাসিতেছে এমন এক বিপুল জলশালী নিস্পন্দ সাগর আছে; তদ্রূপ লক্ষ লক্ষ সাগর যাহার কোমল তরঙ্গ, এমন এক মহার্ণব আছে। এইরূপ সহস্র সহস্র মহার্ণব যাঁহার উদরস্থ জল, এমন এক বিশ্বময় পুরুষ (বিষ্ণু) আছেন। সেই পুরুষের ন্যায় লক্ষ লক্ষ নর মালার ন্যায় যাঁহার বক্ষে শোভিত, যিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের প্রধান, এমন এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ (রুদ্র) আছেন। তাদৃশ সহস্র সহস্র মহাপুরুষ কেশজালের ন্যায় যাঁহার মণ্ডলমধ্যে স্ফুরিত হইতেছে, এমন এক মহাসূর্য্য (মহাকাল) আছেন। রুদ্র হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যে সকল সৃষ্টিভেদ অজ্ঞানীর দৃষ্টিগোচর হয়, সে সমস্তই এই মহাসূর্য্যের রশ্মিতে ভাসমান ত্রসরেণুর ন্যায় অতিক্ষুদ্র কণামাত্র। একমাত্র তিনিই সমগ্র বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন—তাঁহার নাম চিৎসূর্য্য।"

পরমাত্মন্ চিৎসূর্য্য! আপনার এই বিরাট্ মহিমা আমাদের ধারণার অতীত। মূর্খতাবশতঃ, আপনার স্বরূপ না বুঝিয়া, কি যেন মোহের প্রেরণাতে আপনার রহস্য অবধারণের জন্য বিফল চেষ্টা করিতেছি! আমরা পশুরও অধম, অতএব আমাদের প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করুন! উপমার জন্য সূর্য্যরূপে কল্পনা—আর চেতনের যাহা নির্ব্বিকল্প অবস্থা, অথবা যাহা সর্ব্বাবস্থার অতীত, যাহা ভাবও নয় এবং অভাবও নয়, সেই বাক্য মন ও বুদ্ধির অগোচর ও অগম্য যে অবস্তু-বস্তু, তিনিই চিৎ। আকাশের ন্যায় সকলের আধার বলিয়া তাঁহাকে চিদাকাশ বলে, তিনি সকলের অনাদি-আদি তত্ত্ব, বেদান্ত তাঁহাকে "তৎ" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত

হইয়াছেন। সৃষ্টির বিকাশের জন্য যে সকল পরবর্ত্তী অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা সেই 'তৎ' হইতে আগত বলিয়া 'তত্ত্ব' নামে অভিহিত। যে তত্ত্ব চিত্তের প্রথম বিকাশোন্মুখ অবস্থা তাহাই চেতন নামে কথিত। চেতন অব্যক্ত অবস্থা। বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গমের প্রারম্ভে যে অপরিস্ফুট প্রথম অবস্থা লক্ষিত হয়, তাহাকে চলিত ভাষায় আমরা 'কলান' বলি, সেইরূপ চিত্তের চৈতন্য অবস্থায় আসিবার মুখে যে 'কলন' তাহার নাম চেতন। এই চেতন হইতে সৃষ্টির অঙ্কুর উদ্গত হইয়া চৈতন্য নামে কথিত হয়, চৈতন্য ক্রমবিকাশে চিত্তে পরিণত হয়। জীবের মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারের আদি অবস্থাকে চিত্ত বলে। শাস্ত্রকারেরা মনকে সঙ্কল্পাত্মিকা শক্তি, বুদ্ধিকে নিশ্চয়াত্মিকা শক্তি, জ্ঞাতৃত্ব অভিমানকে অহঙ্কার, এবং বিকল্পশূন্য অবস্থাকে চিত্ত বলিয়াছেন। সঙ্কল্পাত্মিকা শক্তি দ্বারা মন বিষয় গ্রহণ করে—ইহা মানুষ, বা বৃক্ষ, বা পশু, এইরূপ কল্পনাতে বস্তুর অবধারণ করে। বুদ্ধি কর্ত্তব্যের স্থিরতা দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদিগের কার্য্যে শক্তি প্রয়োগ করান। আমি জানি, আমি বুঝি, আমি কর্ত্তা, এইরূপ অভিমান জ্ঞানের নাম অহঙ্কার। যখন মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার আপন আপন ব্যাপারে নিস্তব্ধ থাকে, তাহাই মনের নির্ব্বিকল্প অবস্থা, কারণ মনের কল্পনা বন্ধ না হইলে বুদ্ধি বা অহঙ্কার নিষ্ক্রিয় হন না। আগম অনুসন্ধাত্মিকা শক্তিকে চিত্ত বলিয়াছেন। সেই অনুসন্ধান জগতের কার্য্য কারণ সম্বন্ধে হইলে তাহা বুদ্ধি ও মনের কার্য্য মাত্র, ঐশী তত্ত্বের অবধারণ নিমিত্ত যে অনুসন্ধান তাহা মনের বিকল্পরহিত চিত্তাবস্থাতেই সম্ভব হইতে পারে। মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া তিরোহিত হইলে চিত্তই একমাত্র অবশেষ থাকেন। অহংকার মন ও বুদ্ধির সঙ্গেই তিরোহিত হয়। চিত্তরূপ আকাশেই জগৎ প্রতিফলিত হইতেছে, তাহাই মন

ও বুদ্ধির সাহায্যে অহংকার দর্শন করিতেছেন। মন বুদ্ধি অহংকার না থাকিলে জগতের জ্ঞান থাকে না, সেই জন্য সুষুপ্তিদশাতে জগৎ চিত্তে বিলীন হয়। সমাধিদশাতেও জগৎ চিত্তাকাশে বিলীন হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে চৈতন্যের অনুভূতি হয়। চৈতন্যের অনুভূতিকে আগমে স্বয়ং-প্রজ্ঞাত সমাধি, এবং যোগশাস্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়। শক্তিতত্ত্বের আধিক্য বশতঃ, অর্থাৎ নাদের প্রাচুর্য্য এবং মহিমা হইতে, স্বয়ংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয়। এই সমাধি উত্তরোত্তর তীব্র হইতে থাকে, সাধকের তখন সংজ্ঞা ও প্রজ্ঞা থাকে না, হাস্য রোদন রোমাঞ্চ কম্প স্বেদ এই সকল লক্ষণ দেখা যায়। চৈতন্যের পরপারে যাইলেই স্থিতপ্রজ্ঞ বা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি। শিবতত্ত্বের আধিক্য হেতু, অর্থাৎ বিন্দুর সাক্ষাৎকার জন্য, এই সমাধি উত্তরোত্তর মন্দ (নিস্পন্দ) হইতে থাকে, নেত্র নিমেষবর্জ্জিত হয়, এবং দেহ নিস্পন্দ ও স্থির হয়। যতক্ষণ বিন্দু উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ এই সমাধির নাম 'প্রজ্ঞাপ্রজ্ঞান' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের আস্বাদন ; যখন বিন্দুও বিলীন হয়, তখন 'অসংস্ময়' নামে আগমে কথিত হয়, কারণ বিন্দুলোপের সঙ্গে অহন্তার নির্ব্বাণ হয়।

এই যে চিৎ, চেতন এবং চিত্ত, ইহারা চিদাকাশ নামে অপ্রভেদে অনেক স্থলে কথিত হইয়াছে। সমস্ত সৃষ্টি চিত্তাকাশ হইতে বিসৃত হয়, অথবা চিত্তাকাশেই আকাশ কুসুমের ন্যায় কল্পিত হয়। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যুগপৎ লয় হইতে পারে না, জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রতিক্ষণে কত শত সৃষ্টির পুনরাবির্ভাব হইতেছে, আবার কত শত বিলীন হইতেছে— সুতরাং চিত্তাকাশ অবিনাশী। চিত্তাকাশ সমস্ত সৃষ্টির আধার বলিয়া, তাঁহাপেক্ষা বৃহৎ আর কিছুই নাই, সেইজন্য চিত্তাকাশকে ব্রহ্ম বলা হয়— বৃহত্তাৎ ব্রহ্ম গীয়তে। চিতের চেতনত্ব হইতে চিত্ত, সেইজন্য চিত্তাকাশ চৈতন্যধাম, সদাস্থায়ী বলিয়া সৎ, এবং বিষয়শূন্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধাম

বলিয়া আনন্দময়—সৎ চিৎ ও আনন্দ বলিয়া চিত্তাকাশ রূপ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হয়। যাহা চিৎ তাহা শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র, তাঁহাকে নিগুর্ণ শিবপদ বা সম্বিৎ নামেও বলা হয়। চিতে চৈতন্যের উদয়ে চিত্তাবস্থা। এই চৈতন্য আগমে শক্তিনামে কথিত হইয়াছেন।

আমরা এখন আগমোক্ত সৃষ্টিক্রমের অনুসরণ করিতেছি। শ্রীশক্তি-সঙ্গম তন্ত্রের চতুর্থ খণ্ডে অষ্টম পটলে বলিতেছেন—

আদি নারায়ণঃ সাক্ষাৎ পরশম্ভুঃ স এবহি।
তদেব নিগুর্ণং ব্রহ্ম বৃহত্বাদ্ ব্রহ্ম গীয়তে ॥
শুদ্ধস্ফটিকবদ্দেবি সৈব শ্রীপ্রকৃতির্বরা।
বাসুদেবো হরো ব্রহ্মা তারিণী প্রকৃতিঃ স্বয়ং ॥
যাং বিচিন্ত্য মহাদেবি জলশায়ী স্বয়ং হরিঃ।
জলাপচ্ছমনী তারা সৈব প্রোক্তা মহেশ্বরি ॥
আপো নারায়ণঃ প্রোক্তস্তারাং তোয়প্লবে স্মরেৎ।
স্মরণাদেব বিত্থায়া নিগুর্ণো যোগপট্টধৃক্ ॥
আদিমধ্যান্তরহিতা গুণাতীতা মহোজ্জ্বলা।
আদর্শবৎ স্বচ্ছরূপা মহাশক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥

'যিনি আদি নারায়ণ তিনিই সাক্ষাৎ পরশিব, এবং তাঁহাকেই নিগুর্ণ ব্রহ্ম বলা হয়—তিনি বিশ্বের আধার রূপে কল্পিত হইলে সর্ব্বাধার হেতু তখন তিনি বৃহৎ, এবং এই বৃহত্বা জন্য তাঁহার নাম ব্রহ্ম। সেই সর্ব্বাধার ব্রহ্ম ভাবী সৃষ্টির ছায়া গ্রহণের জন্য যখন শুদ্ধ-স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, অর্থাৎ যখন তিনি শুদ্ধ সত্ত্বময় চেতনাকাশ, তখন তিনি প্রধানা প্রকৃতি। তারিণী স্বয়ং সেই প্রধানা প্রকৃতি, কারণ তারিণী বিরাট্ চৈতন্যের আধার বলিয়া তিনি সেই চেতনাকাশ। বাসুদেব, হর ও ব্রহ্মা সেই প্রকৃতি হইতে অভিন্ন। স্বয়ং হরি সেই তারিণীর

ধ্যানে আসক্ত হইয়া জলশায়ী হইয়াছিলেন—এখানে জলশব্দে রসময়ী বাসনাকেই বুঝিতে হইবে, এবং পূর্ব্বকল্পের নষ্টসৃষ্টির পুনরাবির্ভাব নিমিত্ত বাসনা পূরিত হওয়াই হরির জলশায়ী হওয়া। জলনিমিত্ত আপদ্ শ্রীতারা প্রশমিত করেন—অর্থাৎ বাসনা জনিত ক্লেশ পরাপ্রকৃতির স্মরণে দূরীভূত হয়। 'আপঃ' শব্দে নারায়ণকেই বুঝায়—অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি বাসনার উদয়ে নির্গুণ ব্রহ্ম রসময় হন। প্রলয়ের জলপ্লাবনে তারাকে স্মরণ করিবে, তাঁহার স্মরণ মাত্রে জীব নির্গুণ যোগপট্টধারী হইতে পারেন—অর্থাৎ প্রলয়ে সমুদয় ভূতসৃষ্টি বিনষ্ট হইলে একমাত্র রসময়ী বাসনাই অবশেষ থাকেন, বাসনাই জলপ্লাবনের ন্যায় বিশ্ব পূরণ করেন, তখন শ্রীহরি সেই বাসনা সমুদ্রে একাকী ভাসিতে থাকেন। মূলপ্রকৃতি তারিণীর আদি মধ্য বা অন্ত নাই, তিনি ত্রিগুণের অতীতা, তিনি স্বয়ং প্রকাশিনী বলিয়া মহোজ্জ্বলা, এবং বাসনাজনিত মলিনতা তাঁহাতে না থাকাতে তিনি দর্পণের ন্যায় অতীব স্বচ্ছ, তাঁহাকেই মহাশক্তি বলা হয়। তন্ত্রভেদে প্রধানা প্রকৃতির নাম কোথাও কালী, কোথাও তারা, কোথাও ত্রিপুরা, কোথাও বা ছিন্নমস্তা, দুর্গা প্রভৃতি বলা হইয়াছে। শ্রীশক্তিসঙ্গমতন্ত্র তাঁহাকে তারিণী বলিয়াছেন, এজন্য পাঠক ভেদ কল্পনা করিবেন না। তাহার পর ঐ তন্ত্র বলিতেছেন—

> উভয়োর্ম্মধ্যভাগে তু প্রতিবিম্বঞ্চ যদ্ভবেৎ।
> তস্যাঃ চাস্য প্রতিবিম্বং শিবে সংদৃশ্যতে স্ফুটম্॥
> শিবস্য প্রতিবিম্বস্তু প্রকৃতৌ দৃশ্যতে স্ফুটম্।
> কেচিৎ শক্তীতি তং প্রাহুঃ কেচিৎ শিব ইতি পরে॥
> কেচিৎ নারায়ণং প্রাহুঃ সৈব কালী চ তারিণী।
> উভয়োঃ প্রতিবিম্বজ্যো হ্যর্দ্ধনারীশ্বরো মতঃ॥

পরাপ্রাসাদ বিদ্যা তু সৈবাত্র পরিকীর্ত্তিতা।
প্রতিবিম্বং ভবেন্মায়া ততো ব্রহ্মা মহেশ্বরঃ।
বিষ্ণুরীশ্বর ইত্যাদ্যা লোকপালাদয়ঃ শিবে॥
সৃষ্টির্জাতা মহেশানি তপোবলসমুদ্ভবা।
অবিনাশী সদাস্থায়ী শম্ভুশ্চ প্রকৃতিস্তথা।
আদ্যন্তরহিতা পূর্ণা চিদ্‌ঘনা সৎস্বরূপিণী॥

'নির্গুণ ব্রহ্ম এবং প্রধানা প্রকৃতির মধ্যে প্রতিবিম্ব উদিত হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের যে সৃষ্টি ব্রহ্মে লীন হইয়াছিল, ইহা তাহারই প্রতিবিম্ব, এবং সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণোপযোগী যে স্বচ্ছত্ব তাহাই ব্রহ্মের প্রকৃতি। নির্গুণ শিবতত্ত্বে প্রকৃতির প্রতিবিম্ব, এবং প্রকৃতিতে শিবের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় (ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব স্বতঃসিদ্ধ এবং তাহা কখনও বিচলিত হয় না; ভাবী সৃষ্টির প্রতিবিম্ব প্রকৃতিতে উদিত হইলেও, ব্রহ্ম ও তাঁহার প্রকৃতি অভেদ বলিয়াই প্রতিবিম্বে নির্গুণ ও সগুণ উভয় ভাবই বিদ্যমান থাকে)। এই প্রতিবিম্বকে কেহ শক্তি বলেন, কেহ শিব বলেন, কেহ বা নারায়ণ বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তিনিই কালী তিনিই তারিণী—(এই প্রতিবিম্বই আদি প্রকৃতি চেতনাকাশে উদিত শুদ্ধ চৈতন্য, এবং তিনি গীতাতে কথিত ভগবানের পুরুষোত্তম ভাব)। উভয়ের প্রতিবিম্ব একীভূত হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ প্রকটিত হয়, এবং তাহাই পরাপ্রাসাদ বিদ্যা—(আগমে হকার সকার ঔকার বিন্দু ও বিসর্গ সংযোগে পরাপ্রাসাদ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, কুলার্ণবতন্ত্র সকারকে হকারের আদিতে বলিয়াছেন। হকার শূন্য আকাশের বীজ এবং নির্গুণ শিবের বীজ, সকার শক্তিবীজ, চতুর্দ্দশ স্বর ঔকার 'আজ্ঞা' বা 'আত্মাকর্ষিণী শক্তি' বুঝায় এবং ইহার পৌরাণিক নাম সঙ্কর্ষণ; বিন্দু এখানে মূল 'ক্রিয়াশক্তি' যাঁহাকে বৈষ্ণব-

দর্শনে প্রদ্যুম্ন বলা হয় ; এবং বিসর্গ বা দ্বিবিন্দু 'ইচ্ছা' বুঝায়, যাহাকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে 'অনিরুদ্ধ' বলেন। স্বচ্ছ প্রধানা প্রকৃতি নিজের চেতনাকাশে স্বেচ্ছাতে নাদরূপে স্পন্দিত হন ; এবং আপন নির্গুণভাব স্মরণ নিমিত্ত ঐ নাদকে আকর্ষণ করিয়া বিন্দুরূপ ধারণ করেন, ইহাই তাঁহার আজ্ঞা। ব্রহ্ম-প্রকৃতিতে এই নাদবিন্দুর মিলনই পরপ্রাসাদ বিদ্যার অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি। এই বিদ্যাই শ্রীগুরুর বীজ, এবং এই মূর্ত্তিই শ্রীগুরু মূর্ত্তি)। যাহাকে প্রতিবিম্ব বলা হইল, তাহাই মায়া। সেই মায়া হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, এবং ব্রহ্মা ও প্রজাপতিগণের তপোবল প্রভাবে নানাবিধ সৃষ্টি হইতে লাগিল। পর শম্ভু এবং প্রকৃতি উভয়ে অবিনাশী এবং সদাস্থায়ী। প্রকৃতিও নির্গুণ শিবের ন্যায় আদ্যন্তরহিতা ; তিনিও পূর্ণা (অনন্তা), চিদ্‌ঘনা (চিদাকাশময়ী), এবং সৎস্বরূপিণী (সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র বিদ্যমানা।' প্রধানা প্রকৃতি আগমে কোথাও মূলা প্রকৃতি, কোথাও প্রধান, কোথাও পরাশক্তি নামে কথিত হইয়াছেন। গীতার কথিত জীবরূপী ভগবানের পরা প্রকৃতি এই মূল প্রকৃতির পরবর্ত্তী অবস্থা, এবং গীতার ভূমি প্রভৃতি অষ্টবিধ অপরা-প্রকৃতিকে আগম নপুংসক প্রকৃতি বলিয়াছেন। পরাশক্তিরূপিণী প্রধানা প্রকৃতি নির্গুণ পরশিবে নিত্য অধিষ্ঠিতা—'শক্তিশ্চ শক্তিমদ্রূপাৎ ব্যতিরেকং ন বাঞ্ছতি ! তাদাত্ম্যম্ অনয়োর্নিত্যং বহ্নিদাহকয়োরিব'—শক্তি এবং শক্তিমান্ কখনও বিচ্ছিন্ন থাকেন না, অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ন্যায় উভয়ে অভিন্নাত্মারূপে অবস্থিত। অতএব নির্গুণ পরব্রহ্মেও শক্তি নিত্য অধিষ্ঠিতা আছেন, তবে সেখানে শক্তিও নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। নির্গুণ ব্রহ্ম বর্ণনার অতীত—

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মঃ সদানন্দো নিরাময়ঃ।
বিকাররহিতঃ সাক্ষী শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ ॥

সেই সনাতন শিব নিত্যবস্তু, তিনি সকলে অবস্থিত, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সদানন্দ, নিরাময়, বিকারশূন্য, এবং তিনি কেবল সাক্ষীরূপে অবস্থিত—অর্থাৎ তিনি কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন।' আগমের অন্যত্রও তাঁহার স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত আছে—

নিষ্ক্রিয়ং নির্গুণং শান্তম্ আনন্দমজমব্যয়ম্।
অজরামরমব্যক্তমজ্ঞেয়মচলং ধ্রুবম্।
জ্ঞানাত্মকং পরং ব্রহ্ম স্বসংবেদ্যং হৃদিস্থিতম্।
সত্যং বুদ্ধেঃ পরং নিত্যং নির্ম্মলং নিষ্কলং স্মৃতম্॥

'সেই জ্ঞানময় পরব্রহ্ম নির্গুণ, ক্রিয়ারহিত, শান্ত, আনন্দস্বরূপ, উৎপত্তি ও বিনাশ বর্জ্জিত, কালকৃত বিকারশূন্য বলিয়া অজর ও অমর, অব্যক্ত, অজ্ঞেয়, পরিবর্ত্তনশূন্য (অচল), নিত্য, একভাবে স্থিত বলিয়া ধ্রুব, তিনি কেবল আপনিই আপনাকে জানেন, তিনি দেহীর চিত্তরূপ হৃদয়কোশে বিরাজিত, তিনিই একমাত্র সত্য, বুদ্ধির অতীত, নিত্য অজ্ঞানজনিত মলিনতাশূন্য, এবং তিনি পরিপূর্ণ বলিয়া তাঁহার কলা (অংশ) কল্পনা হয় না।' কিন্তু পরব্রহ্ম এরূপ নির্গুণ স্বভাব হইলেও, তিনি নিত্যই প্রকৃতিযুক্ত থাকাতে তাঁহার সগুণ ভাবও নিত্য—বিচার দ্বারা, এবং সমাধি অবস্থাতে, তাঁহার নির্গুণত্বই অবশেষ থাকে। তাই শারদাতিলক বলিতেছেন—

নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥

'সনাতন শিবতত্ত্ব (অর্থাৎ পরব্রহ্ম) নির্গুণও বটে এবং সগুণও বটে। প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বিবেচিত হইলেই তিনি নির্গুণ, আর প্রকৃতিযুক্ত চিন্তাতে তিনি সৃষ্টি সঙ্কলনের উপযোগী বলিয়া 'সকল' অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম কথিত হন।' কলাশব্দের অর্থ এখানে প্রকৃতি—

কলা বলিতে অংশও বুঝায়। সৃষ্টিক্রমে যে সকল তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়, তাহারা প্রধানা প্রকৃতির অংশ বলিয়া কলা নামে কথিত হয়। প্রকৃতি-যুক্ত ব্রহ্মই সৃষ্টির আদি কারণ—

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥

সকল অর্থাৎ প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্ম সদাস্থায়ী, তিনি অক্ষর বলিয়া 'সৎ'। তিনি সর্ব্বচৈতন্যের আধার বলিয়া 'চিৎ'। তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম। ইচ্ছাদি অনন্ত শক্তি তাঁহার কলা বা অংশ, ঐ সকল শক্তি তাঁহাতে নিত্য অবস্থিত বলিয়া উহারা তাঁহার প্রকৃতি, এবং তিনি নিত্য প্রকৃতিযুক্ত বলিয়া 'সকল'। সেই সচ্চিদানন্দময় সকল পরমেশ্বর হইতে প্রথমে শক্তির আবির্ভাব হয়। শক্তি হইতে নাদ, এবং নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয়। প্রকৃতিযুক্ত 'সকল' ব্রহ্ম হরিহর ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও নিয়ন্তা বলিয়া তিনি পরমেশ্বর। সৃষ্টি এক নয়, অনন্ত। যখন যে সৃষ্টি নিজ স্থায়িত্বকালের অবসানে ব্রহ্মপ্রকৃতিতে লয় হইতেছে, নিয়মিত কালের অবসানে পুনরায় তাহা ব্রহ্মপ্রকৃতিতে উদয় হইতেছে। সেই আবির্ভাব সময়ে প্রকৃতিতে প্রথমে শক্তির উদ্গম হয়। সেই শক্তি ইচ্ছারূপিণী আদ্যা শক্তি—

শিবেচ্ছয়া পরাশক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকতাং গতা।
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদিব॥

যেমন তিলমধ্যে তৈল ব্যাপকরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে, নিষ্পীড়ন দ্বারা তৈলরূপে নির্গত হয়, সেইরূপ পরাশক্তি শিবতত্ত্বের সহিত একীভূত হইয়া অভিন্নাবস্থায় থাকেন। যখন শিবতত্ত্বে (অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিতে) সৃষ্টিবিকাশের ইচ্ছা উদয় হয়, তখনই শিবেচ্ছারূপিণী শক্তি পৃথক্‌রূপে স্ফুরিত হন। মোট কথা, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার নাম ইচ্ছা-

শক্তি। কেহ এই শক্তিকে প্রধান বলেন, কেহ মায়া অবিদ্যা নাম দিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপ অবতার—

তচ্ছক্তিভূতঃ সর্ব্বেশো ভিন্নো ব্রহ্মাদিমূর্ত্তিভিঃ।
কর্ত্তা ভোক্তা চ সংহর্ত্তা সকলঃ স জগন্ময়ঃ॥

সেই সর্ব্বেশ্বর শক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া পরে ব্রহ্মাদি বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই পরমেশ-শক্তিই একমাত্র কর্ত্তা ভোক্তা ও সংহর্ত্তা-রূপে অবস্থিত। নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ও শান্তির অতীত যে সকল কলা হইতে সমগ্র জগতের উপাদান, অর্থাৎ জগৎ যাহাদের অবস্থাভেদ মাত্র, সেই সকল কলা এই ঐশীশক্তিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতু তিনি 'সকল' এবং জগন্ময়। এই পরমেশ-শক্তি চণ্ডীরহস্যে বর্ণিত মহালক্ষ্মীর অলক্ষ্য অবস্থা। শক্তি যখন নাদরূপে স্ফুরিত হন, তখন তিনি মহালক্ষ্মীর লক্ষ্য অবস্থা। শক্তি ইচ্ছারূপিণী, কিন্তু সেই ইচ্ছা কি? মহাপ্রলয়ে যে সৃষ্টি ব্রহ্মপ্রকৃতিতে বিলীন হইয়াছিল, তাহারই পুনর্বিকাশের ইচ্ছা। যেমন সুষুপ্তিকালে আমরা সমস্তই বিস্মৃত হই, এমন কি নিজের অস্তিত্ব জ্ঞানও থাকেনা, সুষুপ্তির অবসানে পূর্ব্বস্মৃতি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে, ঠিক্ সেইরূপ মহাপ্রলয়ের নির্দ্দিষ্টকাল ব্যতীত হইলে পূর্ব্বসৃষ্টির সূক্ষ্ম স্মৃতি ব্রহ্মপ্রকৃতিতে জাগিয়া উঠেন, এবং সেই জাগরণ নষ্ট সৃষ্টির পুনর্দশনের আকাঙ্ক্ষারূপে প্রথমে স্ফুরিত হন, তাহাই ইচ্ছাশক্তি। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই অদর্শন নিমিত্ত অভাব জ্ঞান বা শূন্য ভাবনা উপস্থিত হয়, এবং এই শূন্যকল্পনাই পূর্ব্বকথিত মায়া বা প্রতি-বিম্বাকাশ। মায়া ব্যতিরেকে পরবর্ত্তী সৃষ্টিকার্য্য ঘটিতে পারে না, সেই জন্য মায়া সৃষ্টির প্রধান সহকারী কারণ, ইচ্ছাশক্তি মূল কারণ, এবং নাদের উৎপত্তি প্রভৃতি শূন্যরূপিণী মায়াকে অবলম্বন না করিয়া হইতে পারে না বলিয়া তাহারা মায়াপেক্ষা পরবর্ত্তী সহকারী কারণ।

যাঁহার ইচ্ছাতে এই শূন্যরূপ মায়ার উদয় হইল, সেই পরমেশ্বর মায়ার অধীশ্বর, মায়া তাঁহার বশীভূত।

সুষুপ্তির অবসানে জাগ্রত হইয়া জীবমাত্রে অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করে—সেইরূপ ইচ্ছাশক্তির শূন্যদর্শন সমকালে অস্ফুট নাদধ্বনি উদিত হইয়া সেই শূন্য পরিপূর্ণ করেন, অর্থাৎ শক্তি নাদরূপে ঐ শূন্যাকাশে ব্যাপ্ত হন। সেই কথা চণ্ডীর প্রাধানিক রহস্যে বলিতেছেন—'শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা,' শক্তিরূপিণী মহালক্ষ্মী সেই অখিল শূন্যকে আপনার তেজে পূর্ণ করিলেন। তেজ ও ধ্বনি মূলে একই বস্তু, এবং উভয়ে একত্র বিদ্যমান থাকেন, এ কথা পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে। শক্তি স্বীয় নাদাত্মক জ্যোতিতে শূন্য ব্যাপিত করিলেন—তাঁহার নাদই তাঁহার জ্যোতি এবং তাঁহার জ্যোতিই তাঁহার নাদ। ইচ্ছা হইলেই ক্রিয়া আছে—শূন্যকল্পনা ও নাদদ্বারা তাহার পূরণ ইচ্ছাশক্তির প্রথম ক্রিয়া, কারণ শক্তির জাগরণের সঙ্গেই ইহার যুগপৎ বিকাশ। ইচ্ছাশক্তি প্রথম উদিত অবস্থায় তিনি অব্যক্তরূপিণী—নাদের উত্থান এই ক্রিয়াদ্বারা তিনি আত্মবিকাশ করিলেন, সুতরাং এই ক্রিয়াও ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি সম্ভূত ঐ অব্যক্ত আদিনাদ যখন বিন্দুরূপ ধারণ করিলেন, তখনই ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তিতে পরিণত হইলেন, সেই জন্য বিন্দুতে প্রধানতঃ ক্রিয়াশক্তি লক্ষিত হয়—

অভিব্যক্তা পরাশক্তি রবিনাভাবলক্ষণা।
অখণ্ডপরচিচ্ছক্তি র্ব্যাপ্তা চিদ্রূপিণী বিভুঃ॥
সমস্ততত্ত্বভাবেন বিবর্ত্তেচ্ছাসমন্বিতা।
প্রয়াতি বিন্দুভাবঞ্চ ক্রিয়াপ্রাধান্যলক্ষণম্॥

'যিনি চিৎস্বরূপা, অখণ্ডরূপে ব্যাপিনী, এবং নির্গুণ শিবতত্ত্বে

অবিনাভাবে সংযুক্তা, সেই পরাশক্তি আবির্ভূত হইয়া বিন্দুভাবে পরিণত হইলেন—সৃষ্টি নির্ম্মাণের উপযোগী তত্ত্বসকলকে উৎপাদন করিবার ইচ্ছাহেতু তাঁহার এই বিন্দুরূপ ধারণ ; ক্রিয়াপ্রাধান্যই এই বিন্দুর লক্ষণ, কারণ বিন্দু হইতে সৃষ্টির ক্রিয়া সকল নির্গত হইতে লাগিল'। যেমন আতসী কাচের দ্বারায় সূর্য্যরশ্মি একত্রিত করিলে ঘনীভূত জ্যোতির্বিম্ব আকারে দৃষ্ট হয়, এবং বস্ত্রাদি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ জ্যোতিস্তরঙ্গ রূপে ভাসমান আদিনাদ উৎপন্ন হইবা মাত্র ইচ্ছাশক্তি তাহাকে নিজের অভিমুখে আকর্ষণ করেন এবং সেই আকর্ষণের ফলে তেজোরূপে ভাসমান নাদতরঙ্গ একত্রিত হইয়া বিন্দুরূপ ধারণ করেন, সেই বিন্দু হইতে সৃষ্টিক্রিয়া বিস্তার হয়—

সাতত্য-সংজ্ঞা চিন্মাত্রা জ্যোতিষঃ সন্নিধেস্তদা।
বিচিকির্ষুর্ঘনীভূতা ক্বচিদভ্যেতি বিন্দুতাম্ ॥

'চিৎশক্তির নাদরূপে ব্যাপ্তিহেতু যে জ্যোতি আবির্ভূত হইল, সৃষ্টি বিস্তারের জন্য (শক্তির আকর্ষণে) সেই জ্যোতি ঘনীভূত হইয়া বিন্দুরূপ ধারণ করিল।' চিদাকাশে উদিত শক্তি চিৎ ভিন্ন অন্য বস্তু হইতে পারে না, এবং শক্তির নাদরূপে বিকাশও সেই চিৎ হইতে অভিন্ন। চিতের মায়াকল্পিত ব্যাপ্তির নাম নাদ, এবং নাদ আপনার কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া বিন্দুত্ব প্রাপ্ত হন। নাদ ও বিন্দু বস্তুতঃ একই পদার্থ—ছড়ান অবস্থায় যাহার নাম নাদ, একত্রিত হইয়া ঘনীভূত হইলে তাহার নাম বিন্দু। বিন্দুতে জ্যোতি ব্যক্তভাবে লক্ষিত হয়, নাদে ছড়ান থাকা হেতু সূর্য্যকিরণের ন্যায় ভাসমান থাকে। নাদে জ্যোতি না থাকিলে, বিন্দু জ্যোতির্ম্ময় হইতেন না। পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টির প্রথম বিকাশ এই নাদ ও বিন্দু, এবং সেই জন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সাধক ব্রহ্মসাক্ষাৎকালে শুদ্ধ জ্যোতির এবং নাদধ্বনির উপলব্ধি করেন।

ষট্‌চক্রের বর্ণনাক্রমে যাঁহার নির্ব্বাণশক্তি আখ্যা দেওয়া হয়, তিনিই অধুনা কথিত সকল ব্রহ্ম বা প্রকৃতিযুক্ত পরমেশ্বর—যে অবস্থায় শিবতত্ত্ব এবং তাঁহার স্বচ্ছ প্রকৃতি একীভূত থাকেন, সুতরাং তখন শক্তি পৃথক্ রূপে ব্যক্ত হন নাই। শক্তির উদয় হইয়াছে, অথচ তখনও নাদের আবির্ভাব হয় নাই, সেই অবস্থায় ইচ্ছাশক্তির নাম নির্ব্বাণ কলা। আর ইচ্ছাশক্তির নাদরূপে যে প্রথম অভিব্যক্তি, তাহাই অমাকলা। আগম দ্রষ্টা ঋষিগণের দর্শনভেদ বশতঃ আগমশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল ভিন্ন মত আম্নায়ভেদ নামে কথিত হয়। এই বর্ণনাভেদ রূপ আম্নায় ভেদ হইতে যোগমার্গের নানা প্রকার মতভেদ নানা তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে নানা উপাসক সম্প্রদায় এবং নানাবিধ আচারকাণ্ডের স্থষ্টি হইয়াছে—ফলতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য স্থান। আমরা এখানে পূর্ণানন্দ স্বামীর ষট্‌চক্র নিরূপণের অনুসরণ করিতেছি, কারণ তাহাই এখন সর্ব্বজন বিদিত এবং মূল তন্ত্রগুলির সমন্বয়ে গঠিত।

আদি বিন্দুকে পর বিন্দু বলা হয়। পর বিন্দু হইবা মাত্র তখন উহা কি বিশিষ্ট তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। এই অনুসন্ধান প্রবৃত্তিই জ্ঞানশক্তির প্রথমাঙ্কুর। ঐ ইচ্ছার সঙ্গেই বিন্দুটি ফাটিয়া গেল, এবং তাহা হইতে বিন্দু নাদ ও বীজ এই তিন তত্ত্ব নির্গত হইলেন। আদি বিন্দু ভেদ হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা পর্য্যন্ত ব্রহ্মপ্রকৃতির অব্যক্ত ক্রিয়া, তাহা জগতের মূল অথচ জগতের বহিঃস্থিত। গীতাতে শ্রীভগবান যে বলিয়াছেন—'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্ অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।' শ্বঃ অর্থাৎ আগামী প্রভাত পর্য্যন্ত যাহা থাকিবে না, তাহার নাম এখানে অশ্বত্থ। এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ সহস্র দিব্য যুগ পরিমিত

ব্রহ্মরাত্রিতে লয় হয়, সেই রাত্রির অবসানে পুনরায় দিব্য সহস্র যুগ পরিমিত ব্রহ্মার আর একদিন আরম্ভ হয়। ব্রহ্মার দিন প্রভাতে পূর্ব্বসৃষ্টি বিদ্যমান থাকে না বলিয়া তাহাকে অশ্বত্থ বলা হয়। সংসার-রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে—ব্রহ্মপ্রকৃতিতে অবস্থিত। যাহা সমস্ত কারণের কারণ, যাহা নিত্য, যাহা মহতের মহৎ, অথচ যাহাপেক্ষা সূক্ষ্ম ধারণার বহির্ভূত, সেই অব্যক্ত অনাদি ব্রহ্মশক্তিকেই উর্দ্ধ বলা হইয়াছে, এবং সেই শক্তিই এই সংসার বৃক্ষের মূল বা আদি কারণ। আমরা মস্তকের উপরিভাগে উর্দ্ধ কল্পনা করি। এই দেহমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন কল্পিত হয় বলিয়া আমাদের দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। মস্তকের যে কপালাস্থি, তাহার মধ্যে স্নায়বীয় নাড়ী সকলের প্রধান কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্ক—আমাদের মনবুদ্ধি প্রভৃতি মেধাশক্তির আধার। মেধা অনন্ত বিষয়ে ধাবিত হয়—সেই জন্য মেধার ভুবনকে সহস্রদল পদ্ম বলা হয়, এখানে সহস্র শব্দের অনন্ত বা অসংখ্য অর্থ। অনন্ত মেধাশক্তির আধারকে পদ্মের তুলনায় সহস্রদল পদ্ম বলা হয়, এবং মেধা অনন্তদিকে ধাবিত হয় বলিয়া রথচক্রের তুলনায় মেধামণ্ডলের কেন্দ্রকে সহস্রার বলা হয়। পদ্মের কেন্দ্রস্থানকে কর্ণিকা বলে, এবং রথচক্রের কেন্দ্র স্থানকে নাভি বলে। আগম মেধাভুবনের কেন্দ্রকে মস্তিষ্ক মধ্যে সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকাতে স্থাপন করিয়াছেন। উপনিষদাদিতে রথ-চক্রের উপমাহেতু ঐ কেন্দ্র তত্রত্য চক্রের নাভিমধ্যে কল্পিত হইয়াছে। সহস্রদলের কর্ণিকামধ্যে, অথবা সহস্রারের নাভিমধ্যে, মহাশূন্য স্থান বিদ্যমান আছে, তাহাই মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র। জরায়ুমধ্যে প্রাণিদেহ যখন ভ্রূণরূপে গঠিত হয়, তখন ঐ শূন্যই প্রথম উৎপন্ন হয়। সেই শূন্যমধ্যে যোগীর চিত্ত লয় হইলে নির্বীজ বা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে—সেই অসংপ্রজ্ঞাত অবস্থার আর এক নাম 'উন্মনী'। "যত্রগত্বা

তু মনসো মনস্ত্বং নৈব বিদ্যতে, উন্মনী সা সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা" —যে স্থানে গেলে মন আর মন থাকে না, অর্থাৎ যেখানে মনের ক্রিয়া সম্যক বিলীন হয়, চিত্তবৃত্তি সকল যেখানে সমূলে নিস্পন্দ হয়, তাহাই সর্ব্বতন্ত্রে গোপিত 'উন্মনী' স্থান বা নির্গুণ শিবপদ। নির্গুণ শিবপদবী ঐ মহাশূন্য স্থানে ইচ্ছারূপিণী শক্তির উদয় হয়, এবং সেখানেই যোগী ইচ্ছাশক্তির প্রথম বিকাশ আদিনাদের সাক্ষাৎ করেন। সেই আদিনাদ এই জগৎসৃজনের আদিমূল, তাই সংসার বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রমধ্যে যোগীর নিজদেহে অবস্থিত এইরূপ অর্থ যোগীরা ভাবনা করেন। ষট্‌চক্র বিবরণে এই আদিনাদকে ব্যাপিকা শক্তি বলা হয়, কোথাও বা কলা এবং কোথাও আঞ্জী নাম দেওয়া হয়, কোথাও তাঁহাকে চন্দ্রের 'অমা'নাম্নী ষোড়শী কলা বলা হয়। আর যাহা অব্যাকৃতা ইচ্ছাশক্তি, অর্থাৎ যাহা তাঁহার নাদরূপে ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বাবস্থা, তাঁহাকে সপ্তদশী কলা বা 'সমনী', যেখানে মন অতি সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত থাকেন, বলা হয়। সমনীর উর্দ্ধে শূন্য শিবপদবীকেই 'উন্মনী' বলা হয়—কিন্তু কোথাও ঐ সপ্তদশী কলাকেই উন্মনী বলা হইয়াছে, সেখানে অব্যাকৃতা শক্তিকে শূন্য হইতে অভেদজ্ঞানে পৃথক গণনা করা হয় নাই বুঝিলে আর বিরোধ হয় না।

মন্ত্রযোগীর নিজ দেহে ষট্‌চক্রগুলির সংস্থান জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গুরুচিন্তাতে, ভূতশুদ্ধিতে, অন্তর্যাগে, যোনিমুদ্রা প্রকরণে —সর্ব্বত্র ষট্‌চক্র চিন্তার প্রয়োজন। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে পর পর যে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, সেই সমস্ত তত্ত্ব সহস্রদলের মহাশূন্য হইতে ক্রমশঃ নিম্নদিকে মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্নায়বীয় কেন্দ্রসকলে যোগীর ধ্যানগোচর হয়। মস্তিষ্কের মহাশূন্য হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুর অধোভাগে স্থিত মূলাধার পর্য্যন্ত স্থান সকলে তত্ত্বগুলির স্ব স্ব কেন্দ্রে

বর্ণনাকে সৃষ্টিক্রমের বর্ণনা বলা হয়। কিন্তু যোগী প্রথমতঃ নিম্নস্থ স্থূল তত্ত্বের ধারণা করিয়া পরে সেই তত্ত্বের মুলভূত উর্দ্ধস্থিত সূক্ষ্ম তত্ত্বের ধারণাতে অধিকারী হন, সেই জন্য শাস্ত্রে তাঁহাকে বিপরীতক্রমে তত্ত্বগুলির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুষুম্না নাড়ীর অধোমুখে অবস্থিত মুলাধারচক্র হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধে সহস্রদল পর্য্যন্ত বিপরীত ক্রমের বর্ণনাকে লয়ক্রম বা সংহার ক্রম বলা হয়। আগম মধ্যে ষট্‌চক্রের যে সকল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলই এই লয় বা সংহার ক্রমের বর্ণনা। পাঠকগণের পক্ষে সৃষ্টিক্রম জ্ঞাত না হইলে লয়ক্রমের প্রকৃত বোধ হওয়া অসম্ভব, সেই জন্য আমরা এখানে সৃষ্টির ক্রমানুসারে চক্রগুলির বর্ণনা ও তত্রত্য তত্ত্ব সমুদয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানে যত্ন করিতেছি। এরূপ বর্ণনা যদিও কোন মূল আগমে অথবা সংগ্রহ গ্রন্থে বিশদভাবে প্রকাশিত না থাকায় প্রমাদ হইবার সম্ভাবনা, তথাপি যখন মন্ত্রযোগের বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন ইহা ঠেলিবার উপায় নাই।

নির্গুণ শিব হইতে যাহা কিছু বিকাশ হইয়াছে সে সমস্তই ব্রহ্মপ্রকৃতি শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়; কিন্তু উৎপত্তির ক্রম অনুসারে কোথাও তুরীয় ভাবে, কোথাও কারণরূপে, কোথাও সূক্ষ্মরূপে, এবং পরিণামে স্থূলরূপে ব্যবস্থিত। ইচ্ছাশক্তি সম্ভূত আদিনাদ ও আদিবিন্দুকে ব্রহ্মের তুরীয় শরীর বলা যাইতে পারে, এবং সেই তুরীয় শরীর এই সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল, ও তাহা ব্রহ্মরন্ধ্রের উর্দ্ধ প্রদেশে মহাশূন্য স্থানে অবস্থিত। ঐ তুরীয় স্থানকে আগমে 'বিসর্গ' বা 'বিসর্গমণ্ডল' বলিয়াছেন, কারণ সেখানে সৃষ্টি নাদবিন্দু রূপে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছে। নির্গুণ নিরঞ্জন শিবতত্ত্বকে আগম 'অকুল' বলিয়াছেন, ইচ্ছারূপিণী আদ্যা শক্তিকে 'কুল' ও বিসর্গমণ্ডল বলিয়া-

ছেন—'কুলরূপং ভবেচ্ছক্তিঃ বিসর্গমণ্ডলং প্রিয়ে', শক্তি কুলরূপে অর্থাৎ জগতের যোনিরূপে অবস্থিত, এবং তিনিই 'বিসর্গমণ্ডল'—অর্থাৎ সৃষ্টির উৎপত্তি-স্থান। 'কুলন্তু ব্রহ্মশক্তিঃ স্যাদকুলং ব্রহ্ম এব হি'—ব্রহ্মশক্তি পরাপ্রকৃতিকে কুলশব্দে, এবং নিগুর্ণ ব্রহ্মকে অকুলশব্দে নির্দ্দেশ করা হয়। কঙ্কালমালিনী তন্ত্র সহস্রদলস্থিত তত্ত্বগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে তত্রস্থ সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল এবং মহাবায়ুর উল্লেখ করিয়া তাহার পর '—ব্রহ্মরন্ধ্রং ততঃ স্মৃতম্, তস্মিন্ রন্ধ্রে বিসর্গঞ্চ নিত্যানন্দং নিরঞ্জনম্'—সেই ব্রহ্মরন্ধ্রের উর্দ্ধপ্রদেশে নিত্যানন্দময় নির্ম্মল 'বিসর্গ' স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা নিত্যানন্দ ও নিরঞ্জন তাহাই সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত তুরীয় পদবী। তুরীয় মূল হইতে উৎপন্ন কাণ্ড বা গুঁড়ি ব্রহ্মের কারণ শরীর, এবং বিসর্গমণ্ডলের ঠিক নিম্নে অবস্থিত। আদিবিন্দু ভেদ হইয়া যে দ্বিতীয় বিন্দু, বীজ, ও তদুভয়ের সমবায়জনিত নাদ উৎপন্ন হইল, সুতরাং যখন আদ্যাশক্তি (আদিনাদবিন্দু) ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ত্রিকোণাকারে—ত্রিতত্ত্বরূপিণী হইলেন, তখন তিনি শব্দব্রহ্মময়ী 'কুল-কুণ্ডলিনী' রূপে জগতের কারণাবস্থায় উপনীত হইলেন—শক্তির রূপান্তর জন্য তিনি 'কুল,' এবং ত্রিতত্ত্বের কুণ্ডলাকৃতি যন্ত্র বলিয়া তিনি 'কুণ্ডলিনী'। এই শব্দব্রহ্মময়ী কুলকুণ্ডলিনী হইতে জগন্নির্ম্মাণের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি নিষ্কাশিত হইল, এবং ঐ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব ব্রহ্মরন্ধ্রের অধোভাগে ললাটাভ্যন্তর হইতে ক্রমশঃ নিম্নে মেরুদণ্ডমধ্যবর্ত্তী 'চক্র' বা কেন্দ্রস্থান গুলিতে অবস্থিত ও চিন্তনীয়, তাহাদের বিশেষ পরিচয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এখন পরবিন্দু ভেদ হওয়াতে তাহা হইতে যে বিন্দু নাদ ও বীজ এই তিন তত্ত্ব নির্গত হইল, সেই ভেদ সম্বন্ধে শারদাতিলকের অনুসরণ করিতেছি—

পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ ॥
বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তিঃ নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ ॥

নির্গুণ শিবতত্ত্ব এবং ইচ্ছারূপিণী শক্তিতত্ত্ব, ইহাঁদের সম্মিলনে পরবিন্দুর উৎপত্তি, সুতরাং তাহা 'পর'ময় (শিবময়) এবং শক্তিময় বলিয়া উভয়াত্মক হেতু 'পরশক্তিময়', আবার পরাশক্তির (আদিনাদের) উৎপাদিত বলিয়াও তিনি পর-শক্তিময়। শিব ও শক্তি সৃষ্টিক্রমের সর্ব্বত্র অবিনাভাবে সংযুক্ত আছেন। শক্তির প্রাধান্য না হইলে ক্রিয়া হইতে পারে না, সেইজন্য সৃষ্টিবিকাশ সময়ে শক্তির স্বতন্ত্র আবির্ভাব, কিন্তু তাহাও শিবশূন্য হইতে পারে না, কেবল ইহাতে শক্তির প্রাধান্য মাত্র, এবং সেই প্রাধান্যবশতঃ ইচ্ছাশক্তি হইতে আদিনাদ ও পরবিন্দুর আবিষ্কার। পরবিন্দু ভেদ হওয়াতে তাহা হইতে বিন্দু বীজ ও নাদ এই তিন তত্ত্ব নির্গত হইল, এবং ইহারা প্রত্যেকে সেই শিবশক্তিময় বস্তু, তবে শিবাংশ ও শক্তিঅংশ ন্যূনাধিক থাকা প্রযুক্ত তিন খণ্ডের পার্থক্য। এই তারতম্য না থাকিলে সৃষ্টির বিচিত্রতা হইতে পারে না। যে খণ্ডে শিবতত্ত্বের প্রচুরতা থাকিল, তাহাই এখন অপর বিন্দু হইল। যে খণ্ডে শক্তিতত্ত্বের প্রাধান্য, তাহাই 'অকথাদি' ত্রিরেখা ঘটিত সমগ্র বর্ণাবলী সমন্বিত এবং 'বীজ' নামে অভিহিত। যাহা এখন নাদ অংশ, তাহা ঐ বিন্দু ও বীজ উভয়ের সমবায় বা সম্মিলন ঘটিত, সুতরাং উভয়াত্মক। এখন এই তত্ত্বগুলি বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে। ভূতশুদ্ধির ষট্‌চক্রচিন্তা কালে, তন্ত্রোক্ত রহস্যপূজা স্থলে, অকথাদি ত্রিরেখা জানা আবশ্যক। সহস্রারে গুরুচিন্তা করিতে গেলে, এবং গুরুপাদুকা স্তোত্রের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, শ্রীগুরুর সিংহাসনরূপ এই রেখাত্রয় যথাভাবে ধারণা

করিতে হইবে। আবার এই নাদ-বিন্দু-বীজ ঘটিত রেখাত্রয় লইয়া তন্ত্রের 'কামকলা' ধ্যান। ইষ্টদেবতা এবং ইষ্টমন্ত্র অপেক্ষাও এই কাম-কলার ধ্যান ও জ্ঞান আগমোক্ত সাধনমার্গে একান্ত প্রয়োজনীয়। কামকলার আর এক নাম কামিনী-তত্ত্ব, এবং তাহা না জানিলে বা না বুঝিলে তন্ত্রোক্ত পূজা ও জপ নিষ্ফল। সেইজন্য আগম শাসন করিতে-ছেন 'প্রথমং কামিনীং ধ্যাত্বা জপপূজাং সমাচরেৎ।' বস্তুতঃ এই পর-বিন্দুর ভেদ হইতে কুণ্ডলিনীরূপ শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি, এবং সমগ্র পর-বর্ত্তী সৃষ্টিকার্য্য এই ভেদ হইতে নির্গত হইয়াছে।

শারদাতিলকের প্রসিদ্ধ টীকাকার রাঘবভট্ট বিন্দু ও বীজের সমবায়কে ক্ষোভ্য ক্ষোভক রূপ সম্বন্ধ বলিয়াছেন। বিন্দু ক্ষোভক, এবং বীজ ক্ষোভ্য। বিন্দু কর্তৃক বীজ ক্ষোভিত হওয়াতে পরবর্ত্তী নাদের উৎপত্তি। তবেই বুঝিতে হইবে যে আদি বিন্দু ফাটিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইল—বিন্দু এবং বীজ, এবং তৎসমকালে বিন্দুদ্বারা ক্ষোভিত বীজ হইতে নাদ উত্থিত হইল। আদিবিন্দুতে শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব অবিভক্ত রূপে মিলিত ছিলেন, এই ভেদ কার্য্য দ্বারা শিবতত্ত্ব বিন্দুরূপে এবং শক্তিতত্ত্ব বীজরূপে পৃথক্ হইলেন। তবে যে দ্বিতীয় বিন্দুতে শক্তির অংশ রহিল না, অথবা বীজমধ্যে শিবাংশ রহিল না, তাহা হইতে পারে না, কারণ শক্তির বিম্ব শিবে এবং শিবের বিম্ব শক্তিতে পড়াতেই মায়ার উৎপত্তি, এবং সেই মায়া হইতেই আদিনাদ ও আদিবিন্দুর উৎপত্তি। আরও এই ভেদ হওয়াতে পরবিন্দু যে নিজ স্বরূপ হারাইলেন তাহাও নয়। পরবিন্দু ফাটিয়া তাহা হইতে বিন্দু ও বীজ নির্গত হইলেন, অথচ পরিবিন্দু আপন স্বভাবে রহিলেন, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। এরূপ না বুঝিলে তত্ত্বগুলির আগমোক্ত বিবরণের সমন্বয় হইতে পারে না। পরবিন্দুতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় ছিলেন,

ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞান এই ত্রিশক্তি তখন অব্যক্ত অবস্থায় ছিলেন, বিন্দুর ভেদ হইতে ইহাদের ব্যক্ত অবস্থা উপনীত হইল। বিন্দুর ভেদ কালে যে ধ্বনি হইল তাহাকে 'মহানাদ' বলা হয়, বিন্দু ও বীজের সমবায় সম্বন্ধ হইতে যে ধ্বনি হইল তাহার নাম 'নাদ', এবং এই নাদমধ্যে অকারাদি ক্ষকারান্ত সমগ্র বর্ণাবলীর অব্যক্ত ধ্বনি বিদ্যমান। এই নাদের ঊর্দ্ধে মহানাদ। শারদাতিলক যে বলিয়াছেন—

ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ॥

'পরবিন্দু ফাটিবার কালে যে অব্যক্ত-স্বরূপ ধ্বনি হইল, অর্থাৎ যাহাতে বর্ণগত বিশেষ ধ্বনি লক্ষিত হয় না, সেই অখণ্ড নাদমাত্র ব্যাপক ধ্বনিকে সকল আগমজ্ঞগণ শব্দব্রহ্ম বলিয়াছেন'। এই বচনের দ্বারা অনুমিত হয় যে গ্রন্থকার মহানাদকেই 'শব্দ ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ তিনি মহানাদের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই, অথচ বিন্দু ও বীজের সমবায় জনিত 'নাদ' হইতে 'শব্দ ব্রহ্মকে' পৃথক্ অবধারণ করিতেছেন, এবং এই শব্দ ব্রহ্ম যে কুণ্ডলিনী রূপে পরিণামে প্রাণীগণের দেহমধ্যে অবস্থিত হইয়া বর্ণোচ্চারণের মূলযন্ত্র হইয়াছেন, ইহাও বলিয়াছেন—

তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্।
বর্ণাত্মনাবির্ভবতি গদ্যপদ্যাদিভেদতঃ॥

বস্তুতঃ পরবিন্দু ফাটিবার কালে যে অখণ্ড অব্যক্ত ধ্বনি হইল, সেই ধ্বনি হইতে বিন্দু বীজ ও শেষোক্ত নাদ স্ফুরিত হইল। বিন্দু-ভেদের ক্রিয়া ঐ অব্যক্ত মহানাদ বা শব্দ ব্রহ্ম, এবং সেই ক্রিয়া বিন্দু বীজ ও নাদ এই তত্ত্বত্রয় রূপে আবিষ্কৃত হইল।

আমাদিগের উপাসিত মন্ত্র যখন মেরুমধ্যস্থ সুষুম্না রন্ধ্রে সূক্ষ্মভাবে ধ্বনিত হয়, তখন সেই মন্ত্রধ্বনি ঐ বীজোৎপন্ন নাদ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া তাহার সহিত মিশিয়া যায়—মহানাদে সে ধ্বনি যাইতে পারে না। সেই জন্য মহানাদকে বায়ুর লয়স্থান বলা হইয়া থাকে। কঙ্কালমালিনী তন্ত্র এই মহানাদকে 'মহাবায়ু' বলিয়াছেন—"তৎ কর্ণিকায়াং দেবেশি অন্তরাত্মা ততো' গুরুঃ। সূর্য্যস্য মণ্ডলং চৈব চন্দ্রমণ্ডলমেব চ। ততো বায়ুর্মহানামা ব্রহ্মরন্ধ্রং ততঃ স্মৃতম্॥"—সহস্রদলের কর্ণিকাতে অন্তরাত্মা, তদূর্দ্ধে গুরু, তদূর্দ্ধে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল, তদূর্দ্ধে 'মহা' নামক বায়ু, এবং সর্ব্বোর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র অবস্থিত।" এই মহানাদকে তন্ত্রে লাঙ্গলাকৃতি বর্ণনা করা হয়, এবং নাদকে বলদেবের ন্যায় ধবল বর্ণনা করা হয়। বলরামের অস্ত্র লাঙ্গল—তাঁহার স্কন্ধের উপর শোভিত, এবং ইহারই আধ্যাত্মিক ভাব এখানে বর্ণিত—নাদের উপর বিরাজিত মহানাদ। লাঙ্গলাকৃতি মহানাদের কোন তন্ত্রে 'নাদান্ত' নাম দেখিতে পাওয়া যায়—নাদ যেখানে লয় হয়, তাহাই নাদান্ত। লাঙ্গলের উর্দ্ধভাগ 'ব্রহ্মবিলের' অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্যগত অব্যক্ত আদি নাদ সহ মিলিত—অর্থাৎ তাহার উর্দ্ধশক্তি অব্যক্ত রূপে ইচ্ছাশক্তির আদিরূপ আদিনাদে বিলীন হইয়াছে। লাঙ্গলের অধোভাগ অধঃশক্তি রূপে ভ্রূমধ্য ভেদ করিয়া মেরুমধ্যে প্রসারিত, এবং পরিণামে মূলাধার চক্রস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। বীজ শক্তি রূপ বর্ণপুঞ্জ আদিতে এই লাঙ্গলের অধঃশক্তিমধ্যে ব্যবস্থিত রহিয়াছে। উর্দ্ধ ও অধঃ শক্তিদ্বয় যেখানে মিলিত, সেই স্থানে ত্রিনেত্র দেবতাগণের উর্দ্ধ নেত্র, বা তৃতীয় এবং জ্ঞান নেত্র, বিরাজিত—তথায় অর্দ্ধনারীশ্বর অর্থাৎ স্বশক্তি হইতে অবিচ্ছিন্ন শ্রীগুরু মূর্ত্তি পরবিন্দু মধ্যে চিন্তনীয়—এবং ঐ সঙ্গম স্থানই পরবিন্দুরূপী 'মহাকাল'।

যিনি নির্জ্জন প্রদেশে ঝিল্লির রব শুনিয়াছেন, তিনি হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে ঝিল্লি তাহার ধ্বনি বন্ধ করিবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার রব শ্রোতার অনুভূত হইতে থাকে, কর্ণে শ্রুত না হইলেও মনে হয় যেন তখনও ঝিল্লির রব চলিতেছে। পূর্ব্বশ্রুত ধ্বনি তখন ব্যাপক ধ্বনি রূপে বিদ্যমান থাকে। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস চিত্তকে স্থির থাকিতে দেয় না, সেই জন্য ঐ ব্যাপক রূপে অনুভূত ঝিল্লিরব বিনষ্ট হয়, তাহা না হইলে সেই ব্যাপক-ধ্বনি ক্রমাগত প্রবাহিত হইত, কখনও তাহার লোপ হইত না। ইহাই প্রকৃতির অলঙ্ঘ্যনীয় নিয়ম, যে শক্তি একবার প্রযুক্ত হইলে তাহা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হইতে থাকে, প্রতিহত হইলেও শক্তির স্থূল ক্রিয়া মাত্র রুদ্ধ হয়, তাহার সূক্ষ্মগতির কখনও ক্ষয় হয় না। জড়বিজ্ঞানে বোধ হয় শক্তির এই অবিনাশী প্রকৃতিকে ইনারশিয়া (Inertia) বলে। যখন সমস্ত জগৎ চৈতন্য হইতে উদ্ভূত, সুতরাং চৈতন্যময়, তখন বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নিয়ম সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান মানিতে হইবে। নাদ লয় হইয়া মহানাদরূপ অব্যক্ত ব্যাপক নাদে পরিণত হয়। যে স্থানে নাদ লয় হইয়া অব্যক্ত মহানাদ স্ফুরিত হয়, সেই সন্ধিস্থানই গুরুচিন্তার প্রশস্ত স্থান, এবং সেখানেই পরবিন্দু কল্পিত হয়। তন্ত্র বলিতেছেন 'ধ্যায়েৎ দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্'। গুরুকে দ্বিনেত্র ও দ্বিভুজ চিন্তা করিবে। পরবিন্দুরূপী আদিনাথ মহাকাল একদিকে মহানাদের ঊর্দ্ধশক্তির প্রান্তভূমি নির্গুণ শিব পদবীকে লক্ষ্য করিতেছেন, এবং অপর দিকে মহানাদের অধঃশক্তি দ্বারা গঠিত বিশ্বকে দর্শন করিতেছেন, সেই জন্য শ্রীগুরুকে দ্বিনেত্র কল্পনা করা হইয়াছে; এবং মহানাদের অধঃশক্তি তাঁহার বিশ্বসৃজনক্ষম দক্ষিণ হস্ত, তাহাই বরপ্রদ, ও ঊর্দ্ধশক্তি সংহারক্রমে ব্যবস্থিত বলিয়া অভয়-প্রদ বামহস্ত, কারণ মোক্ষফল প্রদানই তাঁহার অভয়, এবং তাহা

লয় মার্গেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরবিন্দু বা মহাকালরূপী সন্ধিস্থান হইতে নাদের বিশ্রান্তিরূপ অব্যক্ত ব্যাপক মহানাদ বিপরীত গতিতে ঊর্দ্ধাভিমুখে প্রসারিত হইয়া নির্গুণ উন্মনী পদবীতে উপনীত হয় বলিয়া তাহাকে মহানাদের ঊর্দ্ধশক্তি বলা হয়। আর মহানাদের অধঃশক্তি, যাহা শব্দব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়, তাহাই অকথাদি ত্রিরেখাত্মক বর্ণ-পুঞ্জরূপে এবং তদুত্থিত নাদশক্তিরূপে পরিণত হইয়া জগন্নির্ম্মাণের উপাদান-স্বরূপ কুণ্ডলিনী যন্ত্রকে গঠন করিয়া থাকে। ঊর্দ্ধশক্তিতে 'সঙ্কোচ' এবং অধঃশক্তিতে 'বিকাশ' এই উভয়বিধ ক্রিয়ার আধার বলিয়া মহানাদকে লাঙ্গলাকৃতি বর্ণনা করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক যাহা সর্ব্ব-ব্যাপক ও সকলের বিশ্রান্তি বা লয়স্থান তাহার কোনও আকার কল্পিত হইতে পারে না। প্রণবাদি বীজমন্ত্র ধ্বনিত হইলে, সেই ধ্বনি-সম্ভূত নাদের বিশ্রান্তির সঙ্গে চিত্তলয় সংঘটিত হয়, তখন বায়ুর ত্যাগ গ্রহণ বা নিরোধ অনুভূত হয় না, কেবল বায়ুর সমতা এবং তৎসঙ্গে চিত্তের সমতা উপস্থিত হওয়াতে তখন মন বুদ্ধি ও অহংকার নির্ব্বাণ-দশা প্রাপ্ত হয়, এবং এক অপূর্ব্ব-আস্বাদিত আনন্দরস মাত্র স্ফুরিত হইতে থাকে, তখন দেশ কাল ও জগৎ কিছুই থাকে না। কিন্তু চিন্তাব্যাকুল-হৃদয় মানুষের এ অবস্থার আস্বাদন হয় না, যাঁহার পাণ্ডিত্যাদির গৌরব মনে আছে তাঁহারও হয় না, কেবল যিনি তৃণাপেক্ষাও অকিঞ্চন এবং বিষয়চিন্তাশূন্য হইয়াছেন তাঁহার যদি কখনও অনুভূত হয়। এই অবস্থার নামই কুণ্ডলিনীর জাগ্রত অবস্থা!

আমরা কোনও স্বাগমদ্রষ্টা ঋষির বাক্যই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাই নাই। উপনিষদ্ কিম্বা তন্ত্রাদিশাস্ত্রে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা ঋষির সাক্ষাৎ বাক্য নয়, ঋষির নিকট উপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির রচিত ভাষা মাত্র। শ্রোতার অধিকার বুঝিয়া তাহার সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে

পারে এরূপভাবে ঋষিগণ তাঁহাদের স্বাগমলব্ধ জ্ঞানের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই অনেক স্থলে উপদিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বরচিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে পরস্পর সমন্বয় দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মন্ত্রযোগীরা অধুনা সহস্রার মধ্যে যে গুরুচিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা পাদুকাপঞ্চক স্তোত্রের মতানুসারে চিন্তিত হয় বলিয়া আমরা প্রসঙ্গক্রমে এখানে উক্ত স্তোত্র ও তাহার সাম্প্রদায়িক অর্থ সন্নিবিষ্ট করিলাম—

ব্রহ্মরন্ধ্রসরসীরুহোদরে
নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং
দ্বাদশার্ণসরসীরুহং ভজে ॥১

অর্থ। ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরিস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমলের কোষ মধ্যে, অর্থাৎ সেই পদ্মের কর্ণিকাতে অবস্থিত ত্রিকোণাভ্যন্তরে, সংলগ্ন উর্দ্ধমুখ শুক্লবর্ণ দ্বাদশদল পদ্মের ধ্যান করিতেছি। সুষুম্না নাড়ীর মধ্যস্থিত যে রন্ধ্রপথে কুণ্ডলিনীশক্তি মূলাধার হইতে উর্দ্ধে গমন করেন, সেই ব্রহ্মনাড়ী এই দ্বাদশদল পদ্মের কাণ্ডস্বরূপ। সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মনাড়ী এইখানেই শেষ হইয়াছে। দ্বাদশদল পদ্মের দ্বাদশ পত্রে দ্বাদশাক্ষর গুরুমন্ত্র বিরাজিত, অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষর গুরুমন্ত্রের প্রতিবর্ণ এই পদ্মের এক একটী পত্রস্বরূপ, সেই জন্য পদ্মটীকে দ্বাদশার্ণ বলা হইয়াছে। হসন্ত হকার ও সকার, রেফ ও একারযুক্ত এবং নাদবিভূষিত খফ এই বর্ণদ্বয়, হসন্ত হ স ক্ষ ম ল ব র এই সাত বর্ণ ও তদন্তে নাদবিন্দু এবং দীর্ঘ উকারযুক্ত যকার মিলিত হইয়া দ্বাদশাক্ষর গুরুমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

তস্য কন্দলিত কর্ণিকাপুটে
ক্লিপ্তরেখমকথাদিত্রিরেখয়া।

কোণলক্ষিতহলক্ষমণ্ডলী
ভাবলক্ষ্যমবলালয়ং ভজে ॥২

অর্থ। সেই সহস্রদল ও দ্বাদশদল এই উভয় পদ্মের কর্ণিকাদ্বয় উর্দ্ধাধোভাবে পরস্পর মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সেই পুটমধ্যে আমি কামকলাস্বরূপ ত্রিকোণপীঠ (অবলালয়) চিন্তা করিতেছি। অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ ঐ ত্রিকোণপীঠের বামরেখা, ককারাদি ষোড়শবর্ণ উহার মধ্যরেখা, এবং থকারাদি ষোড়শবর্ণ উহার দক্ষরেখা। সেই অকথাদি ত্রিরেখাত্মক ত্রিকোণপীঠের তিন কোণে যথাক্রমে হ ল ক্ষ এই তিন বর্ণ দ্বারা বিভূষিত।

তৎপুটে পটুতড়িৎ কড়ারিম-
স্পর্শমানমণিপাটলপ্রভম্।
চিন্তয়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপু-
র্বিন্দুনাদ মণিপীঠমণ্ডলম্ ॥৩

অর্থ। সেই ত্রিকোণপীঠ রূপ অবলালয়ের (কামকলা যন্ত্রের) 'পুটে' অর্থাৎ মধ্যভাগে, আমি 'হৃদি' অর্থাৎ ধ্যানযোগে অন্তঃকরণ মধ্যে নাদবিন্দুময় মণিপীঠমণ্ডলের চিন্তা করিতেছি। সেই ত্রিকোণের অভ্যন্তরস্থ শূন্য প্রদেশে বিন্দু ও নাদকলা স্ফুরিত হইতেছে, এবং তাহাদের জ্যোতিতে ঐ স্থান চপলা বিদ্যুতের সুকোমল পিঙ্গলবর্ণ এবং 'স্পর্শমান' অর্থাৎ সদৃশ মণিগণের পাটলবর্ণ প্রভাদ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছে। দ্বাদশাক্ষর গুরুমন্ত্রের নাদ সম্ভূত ঐ মণিপীঠ চিন্ময় (জ্ঞানময়) শরীর বিশিষ্ট। ঐ স্থানে বাগ্‌ভববীজ নিত্য স্ফুরিত হইতেছে।

উর্দ্ধমস্য হুতভুক্‌শিখাসখং
তদ্বিলাস পরিবৃংহণাস্পদম্।

বিশ্বঘস্মরমহোৎসদোৎকটং
ব্যামৃষামি যুগমাদিহংসয়োঃ ॥৪

অর্থ। ঐ জ্ঞানময় মণিপীঠের উর্দ্ধপ্রদেশে আমি আদি হংস-মিথুনের চিন্তা করিতেছি। পরমাত্মারূপী 'হং' এবং চিৎশক্তিরূপ 'সঃ' ইহারাই সৃষ্টিবিকাশের আদিতত্ত্ব 'হংসঃ' মিথুন। এই হংসঃ কি প্রকার? 'হুতভুক্‌শিখাসখম্'—অগ্নির শিখার ন্যায় মহোজ্জ্বল। যেখানে ঐ 'হংসঃ' স্ফুরিত হইতেছে তাহা 'তদ্বিলাসপরিবৃংহণাস্পদং'—সেই ব্রহ্মস্বরূপা চিন্ময়ী অজপাগায়ত্রী 'হংসের' অধিষ্ঠানরূপ বিলাস দ্বারা অত্যন্ত কান্তিময় হইয়াছে। ঐ 'হংসঃ' বিশ্বকে গ্রাস করে, উহা বিশ্বের লয়স্থান (বিশ্বঘস্মর)—এবং মহাজ্যোতির প্রকাশক বলিয়া অত্যন্ত দুর্দ্দর্শনীয় (উৎকট), যে মহাবহ্নি জগৎকে গ্রাস করিবে তাহা জীবের অত্যন্ত দুষ্প্রেক্ষণীয়।

তত্র নাথচরণারবিন্দয়োঃ
কুঙ্কুমাসবঝরীমরন্দয়োঃ।
দ্বন্দ্বমিন্দুমকরন্দশীতলং
মানসং স্মরতি মঙ্গলাস্পদম্ ॥৫

অর্থ। 'তত্র' সেই হংসপীঠের সমীপবর্ত্তী পরবিন্দু স্থানে, 'নাথচরণারবিন্দয়োঃ দ্বন্দ্বং' শ্রীনাথের চরণপদ্ম যুগল আমার মানস এখন স্মরণ করিতেছে। 'কুঙ্কুমাসবঝরীমরন্দয়োঃ'—যে চরণ-যুগল হইতে কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ সুধাপ্রবাহরূপ মকরন্দ (পুষ্পমধু) জীবের ত্রিতাপ বিনাশের জন্য নিত্য বিগলিত হইতেছে। যে চরণপদ্মযুগল 'ইন্দুমকরন্দ-শীতলং' চন্দ্রের মকরন্দ অর্থাৎ জ্যোৎস্নারূপ কিরণামৃতের ন্যায় অতীব স্নিগ্ধ এবং সুশীতল, এবং 'মঙ্গলাস্পদম্' মোক্ষরূপ সর্ব্বাতীত মঙ্গলের একমাত্র আলয় স্বরূপ, অর্থাৎ সেই নাথচরণারবিন্দ যুগলই মুক্তিস্থান।

নিষক্তমণিপাদুকানিয়মিতাঘকোলাহলং
স্ফুরৎকিশলয়ারুণং নখসমুল্লসচ্চন্দ্রকম্।
পরামৃতসরোবরোদিতসরোজরোচিস্ফুরদ্
ভজামি শিরসি স্থিতং গুরুপদারবিন্দদ্বয়ম্ ॥৬

অর্থ। শিরঃকুহরে স্থিত গুরুর পদকমলদ্বয় আমি ভজন করিতেছি—ব্রহ্মানন্দরূপ পরামৃত সরোবরে উদিত পদ্মের কান্তির ন্যায় ঐ চরণকমলদ্বয় (স্ফুরিত) প্রকাশমান হইতেছে। পঞ্চম শ্লোকে বর্ণিত শ্রীনাথের পঞ্চম পাদুকা স্থান (নিষক্তমণিপাদুকং) হং ও সঃ এই মণিময় পাদুকা যুগলে সংযুক্ত, এবং সেই পাদুকাযুগলদ্বারা (নিয়মিতাঘকোলাহলং) কামক্রোধাদি জনিত পাপ হইতে সমুদ্ভূত ভব-কোলাহল নিয়মিত অর্থাৎ প্রশান্তকৃত হয়, সেই পাদুকাযুগল প্রকাশযুক্ত কিশলয় (নবোদ্গত পত্র) সমূহের ন্যায় অরুণবর্ণ, এবং তাহার নখজ্যোতি চন্দ্রমাবৎ দীপ্তিমান।

পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রমুখোদিতম্।
ষড়াম্নায়ফলপ্রাপ্তং প্রপঞ্চে চাতিদুর্লভম্ ॥

অর্থ। এই পাদুকাপঞ্চক স্তোত্র পঞ্চাননের পঞ্চমুখ হইতে ভাষিত হইয়াছে, ইহাদ্বারা ষড়াম্নায়ে বিদিত মন্ত্রদেবতাগণের সাধন ফল লাভ হয়, এবং আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রপঞ্চমধ্যে ইহা অতীব দুর্লভ, কারণ শ্রীগুরুর কৃপা ভিন্ন ইহার বোধ হয় না। প্রণবের অকার উকার ও মকার এই তিন মাত্রা, এবং বিন্দু ও নাদ—ইহারাই শিবের পঞ্চমুখ, এবং এই পাঁচ তত্ত্বই 'পাদুকা পঞ্চক'। পরাপ্রাসাদ মন্ত্রে হকার সকার ঔকার বিন্দু ও বিসর্গ (৫), এবং হংসঃ মন্ত্রে হকার বিন্দু সকার চন্দ্র ও বিসর্গ (৫), যথাক্রমে পাদুকা পঞ্চক। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর সদাশিব ও পরশিব এই ছয়তত্ত্ব লইয়া ষণ্মুখ দেবতা কার্ত্তিকেয়

তত্ত্ব। এই ছয় তত্ত্ব হইতে যথাক্রমে ষড়্বিধ উপাস্য দেবতা ও তাঁহাদের মন্ত্র তন্ত্র নির্গত হইয়াছে, তাহাই ষড়াম্নায় নামে তন্ত্রে পরিচিত। সংক্ষেপে ষড়াম্নায়ের বিবরণ যথা—"কে দেবা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষদাতারঃ? কা দেব্যো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাত্র্যঃ? তদাহ শিবঃ। পশ্চিমমুখেন নারায়ণ বৈষ্ণবরাঘবনারসিংহবরাহ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গদাতারো মন্ত্রাঃ কথিতাঃ সোপায়াঃ স পশ্চিমাম্নায়ঃ। দক্ষিণেন মুখেন প্রাসাদাদি-দক্ষিণামূর্ত্তি প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গপ্রদাতারঃ সোপায়া মন্ত্রাঃ কথিতাঃ স দক্ষিণাম্নায়ঃ। পূর্ব্বমুখেন ভুবনেশ্বরী চান্নপূর্ণা মহালক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতীনাং মন্ত্রাঃ সোপায়াঃ কথিতাঃ, চতুর্ব্বর্গদাত্র্যঃ, স পূর্ব্বাম্নায়ঃ। উত্তরমুখেন কালীতারামর্দ্দিনী জয়দুর্গা শক্তি প্রভৃতীনাং মন্ত্রাঃ সোপায়াশ্চতুর্ব্বর্গদাত্র্যঃ, স উত্তরাম্নায়ঃ। ঊর্দ্ধমুখেন ত্রিপুরেশী মহা-ত্রিপুর-ভৈরবী ত্রিপুরসুন্দরী বিদ্যা প্রভৃতীনাং মন্ত্রাঃ সোপায়াঃ কথিতাঃ স ঊর্দ্ধাম্নায়ঃ। ঈশানমুখেন সর্ব্বমন্ত্রাণাং স্থানাসনমালা নৈবেদ্যাদি বিদ্যাভেদানাং মন্ত্রাঃ কথিতাঃ স ঈশানাম্নায়ঃ। এতে ষড়াম্নায়া জাতাঃ।" আমরা এস্থলে ষড়াম্নায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না, কারণ তত্ত্ব সকল পরিষ্কার ভাবে নিরূপিত না হইলে উহার আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। এখন অকথাদি রেখাত্রয় ও হংসচক্রের একটু আলোচনার প্রয়োজন।

বীজশক্তিরূপ বর্ণাবলী, যাহা লাঙ্গলাকৃতি মহানাদের অধঃশক্তি মধ্যে ব্যবস্থিত, তাহাই আদিতে অকথাদি ত্রিরেখারূপে বিন্যস্ত বর্ণপুঞ্জ। মহানাদের অধঃশক্তি যখন ভ্রূমধ্য ভেদ করিয়া মেরুমধ্যে প্রসারিত হইল, তখন ঐ বর্ণপুঞ্জরূপ বীজশক্তি সেই সঙ্গে অধঃপ্রসারিত হইয়া ষট্‌চক্র গুলিতে পৃথক্ পৃথক্ স্থান অধিকার করিল। ফলকথা আদি-বিন্দুই প্রথম ক্রিয়াশক্তি, এবং তাহা ফাটিবার পর সেই শক্তি প্রথমতঃ

অকথাদি রেখাত্রয়ের বর্ণরূপে বীজশক্তিতে পরিণত হইলেন, এবং পরিণামে ভ্রূমধ্য হইতে মেরুমধ্যস্থ চক্রগুলিতে তত্রত্য বর্ণাবলীরূপে প্রসারিত হইলেন। [আমরা এখানে 'ভ্রূমধ্য' শব্দ দ্বারা মস্তিষ্কের সেই স্থানকে লক্ষ্য করিতেছি যেখান হইতে উভয় অক্ষিতারকার স্নায়ুদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই ষট্‌চক্র গ্রন্থের দ্বিদল আজ্ঞাচক্র] এই বর্ণাবলী শব্দব্রহ্ম মহানাদেরই রূপান্তর মাত্র—যাহা বর্ণ তাহা নাদ ও জ্যোতি মিশ্রিত, সুতরাং ক্রিয়াশক্তি-প্রধান পরবিন্দুর উৎপাদিত ক্রিয়া পরম্পরা মাত্র। শব্দব্রহ্ম বীজ শক্তিতে উপনীত না হইলে বিভিন্ন সৃষ্টি তত্ত্বের বিকাশ হয় না—সুতরাং শব্দব্রহ্ম আবিষ্কারের পরবর্ত্তী তত্ত্বগুলি বীজ-শক্তির পরিণতি, এবং সেই সকল তত্ত্ব বর্ণপুঞ্জে নিহিত বলিয়া বর্ণ-ঘটিত মন্ত্রকে বীজমন্ত্র বলা হয়, ও মন্ত্রগত নাদশক্তির চৈতন্য সাধন দ্বারায় সাধকের অভীষ্ট ক্রিয়া ফল লাভ হয়। নতুবা বীজ মন্ত্রের উপাসনাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে একমাত্র ভক্তি ও চিত্তের একাগ্রতা ছাড়া অন্য হেতু লক্ষিত হয় না।

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে সৃষ্টিতত্ত্ব গুলি ভ্রূমধ্যের উপরিভাগে কারণ-রূপে, মেরুমধ্যে সূক্ষ্মরূপে, এবং বহির্দৃষ্টিতে স্থূলরূপে রহিয়াছে। পর বিন্দু ভেদ হইয়া যে বীজশক্তি হইল তাহা বর্ণপুঞ্জের কারণাবস্থা, এবং সে অবস্থায় তাহারা অকথাদি ত্রিরেখারূপে ব্রহ্মরন্ধ্রের অধোভাগে ভাসমান। মেরুমধ্যে বিভিন্ন চক্রে তত্ত্বগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত হইল, এবং বর্ণগুলিও বিভিন্ন স্তবকে তথায় বিভিন্ন চক্রে সন্নিবেশিত হইল। প্রতিচক্রের বর্ণগুলি সেই চক্রে বিন্যস্ত তত্ত্ব সকলের ভাসমান মূর্ত্তি, এবং ইহাই বর্ণপুঞ্জের সূক্ষ্ম অবস্থা। যখন স্বরযন্ত্রের দ্বারা উচ্চা-রিত হয়, তখনই তাহারা স্থূল ভাব ধারণ করে। তন্ত্রে কথিত আছে, যখন বর্ণগুলি কুণ্ডলিনী মধ্যে থাকেন তখন তাহারা জ্যোতির্ম্মাত্রা রূপে

অবস্থিত, এবং সেই অবস্থার নাম পরা অবস্থা। যখন সুষুম্না পথে নাভি পদ্মে উদিত হয়, তখন সেই পদ্মস্থিত বহ্নিতত্ত্বে তাহাদের দীপ্তি বিকসিত হয়—কুণ্ডলিনী মধ্যে সমস্ত বর্ণের একই জ্যোতির্ম্মাত্রা রূপ, নাভিপদ্মে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ দ্যুতি ভাসিত হওয়ায় সেখানে তাহারা 'স্বয়ং প্রকাশা' এবং এই অবস্থার নাম 'পশ্যন্তী'। হৃৎপদ্মে উদিত হইলে তখন বর্ণগুলি নাদযুক্ত হয়, কিন্তু তখনও শ্রুতিগোচর হয় না—তাহাদের অন্তরে নাদ স্ফুরিত হইলেও তাহা বাহিরে আসা ত দূরের কথা, যোগী ভিন্ন অন্যের উপলব্ধি হয় না। এই অবস্থার নাম 'মধ্যমা'। হৃৎপদ্ম ত্যাগ করিয়া তখন তাহারা ফুস্‌ফুস্ মধ্যে শ্বাসযন্ত্রে স্পন্দিত হয়, এবং সেই অবস্থার নাম 'সংজল্পমাত্রা'। পরে যখন জিহ্বামূল কণ্ঠ তালু দন্ত ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রবণগোচর হইয়া শব্দরূপে নির্গত হয়, তখন তাহাদের নাম 'বৈখরী'। কুণ্ডলিনী মধ্যে বর্ণাবলীর যে পরা অবস্থা, উর্দ্ধে অকথাদি ত্রিরেখামধ্যেও তাহাদের সেই পরা অবস্থা। সুষুম্নার নিম্নস্তরে যিনি কুণ্ডলিনী রূপে বর্ণাবলী ধারণ করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম রন্ধ্রে অকথাদি ত্রিরেখারূপে অবস্থিত, এবং ঐ ত্রিরেখাই কুণ্ডলিনীর আদিম বা কারণ অবস্থা। কোন তন্ত্রমতে সুষুম্না নাড়ীর উর্দ্ধ এবং অধঃ উভয় প্রান্তেই সহস্রদল পদ্ম অবস্থিত—ষট্‌চক্র বর্ণনা স্থলেই তাহার আলোচনা যুক্তিসঙ্গত। এখন লাঙ্গলাকৃতি মহানাদের অধঃশক্তি যেরূপে ত্রিরেখাত্মক বীজ ভাবাপন্ন হইলেন তাহার তন্ত্রমতে আলোচনার কিঞ্চিৎ আবশ্যক।

প্রপঞ্চসার বলেন যে পরবিন্দু উৎপন্ন হইবার পর তিনি দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। যাহা দক্ষিণ ভাগ তাহাই বিন্দুরূপ পুরুষ, এবং যাহা বামভাগ তাহাই বিসর্গ অর্থাৎ দ্বিবিন্দু রূপ প্রকৃতি। বিন্দুকে 'হং' এবং বিসর্গকে 'সঃ' বলা হয়। হকার শিববীজ, এবং তাহার অর্থ আকাশ।

'সঃ' শক্তিবীজ দ্বারা প্রকৃতি ও শর্ম্ম (সুখ) বুঝায়। সুতরাং পরবিন্দু ভেদ হওয়াতে পুরুষ ও প্রকৃতির বাচক 'হংসঃ' উপস্থিত হইল। 'হংসঃ' হইতে জগতের সৃষ্টি, সুতরাং জগৎ প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক। হংসের ত্রিবিন্দু হইতে ত্রিরেখা নিঃসৃত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের ভাষাতে প্রপঞ্চসারের ঐ বাম ও দক্ষিণকে ঊর্দ্ধ এবং অধঃ অর্থে বুঝিতে হইবে। হংসের বিন্দু পরবিন্দুর নিম্নে ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং সেই বিন্দুকে 'ব্রহ্মবিন্দু' বলা হয়। পরবিন্দু ভেদ হইলে উহা যেন তাহা হইতে অঙ্কুর ভাবে নির্গত হইয়াছে। সেই অঙ্কুর হইতে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণময় জ্যোতিরেখা (প্রচলিত অর্থে) বামভাগে অধোদিকে প্রসৃত হইয়াছে। ঐ স্বর-রেখার শেষ বর্ণ 'অঃ' এই বিসর্গ (দ্বিবিন্দু) হইতে অপর দুই বিন্দু। দ্বিবিন্দুর প্রথম বিন্দু স্বররেখার প্রান্তে অবস্থিত, এবং তাহার
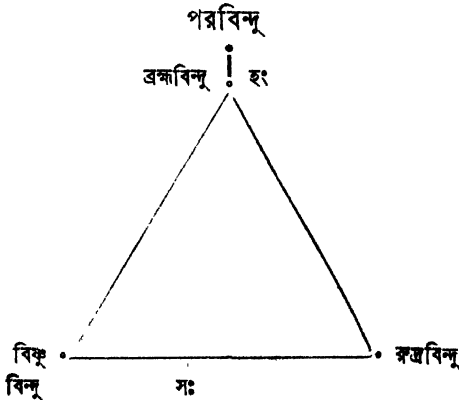
নাম 'বিষ্ণু-বিন্দু'। বিষ্ণু-বিন্দু হইতে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত এই ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ ঘটিত এক জ্যোতি-রেখা বক্রগতিতে সমতল ভাবে (প্রচলিত অর্থে) দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া তৃতীয় বিন্দুতে (অর্থাৎ দ্বিবিন্দু বিসর্গের দ্বিতীয় বিন্দুতে) অবসান হইল। এই তৃতীয়

বিন্দুর নাম 'রুদ্র-বিন্দু'। রুদ্র বিন্দু হইতে থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স এই ষোলটী বর্ণ জ্যোতি রেখা রূপে কিঞ্চিৎ বক্র হইয়া আদি বা পরবিন্দুতে মিলিত হইল। সুতরাং হংসের বিন্দু (হং) ঊর্দ্ধে, এবং বিসর্গ (সঃ) নিম্নে রহিল।

হ ল ক্ষ এই অবশিষ্ট তিন বর্ণ তিন কোণে রহিল। হকার রুদ্রবিন্দুর কোণে, এবং 'ক্ষ' মেরু রূপে ঊর্দ্ধে ব্রহ্মবিন্দুর কোণে রহিল। বরাহ মূর্ত্তিতে বিষ্ণু পৃথিবীর উদ্ধার করেন, সেই জন্য পৃথ্বী-বীজ এই দ্বিতীয় লকার বিষ্ণু বিন্দুর কোণে অবস্থিত। প্রথম রেখার আদিবর্ণ 'অ', দ্বিতীয় রেখার আদিবর্ণ 'ক', এবং তৃতীয় রেখার আদি বর্ণ 'থ'—এই তিন আদি বর্ণ লইয়া ত্রিরেখার নাম 'অকথাদি'। রেখাত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মবিন্দু ও বিষ্ণুবিন্দু হইতে নিঃসৃত রেখাদ্বয় সৃষ্টির অনুকূলে অবস্থিত, এবং বাস্তবিক ঐ দুই বিন্দু লইয়াই 'হংসঃ'। রুদ্রবিন্দু সৃষ্টির প্রতিকূলে, এবং তথা হইতে নিঃসৃত রেখা লয় বা সংহার মার্গে ধাবিত হইয়াছে, কারণ ঐ রেখা পরবিন্দু হইতে নির্গত বস্তুকে পুনরায় সেই পরবিন্দু স্থানে লইয়া যাইতেছে। ব্রহ্মবিন্দুতে সৃষ্টির সংকল্প রূপ সূক্ষ্মাবস্থা, বিষ্ণুবিন্দু হইতে সৃষ্টির স্থূল বা ব্যক্তাবস্থা, এবং রুদ্রবিন্দু দ্বারা সৃষ্টির সংহরণ হইয়া পুনরায় তাহা কারণাবস্থাতে উপনীত হইতেছে। 'হং' এই বিন্দুরূপ গর্ভ মধ্যে সৃষ্টির অঙ্কুর, আর 'সঃ' এই বিসর্গমণ্ডল মধ্যে সৃষ্টির স্থিতি। রুদ্রবিন্দু হইতে নিঃসৃত রেখাকে ত্যাগ করিলে, এই 'হংসঃ' একটী লাঙ্গলাকৃতি বস্তু, শান্তি পুষ্টি প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্ম্মে এবং ঐহিক বিভূতি কামী গৃহস্থ সাধকের পক্ষে এইরূপ লাঙ্গলাকৃতি মহানাদ চিন্তনীয়। আবার ব্রহ্মবিন্দু হইতে নিঃসৃত আদিরেখাকে ত্যাগ করিয়া, 'সঃ' এই সৃষ্টি মণ্ডলকে 'হং' এই বিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, 'সোহং' রূপী যে লাঙ্গলাকৃতি মহানাদ তাহাই মুমুক্ষু যোগীর

চিন্তনীয়। 'হংস'রূপী লাঙ্গল দক্ষিণাবর্ত্তে সুতরাং সৃষ্টিক্রমে চিন্তনীয়, আর সোহংরূপী লাঙ্গল বামাবর্ত্তে সুতরাং লয়ক্রমে চিন্তনীয়। অতএব পরবিন্দুর ভেদজনিত যে লাঙ্গলাকৃতি মহানাদ হইলেন, তিনি 'হংসঃ' এবং 'সোহং'রূপে অকথাদি ত্রিরেখাতে অবস্থিত—'সোহং' সেই লাঙ্গলের ঊর্দ্ধশক্তি, এবং 'হংসঃ' তাহার অধঃশক্তি। বস্তু এক, চিন্তার ভিন্নক্রম হইতে রূপের ভিন্নত্ব। এইরূপ পূর্ব্বতন ঋষি ও ব্রাহ্মণগণের গুরু ব্রহ্মবিন্দু স্থানে অবস্থিত বলিয়া তাঁহারা ব্রহ্মাকে সাক্ষাৎ করিতেন, পরবর্ত্তী ঋষি ও ক্ষত্রিয়গণ বিষ্ণু বিন্দুতে গুরু কল্পনা করিয়া বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ করিতেন, আর সর্ব্বযুগের মুমুক্ষুগণ রুদ্রবিন্দুতে শ্রীগুরুর কল্পনা করিয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আগম-দ্রষ্টা ঋষিগণের দর্শনের ভিন্নত্ব হইতে বিভিন্ন তন্ত্রের বর্ণনা ভেদ ঘটিয়াছে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিচারে ঐ সকল মতভেদের তত্ত্বগত সমন্বয় হইতে পারে, এবং তাহার দৃষ্টান্ত ঐ লাঙ্গলাকৃতি মহানাদ এবং অকথাদি ত্রিরেখার একার্থতা। উপরে যে অকথাদি রেখাত্রয় বর্ণিত হইল, তাহা ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণাকার। ধ্যানবিশেষে উহা সমতল ভাবে অবস্থিত চিন্তা করিতে হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মবিন্দুকে মস্তকের পশ্চাৎভাগে এবং বিষ্ণু-বিন্দু ও রুদ্র-বিন্দুকে ললাট অভিমুখে অবস্থিত ভাবিতে হয়। শ্রীগুরুর সিংহাসন চিন্তাতে সাধারণতঃ এই সমতল ধ্যান প্রশস্ত। ত্রিরেখার উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন—

বিন্দোরঙ্কুরভাবেন বর্ণাবয়বরূপিণী।
বিন্দ্বগ্রে কুটিলীভূত্বা তস্মাদীশানমাগতা।
মনোরমা শক্তিরূপা সা শিখা চিৎকলা পরা॥

শক্তীশানগতা রেখা প্রত্যক্ আগ্নেয়মাগতা।
জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানি ত্রিপুরা পরমেশ্বরি॥
বক্রীভূয় পুনর্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা।
ইচ্ছয়া নাদসংলগ্না রৌদ্রী শৃঙ্গাটমাগতা॥

এই বচনের অর্থ বুঝিতে হইলে আগমের দিক্ নির্ণয় জানা আবশ্যক। সাধকের ঠিক্ সম্মুখ ভাগ পূর্ব্ব, অর্থাৎ পূজক এবং পূজ্যদেবতার মধ্যে পূর্ব্বদিক্, সাধকের দক্ষিণে দক্ষিণ দিক্, দেবতার পশ্চাতে পশ্চিম দিক্, আর সাধকের বামে উত্তর দিক্। অতএব ঈশান কোণ সাধকের ঠিক্ বামপার্শ্বে, এবং অগ্নি কোণ তাঁহার ঠিক্ দক্ষিণ পার্শ্বে হইতেছে। বিন্দুকে সাধকের সম্মুখে রাখিয়া, বিন্দু হইতে সাধকের দিকে তাঁহার বামপার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রথম রেখা। ঐ রেখার প্রান্ত হইতে সাধকের দক্ষিণপার্শ্ব (অগ্নি কোণ) পর্য্যন্ত দ্বিতীয় রেখা। দ্বিতীয় রেখার প্রান্ত হইতে আদিস্থান বিন্দু পর্য্যন্ত তৃতীয় রেখা। এই তিন রেখাতে সমগ্র বর্ণাবলী পূর্ব্বোক্তক্রমে সন্নিবেশিত বলিয়া রেখাগুলির বর্ণাবয়বরূপিণী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। আদিবিন্দুর অঙ্কুররূপে তাহা হইতে বর্ণময়ী রেখা নির্গত হইলেন, এবং সোজা সম্মুখদিকে না আসিয়া কুটিল গতিতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত গেলেন। এই স্বরবর্ণময়ী রেখা মনোরমা শক্তিরূপা, যেহেতু স্বর ব্যতীত ব্যঞ্জন উচ্চারণ হয় না। চিৎশক্তি হইতে প্রথম নির্গত বলিয়া ইহাকে চিৎকলা এবং শিখা বলা হইতেছে। শক্তিরেখা ঈশান পর্য্যন্ত গিয়া গতি পরিবর্ত্তনে অগ্নিকোণ অভিমুখে গেলেন, এই দ্বিতীয় রেখা স্বয়ং ত্রিপুরা ও তাঁহার নাম জ্যেষ্ঠা। অগ্নিকোণ হইতে পুনরায় বক্র গতিতে বামদিকে গিয়া প্রথম অঙ্কুর স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে 'শৃঙ্গাট' অর্থাৎ বিন্দুরূপী রুদ্রগিরিতে গিয়া ইচ্ছাশক্তিসম্ভূত আদিনাদ সহ মিলিত হইলেন, সেইজন্য শেষরেখাকে 'রৌদ্রী'

রেখা বলা হইল। শৃঙ্গাট শব্দে পর্ব্বত বা শিখর বুঝায়। কালিকা-পুরাণ মতে কামাখ্যা দেশের ত্রিস্রোতা নদীতীরস্থ 'শৃঙ্গাট' নামক পর্ব্বতে 'ভর্গ'-রূপী শিবলিঙ্গ বিরাজিত। কামাখ্যা শব্দে আগমে যোনি-মণ্ডলকে বুঝায়। ত্রিকোণাকার অকথাদি ত্রিরেখা জগদ্‌যোনি বলিয়া তিনিই প্রকৃত কামাখ্যা, এবং অকথাদি যন্ত্রের ত্রিরেখা ত্রিতত্ত্বের ত্রিধারারূপে প্রবাহিত বলিয়া তাহাই কামাখ্যার ত্রিস্রোতা। পরবিন্দু ঐ ত্রিস্রোতারূপ ত্রিরেখার মূল, এবং তিনি উর্দ্ধে অবস্থিত, অতএব পরবিন্দুই কামাখ্যার 'শৃঙ্গাট' এবং তাঁহার 'ভর্গ' বা ব্রহ্মজ্যোতি শৃঙ্গাটস্থ শিবলিঙ্গ। [আমাদের প্রসিদ্ধ তীর্থগুলি এইরূপ দেহমধ্যস্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব] পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে লাঙ্গলাকৃতি মহানাদের উর্দ্ধশক্তি ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে অব্যক্ত আদিনাদে মিশিয়াছেন, এখানেও সেই কথা বলা হইল, এবং মহানাদ এবং অকথাদি ত্রিরেখা এখানেও একই বস্তু হইতে-ছেন। যেমন হংসের ভাবনা পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই তত্ত্বরূপে ভাবা যায়, আবার অকথাদি ত্রিরেখারূপেও হইতে পারে, মহানাদকেও সেইরূপ উভয় ধ্যানে চিন্তা করিতে পারা যায়। ত্রিরেখাস্থিত বর্ণপুঞ্জ বিন্দু কর্ত্তৃক ক্ষোভিত হইয়া যে নাদ উৎপন্ন হইল, তাহা ত্রিরেখার নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্ররূপে স্থিত চিন্তা করিতে হয়। মহানাদই আদি প্রণব, যাহাতে ত্রয়ীরূপী বেদ অধিষ্ঠিত এবং যাহা ব্রহ্মবিন্দু-রূপ আদি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল ভাগবত বলিয়াছেন। বীজ হইতে উত্থিত নাদ আদি প্রণব মহানাদের অপবাহ (induction)। মহানাদ শব্দ-ব্রহ্মের অব্যক্ত অবস্থা ও প্রকৃতিতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, এবং বীজোত্থ নাদ তাঁহার ব্যক্তাবস্থা অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির জগৎ নির্ম্মাণোপযোগী স্থূলাবস্থা। বিন্দু কর্ত্তৃক বীজের ক্ষোভই প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ, কারণ ঐ ক্ষোভজনিত ত্রিবিন্দু-রূপী গুণত্রয়ের পৃথক্ আবির্ভাব। সম্মোহন

তন্ত্রে সদাশিব কার্ত্তিকেয় সন্নিধানে তত্ত্বগুলির এইরূপ সন্নিবেশ প্রকাশ করিয়াছেন—

ইন্দুর্ললাটদেশে চ তদূর্দ্ধে বোধিনী স্বয়ং।
তদূর্দ্ধে ভাতি নাদোঽসৌ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিঃ পরঃ॥
তদূর্দ্ধে চ মহানাদো লাঙ্গলাকৃতিরুজ্জ্বলঃ।
তদূর্দ্ধে চ কলা প্রোক্তা আঞ্জীতি যোগিবল্লভা।
উন্মনীতু তদূর্দ্ধে চ যদ্গত্বা ন নিবর্ত্ততে॥

'ভ্রূমধ্যস্থ ললাট প্রদেশের নিকট আজ্ঞাচক্রে সূক্ষ্ম-মনোরূপী ইন্দু (এই মন আমাদের সংকল্পাত্মক মন হইতে বিভিন্ন), তাহার উর্দ্ধে ক্রমশঃ বুদ্ধি-রূপিণী বোধিনী শক্তি, পরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাদ, পরে লাঙ্গলাকারে ভাসমান মহানাদ, পরে যোগিদিগের ব্রহ্মানন্দপ্রদ আঞ্জী নামক কলাশক্তি (ইহাই ইচ্ছাশক্তি সম্ভূত আদি নাদ, যাহা ব্রহ্মরন্ধ্রে সূক্ষ্ম কুটিলাকার রেখারূপে ধ্যেয়), এবং আঞ্জীর উর্দ্ধে উন্মনী নামক শূন্যপদবী, যেখানে গেলে পুনরাবৃত্তি রহিত হয়।' পূর্ণানন্দ গিরির ষট্‌চক্র-নিরূপণ গ্রন্থে, সহস্রদল কমলের কর্ণিকামধ্যে পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডল, এবং মণ্ডলমধ্যে ত্রিকোণ বর্ণিত হইয়াছে, মণ্ডলের অধোভাগে লাঙ্গলাকার মহানাদকে রাখা হইয়াছে। ইহা ধ্যানভেদ মাত্র, কারণ সহস্রদলে একই ত্রিকোণ সর্ব্বত্র দেখা যায় ও তাহাই অকথাদি ত্রিরেখাময়। আমরা সৃষ্টিক্রমের অনুসরণে তত্ত্বগুলির যথাসম্ভব স্থান নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেছি।

মহানাদ-রূপী আদিপ্রণব হইতে প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক 'হংসঃ' নিঃসৃত হইয়াছেন, তাহা রুদ্রযামল প্রকাশ করিতেছেন—

একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
মম বিগ্রহসংক্লৃপ্তা সৃজত্যবতি হন্তি চ॥

প্রণবাদুদ্ভবা এতে যোগবিঘ্নকরাঃ সদা ॥

অকারং ব্রহ্মণো বর্ণং শব্দরূপং মহাপ্রভম্।
প্রণবান্তর্গতং নিত্যং যোগপূরকমাশ্রয়েৎ ॥

উকারং বৈষ্ণবং বর্ণং শব্দভেদিনমীশ্বরম্।
প্রণবান্তর্গতং সত্বং যোগকুম্ভকমাশ্রয়েৎ ॥

মকারং শাম্ভবং রূপং জীবভূতং বিধূদ্গতম্।
প্রণবান্তঃ স্থিতং কালং লয়স্থানং সমাশ্রয়েৎ ॥

বর্ণত্রয়বিভাগেন প্রণবং পরিকল্পিতম্।
প্রণবাজ্জায়তে হংসো হংসঃ সোহং পরোভবেৎ ॥

সোহংজ্ঞানং মহাজ্ঞানং যোগিনামপি দুর্লভম্।
নিরন্তরং ভাবয়েদ্ যঃ স এব পরমো ভবেৎ ॥

হং পুমান্ সঃ স্বরূপেণ চন্দ্রেণ প্রকৃতিস্তু সঃ।
এতদ্ধংসং বিজানীয়াৎ সূর্য্যমণ্ডলভেদকম্ ॥

বিপরীতক্রমেণৈব সোহংজ্ঞানং যদা ভবেৎ।
তদৈব সূর্য্যগো সিদ্ধো বাসুদেবপ্রপূজিতঃ ॥

হকারার্ণং সকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃ পরম্।
সন্ধিং কুর্য্যাৎ ততঃ পশ্চাৎ প্রণবোঽহংসৌ মহামনুঃ ॥

শ্রীপরাশক্তি বলিতেছেন—"ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতা বস্তুতঃ একই মূর্ত্তি, আমার বিগ্রহ হইতে (অর্থাৎ আমার নাদাত্মক শরীর হইতে) ইহাঁদের দেহ সংঘটিত হইয়া সৃজন পালন ও সংহার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। প্রণব হইতে ইহাঁরা উৎপন্ন, এবং ইহাঁরাই যোগের বিঘ্নকারী। (অর্থাৎ নাদরূপ প্রণবই জগৎ প্রপঞ্চরূপে ভাসমান, যোগ অবলম্বনে সাধক জাগতিক ক্রমের বিপরীত ক্রম বা গতি উৎপাদনের প্রয়াস করেন, সেই হেতু প্রণবদেহধারী হইতে যোগের বিঘ্ন

সমুত্থিত হয়। কোন বস্তুকে তাহার স্বাভাবিক স্থিতির বিপরীত সাধন করিতে গেলে, সেই বস্তুগত শক্তি সেই ক্রিয়ার প্রতিরোধ করে, এবং ইহাকে জড়বিজ্ঞানে বস্তুর স্থিতিস্থাপক গুণ বলে। সেই যোগ-বিঘ্ন নিবারণের জন্য সাধক কি করিবেন, তাহাই বলা হইতেছে)—প্রণবের অন্তর্গত প্রথম মাত্রা অকার ব্রহ্মার বর্ণ এবং মহাপ্রভাযুক্ত শব্দ-শক্তি, ইহা যোগের পূরক ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া থাকে (অর্থাৎ অকার ব্যাপক শব্দ রূপে অবস্থিত, ব্যাপক শব্দে বায়ুর সাম্যাবস্থা বিদ্যমান, পূরক কালে বায়ুর আকর্ষণ দ্বারা সেই সাম্যাবস্থার প্রতিবন্ধ হয়, সেই জন্য ব্যাপক শব্দ অকার পূরকের বিঘ্নকারী)। প্রণবের অন্তর্গত 'উকার' মাত্রা ঐ ব্যাপক-শব্দকে ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, কারণ উকার উদান-বায়ুকে আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধাভিমুখে গমন করে, তাহাতে নিস্তরঙ্গ ব্যাপক-শব্দ স্ফুটিত হয়, উর্দ্ধগতি হেতু উকার সত্বস্তর প্রাপক, সুতরাং সত্ব-গুণ বিশিষ্ট বিষ্ণুর বর্ণ; উকার মাত্রা আবার প্রণবের অপর মাত্রাদ্বয় অপেক্ষা সমধিক বীর্য্যশালী—কারণ অকারের স্বর হ্রস্ব, মকার প্লুতস্বর, আর উকার প্রণবমধ্যে দীর্ঘমাত্রা। অকার ও মকারকে অতিক্রম করিয়া উকার আপনার প্রাধান্য সমুত্থিত করেন বলিয়া ঈশিত্ব নিবন্ধন ঈশ্বরস্থানীয়। প্রাণায়ামের কুম্ভক (অর্থাৎ পূরিত বায়ুর রোধ) কালে উকারের উর্দ্ধগতি প্রতিহত হয়, সেই জন্য উকার যোগের কুম্ভকাবস্থাকে আশ্রয় করিয়া কুম্ভকের বিঘ্ন করে। সত্বগুণ ভিন্ন স্থিতি-শক্তি হয় না; এবং স্থিতি-শক্তি ব্যতিরেকে কুম্ভক হয় না, প্রাণায়ামের কুম্ভক সময়ে সত্বগুণ-প্রধান বিষ্ণুর চিন্তা করিতে হয়। প্রণবের তৃতীয় মাত্রা মকার শম্ভুর বর্ণ, উহা নাদশক্তি রূপ চন্দ্র হইতে উদ্ভূত, মকার উচ্চারণে রুদ্ধ বায়ুর অতিধীরে বিরেচন দ্বারা তাহা বিলীন হইয়া পূর্ব্বাবস্থা

ব্যাপকভাবকে প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য লয়স্থান বলিয়া মকার কাল স্বরূপ, যেহেতু কালই একমাত্র সংহারকর্ত্তা। নাদরূপ শক্তির সন্নিহিত বলিয়া মকারই জীবভাবে অবস্থিত, কারণ জীবশক্তি নাদেরই স্পন্দন মাত্র, এবং সেই জীব হরি-হর-ব্রহ্মাদি হইতে সকল চৈতন্য রূপে জগতে ব্যাপ্ত। এইরূপ অ-উ-ম্ বর্ণ ত্রয়ের বিভাগ লইয়া প্রণব গঠিত। প্রণব হইতে হংসের উৎপত্তি, অর্থাৎ মহানাদ-রূপ আদি প্রণব প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক (বিন্দু ও বীজাত্মক) 'হংসঃ' রূপে উপনীত হয়। 'হংসঃ' বিপরীত গতিতে সোহং ভাবের উদ্বোধন করে। সোহং জ্ঞানই মহাজ্ঞান, এবং তাহা যোগীরও দুর্লভ। নিরন্তর সোহং ভাবনাতে ভাবিত হইলে পরম গতি লাভ হয়—হংসঃ চিন্তাতে পুরুষ ও প্রকৃতি ঘটিত জগতেরই চিন্তা হইয়া থাকে, আর সোহং চিন্তাতে জগতের চিন্তা ব্রহ্মে বিলীন করা হয়। হং বিন্দুরূপী পুরুষকে বুঝায়, আর সঃ চন্দ্র স্বরূপ বলিয়া প্রকৃতিকে বুঝায়, কারণ বিন্দু সূর্য্যরূপে ও নাদ চন্দ্ররূপে কল্পিত হয়। হংসের জ্ঞানের দ্বারা বিন্দুরূপ সূর্য্য-মণ্ডলকে ভেদ করিতে হয়। হংসের বিপরীত ভাবনাতে সোহং জ্ঞান উপস্থিত হইলে যোগী সূর্য্য ভেদ করিতে সক্ষম হন ও বাসুদেব পূজিত সিদ্ধাবস্থা লাভ করেন, অর্থাৎ বিন্দুর পরপারে অবস্থিত মহাবিষ্ণু বা মহাকাল রূপ পরবিন্দুতে লয় হন ; তখন হংসের হকার ও সকার লোপ হইয়া সন্ধিক্রমে মহামন্ত্র প্রণবই অবশেষ থাকেন।

রুদ্রযামল প্রণবের মাত্রা সম্বন্ধে যথাক্রমে তাহাদের শব্দব্যাপকত্ব শব্দ-ভেদিত্ব ও লয়স্থানত্ব উপদেশ দিলেন, ইহাতেই মন্ত্রযোগীর মানস জপের সঙ্গে অন্তঃপ্রাণায়ামেরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বাহ্য বায়ুর আকর্ষণ ধারণ ও বিরেচন, এবং অস্ফুট স্বরে মন্ত্র-জপ (যাহাকে উপাংশু জপ বলে) প্রথমাধিকারী সাধকের জন্যই বিহিত। যখন

যোগীর সূক্ষ্ম অন্তঃপ্রাণায়াম হইতে থাকে, তখন বায়ুর ব্যাপক-রূপ পূরক, স্থৈর্য্যরূপ কুম্ভক, এবং লয়রূপ রেচক অন্তরে অনুভূত হইতে থাকে, এবং সেখানেও প্রণবের মাত্রাগুলি তাহাদের পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অকার মাত্রার হ্রস্বত্ব ও তাহাকে ব্যাপক শব্দ রূপে চিন্তা দ্বারাই অন্তঃপ্রাণায়ামের পূরক ক্রিয়া সাধিত হয়, উকারের দীর্ঘত্ব ও শব্দভেদিত্ব ভাবনাতে কুম্ভক সিদ্ধ হয়, এবং মকারের প্লুতত্ব চিন্তাসহ তদুদ্ভূত নাদপ্রবাহে চিত্তকে ভাসাইয়া দেওয়াতে রেচক সিদ্ধ হয়। এরূপ প্রাণায়ামে বায়ুর সাম্যত্ব বিচলিত হয় না—শব্দের ব্যাপকত্ব চিন্তার সঙ্গে বায়ুর ব্যাপকত্ব আসিয়া পড়ে, তাহাতেই বায়ু দ্বারা অন্তঃপূর্ণ ভাবনাই এখানে পূরক; দীর্ঘ মাত্রা চিন্তার সঙ্গেই তাহার শব্দভেদিত্ব অনুভূত হয়, সেই সঙ্গে স্থৈর্য্য ধারণা রূপ কুম্ভক উপস্থিত হয়; আর নাদের অনুভূতি সঙ্গে চিত্তলয় অনিবার্য্য, লয় যেন স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেওয়া, তাহাই রেচক স্থানীয়। পক্ষান্তরে শব্দের অথবা বায়ুর ব্যাপকত্ব ধারণাই প্রণবান্তর্গত অকার-রূপী ব্রহ্মার ধারণা, স্থৈর্য্য-ধারণাই উকার-রূপী বিষ্ণুর ধারণা, এবং লয়চিন্তাই মকার-রূপী শম্ভুর ধারণা। শুধু যে ওঙ্কার-রূপ প্রণবেই এইরূপ মাত্রাচিন্তা সহ আভ্যন্তর প্রাণায়াম হইতে পারে তাহা নয়, যে কোন বীজমন্ত্রে ঐরূপ মাত্রা কল্পনা সহ অন্তঃপ্রাণায়াম এবং মানস জপ হইতে পারে। যে সকল মন্ত্রে একটী মাত্র ব্যঞ্জন বর্ণ আছে, সেখানে ব্যঞ্জন স্বর ও নাদ ভেদে মাত্রা নির্ণয় করিয়া ব্যঞ্জনকে অকারস্থানীয় ব্যাপক বায়ু ও শব্দ, স্বরকে উকারস্থানীয় এবং শব্দভেদী দীর্ঘমাত্রা, এবং নাদকে মকাররূপ লয়স্থান করিতে হয়, তাহাতে শ্রেষ্ঠ মানস জপ ও আভ্যন্তর প্রাণায়াম একসঙ্গে হইতে থাকিবে। যেখানে একই বীজমন্ত্রে একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ সংযুক্ত আছে, সেখানে প্রথম বর্ণকে হ্রস্বমাত্রা ব্যাপক-শব্দ করিয়া

পূরক চিন্তা, পরবর্ত্তী ব্যঞ্জন ও তৎসংযুক্ত স্বরকে দীর্ঘমাত্রা চিন্তাতে কুম্ভক, এবং মকার-রূপী নাদে চিত্তলয় রূপ রেচক, সিদ্ধ হয়। মায়া-বীজের হকার হ্রস্বমাত্রা, 'রী' দীর্ঘমাত্রা, এব মকারের অবসান-ভূমি বিন্দু ও নাদ লয়স্থান—এইরূপ কামবীজে 'ক্' 'লী' ও নাদ—শ্রীবীজে 'শ্' 'রী' ও নাদ—বধূবীজে 'স্' 'ত্রী' ও নাদ, মাত্রাবিভাগ বুঝিতে হইবে। বাচিক ও উপাংশু জপেও বীজমন্ত্রের ঐরূপ মাত্রা বিভাগ অনুসারে উচ্চারণ করিতে হইবে। যে সকল মন্ত্রের শেষে চন্দ্রবিন্দু নাই, সেখানে শেষবর্ণ ঈষৎ অনুনাসিক ধরিতে হইবে—'হংসঃ' মন্ত্রের বিসর্গকে অনুনাসিক ভাবিয়া 'হংসঁঃ' উচ্চারণ হইবে, তেমনি 'হরে কৃষ্ণঁ' 'নমঃ শিবায়ঁ' প্রভৃতি। অষ্টাক্ষর নারায়ণ মন্ত্রে ওঁকার হ্রস্ব, 'নমো' দীর্ঘমাত্রা, এবং 'নারায়ণায়ঁ' প্লুত ও লয়স্থান। একাধিক বীজঘটিত মন্ত্রে, প্রত্যেক বীজের উপরোক্ত মাত্রাবিভাগ ত চাই, অধিকন্তু সমুদয় মন্ত্রকে ত্রিখণ্ড করিয়া প্রতিখণ্ডের মাত্রানির্ণয় করিতে হইবে—এবং সেই উদ্দেশ্যে তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতিতে 'মূলং ত্রিখণ্ডং বিধায়' ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। সাবিত্রী মন্ত্রের ব্যাহৃতি-ত্রয় মধ্যে পৃথক্ মাত্রাবিভাগ, এবং সাবিত্রীর তিন পাদ মধ্যে প্রতিপাদে এক এক মাত্রা ধরিতে হইবে। এই ভাবে সূক্ষ্ম অন্তঃপ্রাণায়াম সহ মন্ত্রের মাত্রাবোধ সহিত জপকেই মন্ত্রযোগ বলা যায়—অক্ষরাবৃত্তি রূপ জপ মনঃ-সংযোগ মাত্র, তাহা যোগ নামে বাচ্য নয়।

অকথাদি ত্রিরেখাকে হংসচক্রও বলা যায়। হংসচক্রের পর-বিন্দুস্থানে যে বিন্দু তাহাকে ব্রহ্মবিন্দু এবং পুংবিন্দুও বলা হয়। বিষ্ণুবিন্দুকে চন্দ্রবিন্দু, এবং রৌদ্রীবিন্দুকে বহ্নিবিন্দু বলা হয়। যাহা ব্রহ্মবিন্দু তাহাই বামাশক্তি, এবং ঐ বিন্দু হইতে নিঃসৃত প্রথম রেখার নাম ব্রহ্মরেখা বা বামারেখা। যিনি বিষ্ণুবিন্দু, তিনি জ্যেষ্ঠাশক্তি,

এবং তাহা হইতে নিঃসৃত রেখার নাম বিষ্ণুরেখা বা জ্যেষ্ঠারেখা। রৌদ্রীবিন্দুই রৌদ্রীশক্তি, এবং তাহার রেখার নাম রৌদ্রী রেখা বা শিবরেখা—

অকারাদিবিসর্গান্তা ব্রহ্মরেখা প্রকীর্ত্তিতা।
ককারাদি তকারান্তা বিষ্ণুরেখা পরাৎপরা।
থকারাদি সকারান্তা শিবরেখা ত্রিবিন্দুতঃ॥

ব্রহ্মরেখাতে অকারাদি বিসর্গান্ত ষোড়শ স্বরবর্ণ, বিষ্ণু রেখাতে ক হইতে ত পর্য্যন্ত ১৬ বর্ণ, শিবরেখাতে থ হইতে স পর্য্যন্ত ১৬ বর্ণ। হ-ল-ক্ষ চক্রের তিন কোনে, তাহা বলা হইয়াছে। হংসের ত্রিবিন্দুর ত্রিশক্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন—"এক্ষণে বীজরূপ বিন্দুত্রয় সম্বন্ধে বলিতেছি। হংসঁঃ মধ্যে যে হংকার তাহাই বিন্দু, এবং তাহাকে ব্রহ্মা বলিয়া জানিবে। বিন্দু ও বিসর্গ যুক্ত সকারকে (সঁঃ) হরিহর বলিয়া জানিবে। সঁঃ মধ্যে বিন্দু ও সর্গ অবিনাভাবে সংস্থিত। ব্রহ্মবিন্দু বিশ্বকে বমন অর্থাৎ উদ্গীরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে বামাশক্তি বলা হয়। বৈষ্ণবী শক্তির নাম জ্যেষ্ঠা, তিনি জগত্রয় পালন করেন, পরে রৌদ্রী শক্তি সেই সৃষ্টি গ্রাস করেন। এইরূপে বিন্দুত্রয়কে ত্রিগুণময়ী জানিবে। বিন্দুশব্দে শূন্যকে বুঝাইলেও তাহা গুণবাচকও বটে। ঐ বিন্দুত্রয় যথাক্রমে ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া রূপ, ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বরূপ, তাহারাই পুরত্রয় এবং তত্ত্বত্রয়, বিশ্ব এই ত্রিবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত।" অতএব পরবিন্দুর ভেদ হইতে ত্রিবিন্দুরূপ ত্রিশক্তি এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয় পৃথক্ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, ও সেই পৃথক্ অবস্থার একত্র নাম 'বীজ'। ভেদের পূর্ব্বে তাহাদের সাম্যাবস্থার নাম অব্যাকৃতা প্রকৃতি—তিনি ত্রিশক্তিরূপে বা ত্রিগুণরূপে ত্রিবিন্দুরূপ ধারণ করাতেই তাঁহার নাম ত্রিপুরা।

জ্ঞানার্ণব পুনরায় বলিতেছেন—"আদ্যা শক্তি জগজ্জননী আদিনাদই অম্বিকা, এবং তিনিই ত্রিশক্তিরূপিণী হইয়া ত্রিবিন্দু-রূপ ধারণ করিলে, সেই ত্রিবিন্দু হইতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় প্রকটিত হয়। জাগ্রৎ অবস্থা সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ও শক্তিরূপিণী (বিষ্ণু-বিন্দু), উহা বিষয়-কল্পনা রূপ নানা বিস্তার সম্পন্না, এবং দুঃখ ও দোষ দর্শনের হেতুভূতা। সুষুপ্তি অবস্থা (রৌদ্রীবিন্দু) বিষয়কল্পনাকে হরণ করে, উহা দেহ ধর্ম্ম বর্জ্জিত, তমোগুণময়ী, শিবতত্ত্ব স্বরূপিণী, এবং কর্ম্মকে গ্রাস করেন বলিয়া মোক্ষরূপিণী। সুষুপ্তির অন্তে, এবং জাগরণের পূর্ব্বে, রজোময়ী স্বপ্নাবস্থা (ব্রহ্মবিন্দু), ইহাতে জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি উভয়েরই লক্ষণ লক্ষিত হয়, এবং 'তৃষ্ণা' অর্থাৎ বাসনাই ইহার প্রধান লক্ষণ। এই তিন অবস্থার মিলিত নাম 'বৈন্দব চক্র'। তিন অবস্থার পরপারে তুরীয়াবস্থা। জাগ্রতের অন্তে এবং নিদ্রার পূর্ব্বে, যখন কোন বিষয়জ্ঞান বিদ্যমান থাকে না, যখন সকল উপাধি-বর্জ্জিত চৈতন্য মাত্র স্ফুরিত হয়—তাহাই পূর্ণাবস্থা, পরা কলা বা শক্তি-রূপ তুর্য্যাবস্থা, ভাব ও অভাব বর্জ্জিত, ত্রিগুণের অতীত, মন তখন বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয় না বলিয়া সে অবস্থা অত্যন্ত নিশ্চল। মন এই তুরীয়াবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন উন্মনী নামে কথিত হয়, তাহাই সৎ-স্বরূপ চিন্ময়ী জ্ঞানলতা —পূর্ণ আনন্দধাম শিবপদ। যাহা বিন্দুত্রয় ও নাদরূপে প্রসূত হইয়াছে, সেই ত্রিবিন্দু-রূপিণী আনন্দময়ীর নাম 'ত্রিপুরা'—তিনি সবর্ণা হইলেও বর্ণাতীতা, তিনি কেবল মাত্র জ্ঞান-চিৎকলা, অর্থাৎ বিন্দুত্রয় রূপে যখন তিনি চন্দ্র সূর্য্য ও বহ্নি ভেদে শুক্ল রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণা হন, তখন তিনি সবর্ণা, এবং ত্রিবিন্দু রূপে আবির্ভাবের পূর্ব্বে তিনি

ভেদবর্জ্জিতা জ্ঞানরূপিণী চিৎশক্তিমাত্র, সুতরাং সে অবস্থায় তিনি বর্ণাতীতা।"

হংসচক্রের ত্রিবিন্দু ত্রিরেখা ও নাদ লইয়া কাম কলার ধ্যান। ভূতশুদ্ধিতে, এবং শ্রীগুরুর সিংহাসন ধ্যানকালে, হংসের ত্রিকোণ সমতল ভাবে অবস্থিত চিন্তা করিতে হয়, এবং কামকলা ধ্যানে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ চিন্তা করিতে হয়—অর্থাৎ হং এই একবিন্দুকে উর্দ্ধে ও সঃ এই দ্বিবিন্দুকে তাহার নিম্নে বসাইয়া ত্রিকোণ ভাবিতে হয়। ত্রিকোণের নিম্নে হকারের অর্দ্ধভাগের ন্যায় বক্ররেখারূপে নাদ কলা ভাবিতে হয় (যেমন বেঙাচির লেজ)। এই কামকলাতে জগদ্রূপ অণ্ড অবস্থিত। উপনিষদ্ বলিতেছেন—

> "ওঁ দেবী হ্যেকাগ্র আসীৎ। সৈব
> জগদণ্ডমসৃজৎ। কামকলেতি বিজ্ঞায়তে।
> শৃঙ্গারকলেতি বিজ্ঞায়তে। তস্যা এব
> ব্রহ্মা অজীজনৎ, বিষ্ণুরজীজনৎ,
> রুদ্রোঽজীজনৎ, সর্ব্বে মরুদ্গণা
> অজীজননৎ, গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ কিন্নরাঃ
> বাদিত্রবাদিনঃ সমন্তাদজীজনৎ।
> ভোগ্যমজীজনৎ। সর্ব্বমজীজনৎ॥"

"অগ্রে শক্তিরূপিণী দেবী একা ছিলেন। তিনি এই জগদ্রূপ অণ্ড সৃজন করিয়াছেন। তাঁহাকে কামকলা বলা হয়, শৃঙ্গারকলা বলা হয়। তাঁহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন, রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। সমস্ত মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরগণ, বাদ্যবাদক কিন্নরগণ চারিদিক্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; তাঁহা হইতে সমস্ত ভোগ্য বস্তু, জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি সমস্ত স্থাবর ও

জঙ্গম সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে”—এই কথা বহ্বৃচঃ উপনিষদে বলা হইয়াছে। কামকলার ত্রিবিন্দু ত্রিরেখা ও নাদকলারূপ প্রতিকৃতিতে কামিনীমূর্ত্তির সংযোজন করিলেই কামিনীতত্ত্ব হইয়া থাকে। কামিনী-তত্ত্বের চিন্তাকেই যোগিনী তন্ত্র বীরযোগ বলিয়াছেন, এবং আপনাকে পরমব্রহ্মরূপে চিন্তাদ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের স্বরূপ ভাবনাকেই দিব্যযোগ বলিয়াছেন। দিব্যযোগ ও বীরযোগ ভেদে দুই প্রকার যোগ ঐ তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দিব্যযোগী বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করেন, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক চৈতন্যে বিলীন হন; আর বীরযোগী পরিণামে রুদ্রত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বশক্তির আধার পরবিন্দুতে লয় হন। বীরযোগীর জন্যই কামিনীতত্ত্বের চিন্তা বিহিত হইয়াছে। সেই চিন্তা কিরূপে করিতে হইবে তাহা যোগিনীতন্ত্র বুঝাইতেছেন—

বিন্দুত্রয়ং কলাক্রান্তং প্রথমং পরিচিন্তয়েৎ।
তত্তস্মাদ্ ভাবয়েজ্জাতং স্ত্রীরূপং ষোড়শাব্দিকম্॥
বালার্ককোটিসুজ্যোতিঃ প্রকাশিতদিগন্তরম্।
মূর্দ্ধাদিস্তনপর্য্যন্তম্ ঊর্দ্ধবিন্দুসমুদ্ভবম্॥
বিন্দু যাবন্মধ্যদেহং কণ্ঠাদিকটিশীর্ষকৈঃ।
স্তনদ্বয়েন ভাসন্তং ত্রিবলীপরিমণ্ডিতম্॥
যোন্যাদিকঞ্চ পাদান্তং কামং তৎ পরিচিন্তয়েৎ।
নানালঙ্কারভূষাঢ্যং বিষ্ণুব্রহ্মেশবন্দিতম্॥
এবং কামকলারূপং স্বাত্মদেহং বিচিন্তয়েৎ।
সদৈব পরমেশানি বীরযোগমিমং শৃণু॥

“প্রথমে বিন্দুত্রয় নাদকলা দ্বারা আক্রান্ত চিন্তা করিবে—অর্থাৎ ঊর্দ্ধে একবিন্দু ও তাহার নিম্নে পাশাপাশি দুই বিন্দু রাখিয়া, দুই বিন্দুর নিম্নে কুটিলাকার রেখার ন্যায় নাদকলা ভাবিতে হইবে—

এবং এই প্রতিকৃতি হইতে এক ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রীমূর্ত্তি উৎপন্ন হইলেন চিন্তা করিবে, তাঁহার জ্যোতি উদীয়মান কোটিসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং তদ্দ্বারা যেন দশদিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে; তাঁহার মস্তক হইতে স্তনের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধবিন্দু হইতে উদ্ভূত, অর্থাৎ কাম-কলা চক্রের ঊর্দ্ধবিন্দু কামিনীর মস্তক মুখমণ্ডল এবং গ্রীবাদেশ রূপ ধারণ করিয়াছে ভাবিতে হইবে; নিম্নস্থ দুই বিন্দু হইতে কামিনীর মধ্যদেহ গঠিত হইয়াছে, এই মধ্যদেহ কণ্ঠ হইতে কটিদেশের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং উহা স্তনদ্বয় ও ত্রিবলী দ্বারা শোভিত। মধ্যদেহের স্তনদ্বয়ই দুই বিন্দু, অপর অংশ পূরণ করিয়া লইতে হয়। যোনিপ্রদেশ হইতে পাদপর্য্যন্ত (দেবনাগর) হকারের নিম্নার্দ্ধ ভাগের ন্যায় কুটিলাকার, তাহাই 'কাম'। অর্থাৎ যোনি ও তাহার নিম্নাংশ নাদকলার মূর্ত্তি, যেহেতু ইচ্ছারূপিণী নাদশক্তিই কামস্বরূপ। অনন্তর নানালঙ্কার বিভূষিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও বন্দিত, এই কামকলা মূর্ত্তিকে সাধক নিজদেহের সহ একীভূত চিন্তা করিবেন, অর্থাৎ তিনি আপনার দেহকে ঐ কামকলা রূপ কামিনী দেহ ভাবনা করিবেন। সর্ব্বদা এইরূপ ভাবনাকেই 'বীরযোগ' বলা হয়।

কামকলার কামিনীরূপ নিজদেহে ধ্যান করিলে, সাধক নিষ্কাম বা পূর্ণকাম হইবেন। তখনই তিনি জিতেন্দ্রিয় ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারিবেন। যতক্ষণ কাম চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিবে, ততক্ষণ স্থিরচেতা হওয়া অসম্ভব, সমাধির আস্বাদন ত দূরের কথা! আগমে শিবের একটী বিশেষণ 'সামরস্য-পরায়ণ' প্রায় দেখা যায়। জগতের আদিমূর্ত্তি অর্দ্ধনারীশ্বর—তাহার দক্ষিণার্দ্ধ পুরুষ মূর্ত্তি, আর বামার্দ্ধ নারীমূর্ত্তি, এবং ইহাই সামরস্য-পরায়ণ সশক্তি শ্রীগুরুর মূর্ত্তি। যে অবস্থায় পরবিন্দু ভেদ হইয়া লাঙ্গলাকৃতি মহানাদ উদ্ভুত হইলেন, তাহাতেই

এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, ঊর্দ্ধশক্তি ও অধঃশক্তি যথাক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতি, তখন নাদ ও বিন্দু বিভিন্ন হইয়াও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরবর্ত্তী মূর্ত্তিসৃষ্টিতে নারীদেহ পৃথক্ হইয়াছিল, এবং তাহাই জগতে রহিয়াছে। নারীদেহ পৃথক হইয়া পুরুষদেহকে ক্ষোভিত করিতেছে— ইহারই নাম 'কাম'। সেই ক্ষোভজনিত কাম থাকিতে নরনারী সমরস হইতে পারেন না। সাধক আপনার শরীরে কামকলারূপ কামিনীমূর্ত্তির ধ্যানে আসক্ত থাকিলে, তাঁহাকে কামজনিত ক্ষোভ বিক্ষিপ্ত করিতে পারিবে না—যাহার জন্য ক্ষোভ, সেই তখন দেহ প্রাণ ও মনোমধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত। ভেদজ্ঞান থাকাতেই ক্ষোভ, যাহা নাই তাহা পাইবার জন্যই বাসনা, অভাবজ্ঞান না থাকিলে আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না। যখন এই কামিনী ধ্যান দৃঢ় হয়, তখন পুংস্ত্ব স্ত্রীত্ব একরস হইয়া যায়, সেই একরস হওয়ার নাম 'সামরস্য', এবং তাহাই সংসৃতিরূপ ভবরোগের একমাত্র মহৌষধ। সামরস্য না আসা পর্য্যন্ত নাদের উপলব্ধি হয় না, সুতরাং কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হন না।

যে উদ্দেশ্যে আগম কামকলারূপ কামিনী চিন্তার উপদেশ দিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যে আগম কামিনীশক্তি লইয়া সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কামিনী উপভোগের দ্বারা সেই মহান্ উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়, এবং সাধকও পতিত হন। আগম কেবল কামিনী-যোগ ব্যবস্থা করিয়াছেন—কামিনী-ভোগ বলেন নাই। সেই জন্য শক্তিসঙ্গম তন্ত্র স্পষ্টবাক্যে বলিয়া দিতেছেন যে—যেন কেন প্রকারেণ কামভাবং বিলোপয়েৎ। কামভাববিলোপার্থং যোষিৎসঙ্গং সমাচরেৎ॥—যে কোনও উপায়ের দ্বারা সাধক কামভাবকে সমূলে নাশ করিবেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি নারীসঙ্গ করিতে পারিবেন। কিন্তু পাছে

কেহ এই ‘সঙ্গ’ শব্দের অন্য অর্থ (সম্ভোগ) কল্পনা করেন, তাহার পরিহারের জন্য পুনরায় বলিয়াছেন—‘সঙ্গমেব হি কর্ত্তব্যং, কর্ত্তব্যং ন তু মৈথুনম্’—এই সঙ্গের অর্থ ‘মৈথুন’ নয়। কামিনীর শরীরে কাম-কলার প্রত্যক্ষ অধিষ্ঠান, কামিনীদেহই কামকলার মূর্ত্তি, কামিনী কুণ্ডলিনীর স্থূল শরীর, এবং সেই শরীর কেবল নাদময়—এই ভবনাকে দৃঢ় করিবার জন্য, এবং আপনার শরীরে কামিনী-তত্ত্ব ধারণা করিয়া সামরস্য আস্বাদনের নিমিত্ত, সম্মুখে কামিনী রাখিবার ব্যবস্থা। এমন কি, ব্রহ্মশক্তির কালী তারা সুন্দরী প্রভৃতি কামিনীমূর্ত্তির উপাসনাও সেই উদ্দেশ্যে কল্পিত হইয়াছে। যেখানে সাধক রক্ত-মাংসের দেহ দর্শনে ক্ষুব্ধ হন, সেখানে মৃত্তিকা কাষ্ঠ পাষাণ নির্ম্মিত মূর্ত্তিই তাঁহার পক্ষে বিহিত, এবং সেই উদ্দেশ্যে তন্ত্রে কুমারীপূজার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কারণ অপ্রস্ফুট যৌবন নারীদেহ দর্শনে কামোদ্রেক হইবে না। বিবাহের পূর্ব্বে সেই জন্য কামকলার ধ্যান উপদেশ হওয়া উচিত, এবং নবপরিণীতা পত্নীতে কিছুদিন ভোগ-দৃষ্টি বর্জ্জন করিয়া সামরস্য চিন্তাতে হয়ত একজন্মেই কুণ্ডলিনীর প্রবোধ হইতে পারে, ততদূর ফললাভ না ঘটিলেও সাধক ঐ চিন্তা দ্বারা দাম্পত্যসুখের চিরাধিকারী এবং হৃষ্ট পুষ্ট মেধা ও বীর্য্যশালী সুসন্তানের জনক হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে ঐরূপ সন্ততির আবশ্যক, কামাসক্তচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা সেইরূপ সন্ততির উৎপাদন হইতে পারে না। য়ুরোপীয় সভ্যজাতি মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে যে কোর্টশিপ বিধি আছে, তাহাতেই নারীর এই কামকলারূপে উপাসনা সাধিত হইতেছে, এবং ফলে মেধা ও বীর্য্যশালী সন্তান উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিয়া দিতেছে।

প্রত্যেক বীজমন্ত্রের ত্রিখণ্ড বিষয়ে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বীজের তত্তৎ ত্রিখণ্ড যথাক্রমে কামকলাযন্ত্রের ত্রিবিন্দুস্থানীয়, এবং নাদাংশই কামস্বরূপ। পরবিন্দু ভেদ হওয়াতে যে প্রণবরূপ শব্দব্রহ্ম উৎপন্ন হইলেন, তিনিই হংসচক্র রূপে জগতের মূলযন্ত্র, তাহাই অকথাদি ত্রিরেখারূপে এবং কামকলাযন্ত্র রূপে বিভিন্ন আখ্যায় কথিত হয়। যে ভাবেই হউক, বীজমন্ত্রের সাধনা করিতে গেলেই তাহাকে ত্রিতত্ত্বাকারে ধারণা করিয়া শব্দব্রহ্মস্থানীয় করিতে হইবে। আমরা এখন শারদাতিলকের সৃষ্টিক্রমের অনুসরণ করিতেছি। আদি বা পরবিন্দু ভেদ হইয়া বিন্দু বীজ ও নাদরূপে তিনি ব্যক্ত হইলেন। এই পর্য্যন্ত বর্ণনার পর বলিতেছেন—

রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাৎ জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্রব্রহ্মরমাধিপাঃ ॥
সংজ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মানঃ* বহ্নীন্দ্বর্কস্বরূপিণঃ।

* (তে জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মান ইতি পাঠান্তরম্)

"বিন্দু হইতে রৌদ্রীশক্তি হইলেন। নাদ হইতে জ্যেষ্ঠাশক্তি, এবং বীজ হইতে বামাশক্তি উৎপন্ন হইলেন। এই তিন শক্তি হইতে যথাক্রমে রুদ্র ব্রহ্মা ও রমাপতি উৎপন্ন হইলেন—রৌদ্রীশক্তি হইতে রুদ্র, জ্যেষ্ঠা হইতে ব্রহ্মা, এবং বামাশক্তি হইতে হরি। এই তিন দেবতা যথাক্রমে বহ্নি চন্দ্র ও সূর্য্য স্বরূপ। রুদ্র বহ্নিস্বরূপ, ব্রহ্মা চন্দ্র, এবং হরি সূর্য্য। তাঁহারা আবার যথাক্রমে ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানাত্মক—রুদ্র ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট, ব্রহ্মাতে ক্রিয়াশক্তি, এবং হরি জ্ঞানশক্তিময়।" 'সংজ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মানঃ' এই পাঠ রাঘবভট্ট সম্মত, এবং তাহাতে জ্ঞান সহ ইচ্ছা ও ক্রিয়া এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে, তদনুসারে রুদ্রাদি তিন দেবতার পূর্ব্বোক্ত গুণবিভাগ হয়। 'তে

জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মানঃ' এই পাঠ অনুসারে রুদ্রে জ্ঞানশক্তি, ব্রহ্মাতে ইচ্ছাশক্তি, এবং হরিতে ক্রিয়াশক্তি বুঝায়। রাঘবভট্ট বলেন যে এরূপ ব্যাখ্যা অসাম্প্রদায়িক। সম্প্রদায় ভেদে আগমের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। গৌড় কেরল ও কাশ্মীর ভেদে সমগ্র ভারতবর্ষ তিন প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বিন্ধ্যাচল ও তাহার পূর্ব্বাংশ গৌড় সম্প্রদায়, উত্তরে কাশ্মীর সম্প্রদায়, এবং দক্ষিণে কেরল সম্প্রদায়। রাঘবভট্ট দাক্ষিণাত্যের লোক, এবং তাঁহার ব্যাখ্যা কেরল সম্প্রদায় সম্মত। আমাদের সম্মানিত গৌড় সম্প্রদায় মধ্যে শেষোক্ত ব্যাখ্যাই প্রচলিত মত—রৌদ্রীশক্তি হইতে উৎপন্ন রুদ্র জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন বহ্নিস্বরূপ, জ্যেষ্ঠা শক্তি হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট চন্দ্রস্বরূপ, এবং বামাশক্তি হইতে উৎপন্ন শ্রীহরি ক্রিয়াশক্তিশালী সূর্য্যস্বরূপ। আমরা হংসচক্রের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের সম্মত। সেখানে জ্যেষ্ঠাশক্তিকে বৈষ্ণবী শক্তি, এবং বামাশক্তিকে ব্রহ্মবিন্দু হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মীশক্তি কল্পিত হইয়াছে। যাহা হউক মন্ত্রসাধকের পক্ষে এই সকল মতভেদ উপেক্ষার বিষয়। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র কারণাবস্থায় স্থিত ত্রিতত্ত্ব স্বরূপ। সুষুম্নামধ্যে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান ও মণিপূর নামক চক্রে তাঁহাদের সূক্ষ্মাবস্থা, এবং এই স্থূল জগতে অবস্থিত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র ত্রিবিধ অহংকারের মূর্ত্তি। এখানে যে অগ্নি চন্দ্র ও সূর্য্য, তাহাও ত্রিতত্ত্বরূপ কারণাবস্থা, সুষুম্নামধ্যে তাহাদের সূক্ষ্মাবস্থা, এবং জগৎপ্রপঞ্চমধ্যে স্থূলাবস্থা। ফলতঃ যাহা বিন্দু তাহাই রুদ্র ও রুদ্রশক্তি, তাহাই অহঙ্কার, তাহাই বুদ্ধিশক্তিরূপিণী নিবোধিতার অতীত জ্ঞানশক্তি, এবং তাহাই বহ্নিতত্ত্ব। যাহা নাদ তাহাই জ্যেষ্ঠাশক্তি, কারণ নাদই শক্তির প্রথম বিকাশ, তাহাই ব্রহ্মা, ইচ্ছাশক্তি, মন ও চন্দ্র। যাহা বীজ তাহাই বামাশক্তি, বিষ্ণু ও ক্রিয়াশক্তি,

তাহাই বুদ্ধিশক্তি এবং সূর্য্য। আবার যাহা বহ্নি তাহাই সুষুপ্তি এবং স্বর্লোক, তাহাই তমোগুণ এবং সুষুম্না নাড়ী। যাহা চন্দ্র তাহাই স্বপ্নাবস্থা, ভুবর্লোক, রজোগুণ, এবং ইড়া নাড়ী। যাহা সূর্য্য তাহাই জাগ্রৎ অবস্থা, ভূর্লোক, সত্ত্বগুণ, এবং পিঙ্গলা নাড়ী।

কল্পভেদে কোথাও ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি, কোন কল্পে তিনি ক্রিয়াশক্তি, এবং কোথাও জ্ঞানশক্তিরূপে আবির্ভূত হন। সেইরূপ বিষ্ণু ও রুদ্র কল্পভেদে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন হন। সেই জন্য প্রণবের অকার উকার ও মকার মাত্রাগুলির দেবতার ভিন্নত্ব বিভিন্ন তন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে—

"অকারশ্চ ভবেদ্ব্রহ্মা উকারঃ সচ্চিদাত্মকঃ।
মকারো রুদ্র ইত্যুক্ত ইতি তস্যার্থকল্পনা ॥১॥
অকারে চ ভবেদ্বিষ্ণুরুকারে চ প্রজাপতিঃ।
মকারে চ ভবেদ্রুদ্র ইতি বা বর্ণনির্ণয়ঃ ॥২॥
অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারো ব্রহ্মণো জ্ঞেয়স্ত্রিভিঃ প্রণব উচ্যতে" ॥৩॥

বিভিন্ন কল্পের এই প্রকার শক্তির ভিন্নতা ত্রিবিন্দুর উৎপত্তি হইতে সংঘটিত হয়। হংসচক্রের প্রথম বিন্দু কোন কল্পে ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মা, কোথাও তিনি ইচ্ছাশক্তি বিষ্ণু বা রুদ্র, কারণ ইচ্ছাশক্তিই সকলের আদি, এবং অ-উ-ম্ প্রণবের আদিবর্ণ। দ্বিতীয় বিন্দু উকারমাত্রাই ক্রিয়াশক্তি—কল্পভেদে ক্রিয়াশক্তি কখনও ব্রহ্মাতে, কখনও বিষ্ণুতে বা রুদ্রে অধিকৃত হয়। তৃতীয় বিন্দু মকার-মাত্রারূপ জ্ঞানশক্তি, এবং কখনও তাহা ব্রহ্মাতে, কখনও বিষ্ণুতে, কখনও রুদ্রে বিদ্যমান থাকে। সেই জন্য যিনি বহুকল্পের বহুসৃষ্টির উৎপত্তি স্থিতি ও ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই দীর্ঘজীবী মহাতপা মহাযোগী ভুশুণ্ড বলিয়াছেন—

গরুড়বাহনং বিহগবাহনং বিহগবাহনং বৃষভবাহনং।
বৃষভবাহনং গরুড়বাহনং কলিতবানহং কলিতজীবিতঃ॥

'আমার সুদীর্ঘ জীবন বশতঃ আমি কতবার গরুড়বাহন বিষ্ণুকে হংসবাহন ব্রহ্মা হইতে দেখিলাম, হংসবাহন ব্রহ্মাকে বৃষবাহন রুদ্র হইতে দেখিলাম, বৃষবাহন রুদ্রকে কতবার গরুড়বাহন বিষ্ণু হইতে দেখিলাম।' এই সম্বন্ধে মন্ত্রযোগীর একটু ভাবিবার আছে। ত্রিবিন্দুর উৎপত্তি হইতেই এই ভেদ সংঘটিত হইয়া থাকে। পরবিন্দুর ভেদ জনিত আদি প্রণব হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুতভেদে ত্রিবিধ হইতে পারে, তাহা অথর্ব্বশিখা উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রণবের হ্রস্ব মাত্রাই ইচ্ছাশক্তি, দীর্ঘমাত্রা ক্রিয়াশক্তি, এবং প্লুতমাত্রা জ্ঞানশক্তি। যে কল্পের শব্দব্রহ্মরূপী আদিপ্রণবের প্রথম বিন্দু হ্রস্ব মাত্রা যুক্ত সেই কল্পে অকাররূপী ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা। যে কল্পে দ্বিতীয় বিন্দু হ্রস্বমাত্রাযুক্ত এবং প্রথম বিন্দু দীর্ঘমাত্রাতে নিঃসৃত হয়, সেই কল্পের ব্রহ্মাতে ক্রিয়াশক্তি এবং বিষ্ণুতে ইচ্ছাশক্তি নিহিত হয়, সুতরাং তখন বিষ্ণুর পালন কার্য্য ব্রহ্মা সমাধা করেন এবং বিষ্ণু ইচ্ছাশক্তিরূপে সৃজন করেন। তৃতীয় বিন্দু হ্রস্বমাত্রাযুক্ত হইলে রুদ্র ইচ্ছাশক্তিরূপে প্রজাপতির কার্য্য করেন, এবং ঐ বিন্দুতে দীর্ঘমাত্রা স্ফুরিত হইলে রুদ্রকে পালন কার্য্য করিতে হয়। এইরূপে প্রণবান্তর্গত বিন্দুত্রয়ের বা মাত্রাত্রয়ের স্বরভেদে ত্রিশক্তির বিভিন্ন সংস্থান সংঘটিত হয়, এবং তজ্জন্য দেবত্রয়ের ক্রিয়াভেদ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এখনও তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন ক্রিয়াতে একই মন্ত্রের বিভিন্ন স্বরসংযোগে উচ্চারণ করিতে হয়। শান্তি ও পৌষ্টিক ক্রিয়াতে মন্ত্র হ্রস্বমাত্রাতে প্রয়োগ করিতে হয়, সে স্থলে দীর্ঘমাত্রা প্রয়োগে ইষ্টফল ত হইবে না বরং অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা। শত্রুর দমন বা বিনাশ জন্য, দুষ্ট উপদ্রব

নিবারণের জন্য, অভিচারাদি ক্রূর কর্ম্মে, মন্ত্রের দীর্ঘ মাত্রাই প্রযোজ্য। আর দেবতার কৃপাকটাক্ষের ভিক্ষা যেখানে উদ্দেশ্য, ও জ্ঞান-পিপাসু মুমুক্ষুর জন্য মন্ত্রের প্লুতমাত্রাই প্রয়োগ হয়। কি বৈদিক মন্ত্র, কি তন্ত্রোক্ত মন্ত্র, কি চণ্ডীস্তবপাঠ, সর্ব্বত্র এই স্বরজ্ঞান আবশ্যক, এবং উদ্দেশ্য ক্রিয়াফল বিচার করিয়া মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হয়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে মন্ত্রের স্বরদোষ সম্বন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে—

দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥

যে শব্দের প্রয়োগে স্বরের অথবা বর্ণের দোষ থাকে, সে শব্দ মিথ্যা প্রযুক্ত হয়, তাহা কখনই প্রয়োগকর্ত্তার অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। সেই দোষযুক্ত শব্দ বাক্যরূপ বজ্র তুল্য, এবং তাহা যজমানকেই বিনষ্ট করে, যেমন স্বরদোষে 'ইন্দ্রশত্রু' এই শব্দ যজমানের অনিষ্ট করিয়াছিল। ইন্দ্রের বধ কামনাতে ইন্দ্রবধে সক্ষম এমন পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞে 'ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব' এই মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হয়। সমাসভেদে ইন্দ্রশত্রু শব্দের অর্থ 'ইন্দ্রের শত্রু' অথবা 'ইন্দ্ররূপ শত্রু' এই দুই প্রকার হইতে পারে। যজমানের উদ্দেশ্য যে 'ইন্দ্রের শত্রু' বৃদ্ধিলাভ করুক, কিন্তু হোতা যে স্বরে 'ইন্দ্রশত্রু' উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহাতে 'ইন্দ্ররূপী শত্রুর বৃদ্ধি হউক্' এই অর্থ সূচিত হয়, কারণ সমাসভেদে স্বরের পরিবর্ত্তন হয়; প্রথম অর্থে তৎপুরুষ সমাসজন্য শত্রু পদ প্রধান, এবং দ্বিতীয় অর্থে বহুব্রীহি সমাস জন্য ইন্দ্রপদ প্রধান। ঐরূপ স্বর-ব্যতিক্রম জন্য বৃত্রাসুর ইন্দ্রের নিহন্তা না হইয়া ইন্দ্রহস্তে নিহত হন।

শ্রীচণ্ডীরহস্যের মহালক্ষ্মী ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপা। আদিনাদ ও তাহা হইতে উৎপন্ন পরবিন্দু মহালক্ষ্মীর ব্যক্ত বা লক্ষ্য স্বরূপ। পরবিন্দু ভেদ হওয়াতে যে বিন্দুত্রয় হইয়াছিল তাহাই মহালক্ষ্মীর ত্রিমূর্ত্তি ধারণ। সেই ত্রিমূর্ত্তি যথাক্রমে ব্রহ্মবিন্দুরূপিণী মহালক্ষ্মী, বিষ্ণুবিন্দুরূপিণী মহাসরস্বতী, এবং রুদ্রবিন্দুরূপিণী মহাকালী। ত্রিবিন্দু হইতে উৎপন্ন ত্রিরেখা যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র। ব্রহ্মাদির ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি ত্রিশক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ ভিন্ন মত আছে। কোথাও মহালক্ষ্মী ইচ্ছাশক্তি, কোথাও তিনি পালনকর্ত্রী ক্রিয়াশক্তি, এবং অন্যত্র তিনি মোক্ষদায়িনী জ্ঞানশক্তি। মহাকালী ও মহাসরস্বতীও আগমভেদে বিভিন্ন শক্তিশালিনী। ফলতঃ এখানেও ত্রিবিন্দুর মাত্রাভেদ হইতে শক্তিগণের ক্রিয়াভেদ। ত্রিবিন্দু-রূপিণী ত্রিশক্তি আগমে শুদ্ধবিদ্যা নামে অভিহিতা। তাঁহারা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের শুদ্ধাবস্থা। মহালক্ষ্মী শুদ্ধরজোগুণময়ী, মহাসরস্বতী শুদ্ধসত্ত্বময়ী, এবং মহাকালী শুদ্ধতমোময়ী। ত্রিবৃৎকরণের দ্বারা শুদ্ধ গুণত্রয় মিশ্রগুণে পরিণত হইল, সেই মিশ্রগুণত্রয়ে অধিষ্ঠিত শক্তির নাম মিশ্রবিদ্যা। অবিদ্যার আবরণ মধ্যে শক্তি অশুদ্ধ বিদ্যাতে পরিণত হইয়া জগৎপ্রপঞ্চ রূপ ধারণ করেন।

ত্রিবিন্দু বা ত্রিশক্তিই মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারের প্রথম বিকাশ। যাহা ইচ্ছাশক্তি তাহাই ব্রহ্মবিন্দুরূপ আদিমন, যাহা ক্রিয়াশক্তি তাহাই বিষ্ণুবিন্দু বুদ্ধিতত্ত্ব, এবং যাহা জ্ঞানশক্তি তাহাই রুদ্রবিন্দু অহংকারতত্ত্ব। এই মন বুদ্ধি ও অহংকার এখানে কারণাবস্থায় অবস্থিত। পূর্ণানন্দগিরি ষট্চক্রবিবরণে ভ্রূমধ্যস্থিত দ্বিদলপদ্মের অন্তরালে মনের সূক্ষ্ম স্থিতি বলিয়াছেন, তাহার ঊর্দ্ধে অন্তরাত্মারূপী বুদ্ধিকে এবং

তদূর্দ্ধে মকাররূপী বিন্দুতে অহংকারকে রাখিয়াছেন। বিন্দু বীজ ও নাদ এই ত্রিতত্ত্বমধ্যে বিন্দুই অহংকার, বীজ বোধিনীশক্তি বুদ্ধিতত্ত্ব, এবং নাদ মনোরূপে অবস্থিত।

সৃষ্টি যে ক্রমে বিকাশ হইয়াছে, তত্ত্বগুলি সেই ক্রম অনুসারে মানবদেহে সংস্থিত, এবং সেই জন্য এই শরীরকে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ ঊর্দ্ধপ্রদেশে এক শূন্য প্রদেশ আছে, তাহাই মাতৃগর্ভস্থ জীবের প্রথম অবস্থা—সৃষ্টিরও প্রথম কল্পনা শূন্য। শূন্যস্থানে সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর নাদরূপে উদিত হয়, আর ব্রহ্মরন্ধ্রের শূন্যস্থানের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া স্নায়বীয় পদার্থ প্রথম উৎপন্ন হয়, এবং তাহা ক্রমশঃ নিম্নে প্রসারিত হইয়া পৃষ্ঠবংশের অভ্যন্তরস্থ মেরুদণ্ড রূপ ধারণ করে। সেই সঙ্গে ব্রহ্মরন্ধ্রের মহাশূন্য নিম্নাভিমুখে বিস্তৃত হইয়া মেরুদণ্ডের তলদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, ও মেরুমধ্যস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্ররূপে ঊর্দ্ধাধোভাবে লম্বমান রহিয়াছে। আগম বলিতেছেন, সমগ্র সৃষ্টিই শূন্যে অবস্থিত, সেই শূন্য দেহমধ্যেই রহিয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রমবিকাশগুলিকে আমাদের দেহমধ্যস্থ শূন্যে যে ক্রমে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা সৃষ্টি প্রসঙ্গে আলোচনার বিষয়। ঐ ক্রম জানা থাকিলে পরে সংহারক্রমে মন্ত্রযোগীর চক্রভেদ বর্ণনা অত্যন্ত সুগম হইবে। জীবদেহের মন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি অন্তঃকরণ নামধেয় সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ স্নায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধ প্রদেশে মস্তিষ্কমধ্যে অবস্থিত, এবং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট চৈতন্যমাত্রা ক্রমশঃ নিম্নপ্রদেশে সংস্থিত। সমস্ত শরীরের জীবনীশক্তি স্নায়ুমণ্ডলমধ্যে আবদ্ধ।

ত্রিশক্তি বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী হইতে ত্রিদেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র হইলেন, এবং ঐ ত্রিদেবতাকে যথাক্রমে চন্দ্র সূর্য্য ও বহ্নিতত্ত্ব বলা হইয়াছে। এই চন্দ্র সূর্য্য ও বহ্নি পরবিন্দুর অবস্থাভেদ মাত্র

সুতরাং এখানে তাহারা চিৎশক্তির ভাবত্রয়রূপে চিন্ময় বস্তু। অগ্নি যেমন সমস্ত দগ্ধ করেন, সেইরূপ জ্ঞানশক্তি বহ্নিতত্ত্বে জগদ্রূপ বিষয় বিলীন হয়। বহ্নিতত্ত্বই বিন্দুর স্বরূপ। বিন্দুর সান্নিধ্য বশতঃ বীজ হইতে নাদের উৎপত্তি হয়। মনের বিষয় ঐ বীজ। বীজরূপ বিষয় ছাড়িলে তখন মন নাদকে আশ্রয় করে, এবং নির্বীজ নাদমাত্র অনুভূত হয়। নির্বীজ নাদ মহানাদে মিশিয়া যায়, তখন মনের লয় হয়। এই লয় মনের দগ্ধাবস্থা। মহানাদে চিত্তলয় হইলেই মহাকালরূপী পরবিন্দুই একমাত্র অবশেষ থাকেন। কেবল বিন্দু বলিতে মকাররূপ রুদ্রবিন্দুকেই বুঝায়, কারণ এই বিন্দুই মহানাদে চিত্তলয় ঘটাইয়া মহাকালের সাক্ষাৎ করান। সুষুম্না মধ্যে প্রাণবায়ু বিলীন হইলে, তখন আর বাহ্য জগতের জ্ঞান থাকে না অথবা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া থাকে না, সেই জন্য সুষুম্নাকে বহ্নিতত্ত্ব ও শ্মশান বলা হয়। সুষুম্না মধ্যেই শিবতত্ত্বের সাক্ষাৎ হয় বলিয়া শিবকে শ্মশানবাসী বলা হয়, এবং সুষুম্নাতে প্রাণানিল লয় করাই প্রকৃত শ্মশান-সাধন। বিন্দুই নিরবচ্ছিন্ন, নির্ব্বিকল্প, হ্রাসবৃদ্ধিবর্জ্জিত অনন্ত আনন্দের ধাম, সেই জন্য বিন্দুই স্বর্লোক। তমোগুণ অচৈতন্য এবং নিশ্চল, আর জগতের সচল চৈতন্য বিন্দুতে গিয়া নিশ্চল চিৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চিৎ ও চৈতন্যের প্রভেদ এই যে চিৎ নির্গুণ নিরাকার নিস্পন্দ, আর চিদ্রূপ স্বচ্ছ আকাশে মায়াকল্পিত চৈতন্য গুণময় জ্যোতির্ম্ময় এবং ক্রিয়াশীল। সেই জন্য ঈশ্বররূপী বিন্দু তমোগুণ, এবং বিন্দুতে অধিষ্ঠিত রুদ্রের নাম স্থাণু ও প্রাজ্ঞ—যাঁহাতে বিষয়জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে তিরোহিত হইয়াছে তিনিই প্রাজ্ঞ। শুদ্ধ অহংকারে দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, সেখানে আকাশ পর্য্যন্ত থাকে না, সে অহংকার নিজের ভাবেই বিভোর, তাই বিন্দু বা রুদ্র তমোগুণশালী শুদ্ধ অহংকার।

এখন সূর্য্যতত্ত্ব কি? তাহা দেখা যাক্। জগতে সূর্য্যোদয়ে প্রাণীগণ স্ব স্ব ব্যাপারে ধাবিত হয়, আর বুদ্ধি সকলকে ক্রিয়ামার্গে প্রেরণ করে। মন একটা ইচ্ছা করিল, কিন্তু যতক্ষণ ইহা কর বলিয়া বুদ্ধি মনকে প্রেরণ না করে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গণ নিশ্চেষ্ট থাকে। ইন্দ্রিয়শক্তি বুদ্ধিদ্বারাই কার্য্যে চালিত হয়। তখন চিত্ত বহির্ম্মুখ হয়। চিত্তের বহির্ম্মুখতাকে আগম কোথাও শক্তি বলিতেছেন, কোথাও সূর্য্য বলিতেছেন। সেই সূর্য্যই ক্রিয়াশক্তি বিষ্ণু। আমাদের সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত চৈতন্য সেই বিষ্ণু—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।" ইচ্ছাশক্তি হইতে যে সকল তত্ত্ব নির্গত হইতে লাগিল, ক্রিয়াশক্তি তাহাদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন ও তাহাদের ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য ব্যাপারে নিযুক্ত করিলেন—ইহাই বিষ্ণুর পালনকার্য্য। শক্তিপ্রকাশ ভিন্ন জগতের পালন হইতে পারে না, তাই পালনশক্তি এখন ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষাও বীর্য্যশালী। যাহাতে সৃষ্টির অহিতজনক হেতু উৎপাদিত না হয়, এবং হইলেও তাহার আশু বিনাশের জন্য, পালনশক্তি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকেন। অতএব যিনি সূর্য্য তিনিই বিষ্ণু, ক্রিয়া ও পালনশক্তি, বুদ্ধিতত্ত্ব, জাগ্রৎ অবস্থা, প্রকাশ নিমিত্ত সত্ত্বগুণ, এবং শক্তির বহির্ম্মুখতা হেতু তিনি আমাদের মেরুমধ্যস্থ পিঙ্গলা নাড়ী। শারদাতিলকের মতে বামাশক্তি হইতে বিষ্ণুর উৎপত্তি, সেস্থলে বুঝিতে হইবে যে পালনশক্তি সৃষ্টির স্থিতিপক্ষে অনুকূল এবং ধ্বংসের প্রতিকূল, সেই প্রতিকূলতা হেতু এই শক্তিকে 'বামা' বলা যায়। আবার হংসচক্র মধ্যে 'সঃ' এই দ্বিবিন্দুর প্রথম বিন্দুই বিষ্ণুবিন্দু, এবং তাহা অপর বিন্দুর বামভাগে অবস্থিত বলিয়াও বিষ্ণুবিন্দুকে বামা বলা যায়। জ্ঞানার্ণব 'সঃ' কে হরিহর বলিতেছেন, হরি প্রকৃতিরূপে হরের বামভাগকে অধিকার করিতেছেন। জ্ঞানার্ণব

জ্যেষ্ঠা শক্তি হইতে বিষ্ণুর উদ্ভব বলিয়াছেন, সেখানে ঐ শক্তির বীর্য্যাধিক্য বশতঃ তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা বলা হইয়াছে, কারণ স্থিতি সম্পাদনের পক্ষে এই শক্তি প্রধান। ভূর্লোকেই সৃষ্টির স্থিতি, পালনশক্তি ভূর্লোকেই আবদ্ধ। সতর্ক না থাকিলে রক্ষা হয় না, তাই ঐ শক্তি জাগ্রৎ অবস্থা। রজোগুণ ক্রিয়ার ইচ্ছামাত্র উৎপাদন করে, তমোগুণ ক্রিয়াকে ধ্বংস করে, আর সত্ত্বগুণ ক্রিয়াকে রক্ষা করে, তাই এই ক্রিয়াপ্রধানা শক্তিতে সত্ত্বগুণ। উদ্যম ভিন্ন ক্রিয়া হইতে পারে না, চিত্তের বহির্ম্মুখতা ভিন্ন উদ্যম হয় না, আমাদের স্নায়ুমণ্ডলের পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ীতে সেই বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয়, সেই হেতু পিঙ্গলাকে ক্রিয়াশক্তি নির্দ্দেশ করা যায়। শারদাতিলক বলিয়াছেন বীজ হইতে জ্যেষ্ঠাশক্তি উদ্ভূত, ক্রিয়াশক্তি বীজকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়, বীজ হইতে যাহা উৎপন্ন তাহা ক্রিয়াশক্তিরই বিকাশ। ঐ বীজকে অকথাদি ত্রিরেখাতে বিন্যস্ত অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণাবলী রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ক্রিয়াশক্তি ঐ বর্ণাবলী রূপেই ব্যবস্থিত। পঞ্চাশৎ বর্ণকেই পঞ্চাশৎ 'কলা' বা প্রকৃতির অংশ বলা হয়। আদ্যাশক্তি পরবিন্দু রূপ ধারণ করিয়াই ফাটিয়া গেলেন, অমনি বর্ণরূপী পঞ্চাশৎ কলা নির্গত হইলেন, সুতরাং প্রত্যেক বর্ণ সেই আদ্যা শক্তির অংশ বা কলা। যদিও বিষ্ণুরেখাতে ককারাদি তকারান্ত ষোড়শ ব্যঞ্জন মাত্র আছে, তথাপি সমগ্র সৃষ্টির উপর ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য থাকাতে সমগ্র বর্ণপুঞ্জই তাঁহার আজ্ঞাধীন।

এখন চন্দ্র কি? যখন চিত্ত অন্তর্ম্মুখী থাকেন, বাহ্যদৃষ্টি না থাকাতে ক্রিয়াপ্রবৃত্তি বা উদ্যম থাকে না, যখন কেবল বিষয়ের অনুভূতি মাত্র আস্বাদন হয়, কিন্তু বিষয়গ্রহণ বা গ্রহণের প্রবৃত্তি থাকে না, অথচ বিষয়ের অনুভূতি নিমিত্ত আনন্দ হয়, যখন বুদ্ধিশক্তি নিশ্চল

ও নিষ্ক্রিয় হওয়াতে মন ও ইন্দ্রিয়গণ জড়বৎ নিস্পন্দ থাকে, সেই অন্তর্ম্মুখ চিত্তের নাম চন্দ্রতত্ত্ব, এবং তাহাই আগমে স্বপ্নাবস্থা নামে কথিত। যোগী এই অবস্থাতে নাদধ্বনির অনুভব করেন, সেই জন্য নাদকে চন্দ্র বলা হয়। চন্দ্রবিন্দুকেই ব্রহ্মবিন্দু বলা হইয়াছে, এবং তাহা হইতে নিঃসৃত বামারেখাই ব্রহ্মা। ব্রহ্মা স্বপ্নাবস্থাতে পূর্ব্বসৃষ্টির স্মৃতিরূপ অনুভূতির আস্বাদন করেন, ইহাই ইচ্ছাশক্তির রজোগুণের স্বভাব, অতএব সৃষ্টিক্রমে ব্রহ্মা চন্দ্রস্থানীয়। এই স্বপ্নাবস্থারূপ চন্দ্রই ভুবর্লোক—যেখানে ভাবী সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে বা হইবে। এই বহির্ম্মুখতার অভাবরূপ, সুতরাং ক্রিয়াপ্রবৃত্তি উদ্যমের অভাবরূপ, অথচ বিষয়ের রসানুভূতিরূপ—স্বপ্নাবস্থায় প্রাণশক্তি প্রধানতঃ ইড়ানাড়ীতে সঞ্চারিত হয়। 'ইল' ধাতুর অর্থ স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রা, ডকার ও লকারের একত্ব নিবন্ধন ইলা ও ইড়া একই শব্দ। ইন্দ্রিয়গণ ও মন এবং বুদ্ধি নিদ্রিত না হইলে আত্মচিন্তার উপযোগী একাগ্রতা হয় না, তাই এই অন্তর্ম্মুখী অবস্থা আত্মচিন্তা বা ইষ্টদেবতার চিন্তার অনুকূল, এবং ইহার নাম ইড়া। যোগশাস্ত্রেও ইড়াকে চন্দ্রনাড়ী এবং পিঙ্গলাকে সূর্য্যনাড়ী বলা হইয়াছে। ইচ্ছাশক্তি এই স্বপ্নাবস্থাতে পূর্ব্বকল্পে অনুভূত সৃষ্টির ছায়াদর্শন জন্য রসানুভব করেন, সেই জন্য স্বপ্নাবস্থারূপ চন্দ্রই মনঃস্বরূপ। এই অবস্থাতে মন সুষুম্নার পশ্চিমমুখে অর্থাৎ ঊর্দ্ধপ্রান্তে অবস্থান করেন বলিয়া ইহাই বামভাব, এবং সেই হেতু ব্রহ্মরেখার নাম বামারেখা।

এস্থানে প্রসঙ্গক্রমে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা মন্ত্রযোগীর নিকট অপ্রয়োজনীয় হইবে না। ইহাদিগকে সাধারণতঃ নাড়ী বলা হয়। নাড়ীর অর্থ নাল বা নালা—যাহার ভিতর রসাদি তরল পদার্থ সঞ্চরণ করে। আমাদের দেহমধ্যে যে সকল শিরাতে রস ও রক্ত

প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে রসবহ ও রক্তবহ নাড়ী বলা হয়। তাহা ছাড়া আর এক প্রকার নাড়ী আছে, তাহাদের নাম স্নায়ু; সূত্রাকার স্নায়ু সকল মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়া হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছে, আর কতকগুলি প্রধান স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও জিহ্বা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের কার্য্য করিতেছে। দেহের কোন প্রদেশের মূল স্নায়ু ছিন্ন বা শুষ্ক হইলে, সেই প্রদেশ সংজ্ঞাশূন্য ও অকর্ম্মণ্য হয়। ইড়া ও পিঙ্গলা ইহারা সংজ্ঞাবহ স্নায়বীয় পদার্থ। স্নায়ুমণ্ডলের সর্ব্বত্র, অর্থাৎ মস্তিষ্ক পদার্থে, পৃষ্ঠবংশের অভ্যন্তরস্থ মেরুদণ্ডে এবং স্নায়ু সকলে, এই ইড়া ও পিঙ্গলা বর্ত্তমান আছে। মস্তিষ্ক অথবা স্নায়ুগণ যে ক্রিয়া করে তাহা ইড়া ও পিঙ্গলার ক্রিয়া। চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যাহা প্রত্যক্ষ করে, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ যাহা সাধন করে, সমস্ত মানসিক ব্যাপার, হৃৎপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন, ভুক্ত অন্নপানীয়কে অন্ত্রমধ্যে পরিপাক করিয়া তাহাদের সারগ্রহণ ও যথাস্থানে প্রেরণ—এ সমস্তই স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা সাধিত হইতেছে, এবং ইড়া ও পিঙ্গলা স্ব স্ব গুণানুসারে ঐ সকল ক্রিয়াতে আপনার কর্ত্তব্যভাগ বহন করিতেছে। পুরাণে, যোগশাস্ত্রে, উপনিষদ্ মধ্যে, সর্ব্বত্রই ইড়াকে মেরুদণ্ডের বামভাগে এবং পিঙ্গলাকে দক্ষিণভাগে অবস্থিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রকার স্থাননির্দ্দেশ বশতঃ নাড়ীদ্বয়ের প্রকৃত স্বরূপ দুর্ব্বোধ হইয়াছে। ইহাদের ক্রিয়া বিচার দ্বারা স্বরূপ নির্ণয় করাই অভ্রান্ত পথ।

যোগীরা যোগানুষ্ঠান কালে শ্বাস প্রশ্বাসের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। প্রশ্বাস অর্থাৎ নির্গত বায়ুর যে পরিমাণে খর্ব্বতা হইবে, সেই পরিমাণে চিত্তও অন্তর্ম্মুখ হইবে। সাধারণতঃ নিঃসৃত বায়ু নাসারন্ধ্র হইতে দ্বাদশাঙ্গুল দূর পর্য্যন্ত গমন করে, ইহার নাম

প্রাণবায়ু। প্রাণায়াম দ্বারা এই প্রাণবায়ু দ্বাদশ অঙ্গুলি অপেক্ষা ক্রমশঃ ন্যূন হইতে থাকিবে, এবং যখন সমতাপ্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ নাসারন্ধ্রের বাহিরে নির্গত হইবে না, তখনই স্থিরবায়ু রূপ কেবল-কুম্ভক হইতে থাকিবে। যখন যোগীর প্রাণবায়ু খর্ব্ব হইতে থাকে তখন প্রায় বামনাসিকাতেই বায়ুর প্রবাহ হয়, দক্ষনাসার অবরোধ না থাকিলেও তাহাতে বায়ুপ্রবাহের বিশেষ উপলব্ধি হয় না। আবার মনের উদ্বেগ বা চঞ্চলতা থাকিলে তখন দক্ষনাসাতে বায়ুর প্রবল গতি হইতে থাকে। যোগীরা এই বামনাসিকাতে বায়ুপ্রবাহকে 'ইড়া' এবং দক্ষিণ নাসিকার প্রবাহকে 'পিঙ্গলা' বলিতেন। ইহা হইতেই কল্পিত হইল—"ইড়া নাম নাড়ী স্থিতা বামভাগে, তনোর্দ্দক্ষিণে পিঙ্গলা নাম নাড়ী। তয়োঃ পৃষ্ঠবংশং সমাশ্রিত্য মধ্যে, সুষুম্না স্থিতা ব্রহ্মরন্ধ্রস্ত যাঞ্চ॥"—অর্থাৎ শরীরের বামভাগে ইড়া নামে নাড়ী এবং দক্ষিণে পিঙ্গলা নামে নাড়ী অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে পৃষ্ঠবংশকে আশ্রয় করিয়া সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত যাহা ব্রহ্মরন্ধ্র নামে অভিহিত। পূর্ণানন্দের ষট্‌চক্রবিবরণেও সেই কথা—মেরুর বহির্দ্দেশে বাম ও দক্ষিণ ভাগে ইড়া ও পিঙ্গলা, এবং মেরুমধ্যে সুষুম্না অবস্থিত। এখন ইড়া ও পিঙ্গলার ক্রিয়া সম্বন্ধে পবনবিজয়স্বরোদয়ে এইরূপ বর্ণনা আছে—

বামা হ্যমৃতরূপা চ জগদাপ্যায়নে স্থিতা।
দক্ষিণা রৌদ্রভাগেন জগচ্ছোষয়তে সদা॥
দ্বয়োর্ব্বাহে তু মৃত্যুঃ স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যবিনাশিনী।
নির্গমে চ ভবেদ্বামা প্রবেশে দক্ষিণা স্মৃতা॥
কারয়েৎ ক্রূরকর্ম্মাণি প্রাণে পিঙ্গল সংস্থিতে।
ইড়াচারে তথা সৌম্যং চন্দ্রসূর্য্যগতস্তথা॥

যাত্রায়াং সর্ব্বকার্য্যেষু বিষাপহরণে ইড়া।
ভোজনে মৈথুনে যুদ্ধে পিঙ্গলা সিদ্ধিদায়িকা॥
শোভনেষু চ কার্য্যেষু যাত্রায়াং বিষকর্ম্মণি।
শান্তিমুক্ত্যর্থসিদ্ধৌ চ ইড়া যোজ্যা নরাধিপৈঃ॥
দ্বাভ্যাং চৈব প্রবাহে চ ক্রুরসৌম্যবিবর্জ্জনে।
বিষুবতীন্তু জানীয়াৎ সংস্মরেত্তু বিচক্ষণঃ॥
সৌম্যাদি শুভকার্য্যেষু লাভাদিজয়জীবিতে।
গমনাগমনে চৈব বামা সর্ব্বত্র পূজিতা॥
যুদ্ধাদি ভোজনে ঘাতে স্ত্রীণাঞ্চৈব তু সঙ্গমে।
প্রশস্তা দক্ষিণা নাড়ী প্রবেশে ক্ষুদ্র কর্ম্মণি॥

অর্থ। বামা অর্থাৎ ইড়া নাড়ী অমৃতরূপা, উহা প্রীণন তর্পণ ও পোষণাদি ক্রিয়াদ্বারা দেহরূপ জগতের তৃপ্তিসাধন করিতেছে। দক্ষিণা বা পিঙ্গলা নাড়ী উগ্রভাব বশতঃ রৌদ্রপ্রকৃতি, এবং ইহা দেহজগতের শোষণ করিতেছে। বাম ও দক্ষিণ উভয়ে সমভাবে বহিতে থাকিলে কার্য্যহানি ও মৃত্যুর আশঙ্কা, তখন শ্বাসত্যাগ কালে বামা এবং শ্বাসগ্রহণ কালে দক্ষিণা ক্রিয়াবতী হয়। [অজপা অর্থাৎ 'হংস' জপে—'হংকারেণ বহির্যাতি সঃকারেণ বিশেৎ পুনঃ'—শ্বাস ত্যাগে হং এবং শ্বাস প্রবেশে সঃ উচ্চারিত হয়। হং পুরুষ এবং দক্ষিণভাগ, সঃ প্রকৃতি এবং বামভাগ, সুতরাং হংস-জপে বামাদ্বারা শ্বাসের প্রবেশ ও দক্ষিণা-দ্বারা শ্বাসের নির্গম হইয়া থাকে। প্রাণীমাত্রেই অনিচ্ছাধীন এই হংসজপ দিবারাত্রি মধ্যে ২১,৬০০ সংখ্যাতে করিতেছে, কেবল যোগী ব্যক্তি হংসের এই গতি লক্ষ্য করিতেছেন। দক্ষিণ নাসাতে বায়ুর প্রবেশ এবং বামনাসাতে বায়ুর নির্গম হইলে ঐ হংসরূপ অজপার গতি বিপরীত হইয়া কার্য্যহানি সূচনা করে এবং ব্যাধি ও মৃত্যুও ঘটিতে

পারে।] প্রাণবায়ু পিঙ্গলামধ্যে প্রবাহিত হইলে ক্রূরকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, আর ইড়াতে প্রবাহিত হইলে অথবা সমভাবে উভয়নাড়ীগত হইলে সৌম্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। যাত্রাদি শুভকার্য্যে, বিষের প্রতীকার জন্য (সুতরাং সকল প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের প্রশমনার্থ) ইড়ানাড়ী প্রশস্ত, অর্থাৎ যখন বামনাসাতে বায়ু প্রবাহিত হয় তখন ঐ সকল কার্য্যে শুভফল হইয়া থাকে। ভোজন মৈথুন ও যুদ্ধকালে (সুতরাং যখন অন্যের পরাভব জন্য উদ্যম করিতে হয়) পিঙ্গলা সিদ্ধি প্রদান করেন—তৎকালে অগ্নির বৃদ্ধি হেতু ভুক্তপদার্থ শীঘ্র পরিপাক হয়, গর্ভাধানে দক্ষনাসাতে বীর্য্যনিষেকে পুত্রোৎপত্তি, এবং সংগ্রাম সময়ে উদ্যমের তীব্রবেগ না হইলে জয়লাভ হয় না। উচ্চাটন মারণ প্রভৃতি ক্রূরকর্ম্মে, ভোজন সংগ্রাম ও মৈথুন কালে, শ্বাসের পিঙ্গলামধ্যে গতি সিদ্ধিপ্রদ, গৃহপ্রবেশাদি ক্ষুদ্রকর্ম্মে, কাষ্ঠছেদন মৃত্তিকাখনন প্রভৃতি বলপ্রয়োগের কর্ম্মেও পিঙ্গলা প্রশস্ত। সমস্ত মাঙ্গলিক কর্ম্মে, যাত্রা-কালে, বিদেশগমনে এবং প্রত্যাগমনে, বিষাপহরণে, ঔষধিপ্রয়োগে, মৈত্রীকরণে, লাভজনক কার্য্যে, জয় কামনাতে, প্রাণরক্ষার্থ কর্ম্মে—বামনাড়ী ইড়া প্রশস্ত। উভয় নাসা সমভাবে প্রবাহিত হইলে তখন 'বিষুবতী' জানিবে, অর্থাৎ তৎকালে সূর্য্যনাড়ী পিঙ্গলা ও চন্দ্রনাড়ী ইড়ার সমতাবস্থা বুঝিতে হইবে, তখন ক্রূরকর্ম্ম ও সৌম্যকর্ম্ম উভয়ই বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মচিন্তা করিবে। [যে সময় দিবা ও রাত্রি সমান হয়, তাহাকেই বিষুবৎ বলে। চন্দ্রনাড়ী ইড়ার প্রবাহকালই রাত্রি, আর সূর্য্যনাড়ী পিঙ্গলার প্রবাহকালই দিবা। শ্বাস উভয় নাড়ীতে সমভাবে প্রবাহিত হইলে যোগীর দিবারাত্রি সমান হয় বলিয়া সেই কাল যোগীর বিষুবৎ।]

যোগীরা বাম ও দক্ষিণ নাসামধ্যে শ্বাসের প্রবাহকালে এই সকল

লক্ষণ দেখিয়া ইড়াকে দেহের বামভাগে এবং পিঙ্গলাকে দক্ষিণভাগে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইড়া ও পিঙ্গলার এই বিভিন্ন ক্রিয়া পূর্ব্বে বর্ণিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ক্রিয়ার সমভাবাপন্ন, সুতরাং তাহাদের ন্যায় ইহারাও সৃষ্টির মৌলিক তত্ত্ব, অথবা সেই চন্দ্র ও সূর্য্য প্রাণীশরীরে ইড়া ও পিঙ্গলারূপে অবস্থিত। জীবমাত্রেই যখন আদি শরীরী অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তির প্রতিরূপ, তখন হইতে পারে যে প্রতিদেহের দক্ষিণ ভাগ পুরুষ বা সূর্য্যতত্ত্ব এবং বামভাগ প্রকৃতি বা চন্দ্রতত্ত্ব। কিন্তু তাই বলিয়া যে শরীরের বাম ভাগেই ইড়া আছেন ও দক্ষিণ ভাগেই পিঙ্গলা আছেন, তাহা অনুমিত হয় না, অথবা ইহাও বলা যায় না যে ইড়ানাড়ী বাম-নাসারন্ধ্রে ও পিঙ্গলানাড়ী দক্ষিণনাসাতে সংযুক্ত। যেহেতু সমস্ত মানসিক ব্যাপারেই ইহাদের ক্রিয়া বিদ্যমান, তাহাতেই অনুমান হয় ইহারা মনঃশক্তির আধারভূত স্নায়ুমণ্ডলের উপাদান স্বরূপ—স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা যে সকল ক্রিয়া সাধিত হয় তাহা ইড়া ও পিঙ্গলার ক্রিয়া। শরীর-তত্ত্ব বিষয়ক বিজ্ঞানশাস্ত্রে দেখা যায় যে সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলে দুই প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। এক প্রকার শ্বেতবর্ণ ও আর এক প্রকার ধূসর বা পাণ্ডুবর্ণ। শ্বেতবর্ণ স্নায়বিক পদার্থের সাধারণ ক্রিয়া শক্তি-সঞ্চালন, অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির আজ্ঞাতে ইন্দ্রিয়গণকে কার্য্যে উদ্যত ও নিযুক্ত করা। অধিকন্তু এই শ্বেতপদার্থে আর এক প্রধান গুণ এই যে ইহা দ্বারা স্নায়ুর মূল বা কেন্দ্র স্থান হইতে বহির্দ্দিকে অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে চৈতন্য সঞ্চালিত হয়, সুতরাং এই শ্বেতপদার্থ যে পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যতত্ত্ব তাহার সন্দেহ নাই, এবং তাহার এই বহির্ম্মুখতা গুণ থাকাতেই তাহাকে পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ী বলা যাইতে পারে। ধূসর বা পাণ্ডুবর্ণ পদার্থের সাধারণ ক্রিয়া শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদির ও বেদনাদির অনুভব সম্পাদন, এবং উহা বাহ্যদেশ হইতে অন্তরাভিমুখে স্নায়ুকেন্দ্রে চৈতন্য সঞ্চালন

করে। এই পদার্থ মনকে বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপিত করে, সুতরাং সেই অন্তর্মুখতা হেতু এই ধূসর পদার্থ আমাদের শরীরস্থ চন্দ্রতত্ত্ব এবং ইড়া নামক নাড়ী। শারীর বিজ্ঞান স্নায়বীয় শ্বেতপদার্থের যে গুণ ও ক্রিয়া অবধারণ করিয়াছেন তাহা পিঙ্গলা নাড়ীর ক্রিয়ার সহ সম্পূর্ণ ঐক্য হয়, এবং ধূসর পদার্থের গুণ ও ক্রিয়া ইড়ানাড়ীর ক্রিয়াসহ সমান। যোগীরা নিজ শরীরে শ্বাস ও প্রশ্বাসের প্রবাহকালে মানসিক বৃত্তি ও দৈহিক ক্রিয়াপ্রবণতা বিচার দ্বারা ইড়া ও পিঙ্গলার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহিত যে ভাবে সমন্বয় হইতে পারে তাহাই যুক্তিসঙ্গত ও গ্রাহ্য। যে পর্য্যন্ত শাস্ত্র বাহ্যবস্তুর গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত, সে পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞানের যাহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত তাহার সহ শাস্ত্রবাক্যের একার্থ হওয়া চাই, যদি তাহা না হয় তবে সে স্থলে শাস্ত্রবাক্য অমূলক বলিয়া অপ্রমাণ ও উপেক্ষণীয় হইবে।

শারীর-বিজ্ঞান মেরুদণ্ডের মধ্যে একটী সূক্ষ্ম রন্ধ্র বা ছিদ্রের বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ ছিদ্রের চতুঃপার্শ্বে উপরোক্ত শ্বেত ও ধূসরবর্ণ স্নায়বীয় পদার্থ দেখা যায়। কিন্তু ছিদ্রের বামভাগে যে কেবল ধূসর পদার্থ আছে এবং দক্ষিণাংশে শ্বেত পদার্থ আছে তাহা নয়, তাহা হইলেও বা বামে ইড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলা বলা যাইতে পারিত। বরং ধূসর পদার্থই ছিদ্রের বেষ্টনরূপে প্রথম অবস্থিত, ও তাহার বাহিরে শ্বেত পদার্থের আবরণ। অর্থাৎ ছিদ্রটী ধূসর পদার্থের মধ্য দিয়া মেরুদণ্ডের মধ্য ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে মস্তিষ্ক মধ্যে শূন্যস্থানে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং ইড়া ও পিঙ্গলার বাম ও দক্ষিণ এই সংজ্ঞা তাহাদের অবস্থান ভেদে হইতে পারে না, উহাদের ক্রিয়াভেদে ঐরূপ সংজ্ঞা হওয়াই সম্ভব। যাহা ক্রিয়াসাধনের অনুকূল তাহাই দক্ষিণ, এবং যাহা তাহার

প্রতিকূল তাহাই বাম। চিত্তের বহির্ম্মুখ অবস্থা ক্রিয়ার অনুকূল বলিয়া দক্ষিণ, আর অন্তর্ম্মুখ অবস্থা ক্রিয়ার প্রতিকূল বলিয়া বাম। বামাচার ও দক্ষিণাচার প্রসঙ্গেও বাম ও দক্ষিণের এইরূপ অর্থই সুসঙ্গত।

মেরুমধ্যস্থ সূক্ষ্ম রন্ধ্র মস্তিষ্কাভ্যন্তরে মহাশূন্য স্থানে গিয়াছে, অথবা মস্তিষ্ককোটরের মহাশূন্য অধঃপ্রসারিত হইয়া মেরুমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে—তাহাই সুষুম্না নাড়ী। ষূ ধাতুর অর্থ 'প্রসবৈশ্বর্য্যয়োঃ'—প্রসবের অর্থ এখানে অভ্যনুজ্ঞান অর্থাৎ অনুমোদন আদেশ অনুমতি, আর ঐশ্বর্য্যের অর্থ দীপ্তিমৎ শ্রীমৎ মহিমা। 'ম্না' অর্থে অনুশীলন আলোচনা। সুতরাং এরূপ অর্থবোধ হইতে এই সুষুম্না সমগ্র ঐশ্বর্য্যের আধার এবং সমস্ত শক্তিপ্রয়োগের মূলযন্ত্র। সুষুম্না মধ্যেই প্রাণীর জীবনীশক্তি ও জীবদেহস্থ ঐশীশক্তি বিরাজিত। জীবদেহের মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত সকলই সুষুম্না মধ্যে। যেমন চক্ষু প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়, এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়, ইড়া ও পিঙ্গলা তদ্রূপ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় মাত্র। মনের ভাব ও ক্রিয়া ইড়া এবং পিঙ্গলা দ্বারা সঞ্চালিত হয়। সুষুম্নার মধ্যে সকল প্রকার জ্ঞানের স্তর বিভিন্ন চক্ররূপে সন্নিবিষ্ট, এবং তত্তৎ চক্রস্থিত শক্তির আদেশে ইড়া ও পিঙ্গলা স্ব স্ব ভাবে ভাবিত হয়। যেমন মন ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যকরণের শক্তি নাই, সেইরূপ সুষুম্না ব্যতিরেকেও ইড়া পিঙ্গলা নিষ্ক্রিয়। সুষুম্নার যে স্তরে যখন মন অবস্থিতি করেন, তখন মন তত্রস্থ শক্তির সহ একীভূত হইয়া ক্রিয়া নির্দ্দেশ করেন। অথবা মনঃশক্তিই সুষুম্নার বিভিন্ন চক্রে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্রিয়াদেশ করেন। সমাধি অবস্থাতে চৈতন্য সুষুম্না মধ্যেই বিরাজ করেন। যখন প্রাণবায়ুর সমতা দ্বারা চৈতন্য সুষুম্নান্তর্গত হয়, তখনই নাদোত্থানরূপ কুণ্ডলিনীর প্রবোধ কাল।

সুষুম্না প্রবেশ ভিন্ন খেচরীমুদ্রা, শাম্ভবীমুদ্রা, রাজযোগ বা সমাধি কিছুই হইতে পারে না। ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ সুষুম্না মধ্যেই হইতে পারে। সুষুম্নাই বহ্নিতত্ত্ব এবং মহাশ্মশান। শ্মশানেশ্বর শিব এই সুষুম্না মধ্যেই বিরাজ করেন। শ্রীনাথ হরিকে সুষুম্না পথেই খুঁজিতে হয়। এখানেই অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা ও দ্বারাবতী এই সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরী। বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবন কৈলাস এই সুষুম্নার অন্তর্গত জ্ঞানপ্রদেশ। এই বিরাট্ জগৎ সুষুম্নামধ্যেই দৃষ্ট হইতেছে—জগৎ আমাদের চিত্তপটেই অনুভূত হইতেছে, সে অনুভূতি সুষুম্না মধ্যেই হইতেছে। সুষুম্নাই মহামায়ার মহাযোনি। সুষুম্নাতে রতি হইলেই শিবত্বসিদ্ধি। যতক্ষণ চিত্তবৃত্তি সুষুম্নার বাহিরে ইড়া পিঙ্গলার দ্বারা চালিত হয় ততক্ষণ চিত্তের বৃত্তিনিরোধ রূপ যোগ লভ্য হয় না, ভগবৎ সাক্ষাৎকার ত দূরের কথা।

কাশীতে নদীয়ার সত্রের যে প্রাচীন শিবমন্দির এখনও বিদ্যমান আছে, তত্রস্থ শিবলিঙ্গের দক্ষিণভাগে অর্থাৎ লিঙ্গের সম্মুখার্দ্ধে শবোপরি শয়ান মহাকালমূর্ত্তির উপর বিপরীতরতাতুরা দক্ষিণাকালিকা মূর্ত্তি খোদিত আছে, বোধ হয় তাহারই অনুকরণে শবশিবা মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে। সেই মন্দিরে এক প্রাচীনা ভৈরবীমাতা বহু বৎসর সাধন করিয়াছিলেন। তিনি একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"ঈশ্বর জীবকে ধরাধামে পাঠাইবার সময় সকলকেই একটী চাবিবন্ধ বাক্স দিয়া পাঠাইয়াছেন, বাক্সের চাবিটীও তাহার গায়ে লাগান আছে, জীবের প্রয়োজনীয় যাহা কিছু হইতে পারে সমস্তই ঐ বাক্সের ভিতর সাজান আছে, কিন্তু কোন আঁটকুড়ির বেটা চাবিটী ঘুরাইয়া বাক্স খুলিয়া দেখিল না, কেবল নাই নাই বলিয়া অভাবমোচনের জন্য ছুটাছুটি করিতেছে।" ঐ বাক্সটী আমাদের মেরুমধ্যস্থ সুষুম্না, আর তাহার চাবিটী আমাদের

কুণ্ডলিনী শক্তি, মেরুতেই লাগান আছে। যেমন অন্ধকার গৃহে বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ্‌টী ঘুরাইলেই গৃহ আলোকময় হয়, সেইরূপ কুণ্ডলিনীকে ঘুরাইতে জানিলে অন্তরাকাশ পরিদৃশ্যমান হয়। ইলেকট্রীক্‌ আলোর সুইচ্‌ ঘুরান খুব সহজ হইলেও, যিনি জানেন না তাঁহার অসাধ্য—কুণ্ডলিনীকে ঘুরানও সেইরূপ, সহজ হইলেও উপদেশ সাপেক্ষ। মন্ত্রযোগ উপদেশই সেই উপদেশ।

প্রাণ ইড়া ও পিঙ্গলাতে সঞ্চরণ করেন, শ্বাস প্রশ্বাস তাহার বাহ্য-ক্রিয়া। যখন প্রাণ বিষয়ের রসাস্বাদন রূপ সংবেদন বা অনুভূতি রূপে উদিত হয়, তখন প্রাণ ইড়াগত, আর যখন কর্ত্তৃত্ব ব্যাপারে আসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়াভিমুখে প্রেরণ করে তখন পিঙ্গলাগত। মন সর্ব্বতোভাবে প্রাণবায়ুর দ্বারা চালিত হইতেছে, এবং সেই প্রাণ ইড়া ও পিঙ্গলার ক্রিয়া মাত্র। ইড়া ও পিঙ্গলার ক্রিয়া নিস্পন্দ হইলে মনও বিলীন হয়। নিদ্রার স্বপ্নাবস্থাতে প্রাণবায়ুর গতি বন্ধ হয় না, ইড়া পিঙ্গলাও নিষ্ক্রিয় হয় না, মনও তখন বিষয়াসক্ত থাকে। স্বপ্ন-শূন্য সুষুপ্তিকালেও প্রাণ নিস্পন্দ হয় না, মন তখন জাগ্রৎ অথবা স্বপ্নাবস্থার ন্যায় ক্রিয়াশীল না হইলেও নিদ্রাসুখ অনুভব করেন, এবং সেই সুখানুভূতি ইড়াতে হইতে থাকে। এই অবস্থাই প্রকৃত নিদ্রা, এবং সেই নিদ্রাই ইড়ার অর্থ। স্বপ্নশূন্য নিদ্রাতে বামনাসিকা প্রবাহিত হওয়া উচিত। যোগের একপ্রকার লয়াবস্থা এই প্রকার নিদ্রা, সেখানে নাদানুভূতি থাকে না, উহাকে সমাধি বলিয়া অপরের ভ্রম হইলেও যোগী নিদ্রাজ্ঞানে উপেক্ষা করেন। চিত্ত একাগ্র হইলেই প্রথমতঃ ঐ লয়-নিদ্রার আবির্ভাব হয়। ইড়া ও পিঙ্গলার ক্রিয়া তিরোহিত হইলে, প্রাণ সুষুম্নাগত হয়, তখন শ্বাস প্রশ্বাস সম্পূর্ণ স্থির হয়, এবং নাদের বিকাশ হইতে থাকে। 'যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং',—জীব ও আত্মার

একীভূত অবস্থার নাম যোগ। যতক্ষণ প্রাণবায়ু স্পন্দিত হয়, ততক্ষণ জীবাবস্থা। আত্মা নিস্পন্দ, সুতরাং সুষুম্নামধ্যে প্রাণ নিস্পন্দ না হইলে জীব ও আত্মা একরস হইতে পারেন না। জীব ও আত্মার সামরস্য অবস্থার নামই সমাধি, তখন আত্মারূপ আকাশে জীবরূপ বায়ু সম্যক্ বিলীন হইয়া নিস্পন্দ হইয়া যায়। এই সমাধিতে যতক্ষণ মূর্ত্তি জ্যোতি বা নাদ অনুভূত হয়, ততক্ষণ ইড়ানাড়ী সম্পূর্ণ বিলীন হয় নাই বুঝিতে হইবে, কারণ সমস্ত অনুভূতির একমাত্র দ্বারই ইড়া। সহস্রারের মহাশূন্য প্রদেশেই ইড়া সম্পূর্ণ বিলীন হয়, তখনই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

নিদ্রার স্বপ্নদর্শন কালে যখন কেবল বিষয়ের অনুভূতি মাত্র থাকে, সেই স্বপ্নে ইড়ার প্রাধান্য। যে স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা ক্রিয়া-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকেন—যেমন পথ পর্য্যটন, নদীতে সন্তরণ, মল্লযুদ্ধ, পূজাপাঠ ইত্যাদি—সেখানে পিঙ্গলার প্রাধান্য। মস্তিষ্কের সমস্ত অংশ এককালে নিদ্রিত হয় না—যে অংশের সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকে সেই অংশের ক্রিয়া হইতে থাকে। কেহ কেহ নিদ্রিতাবস্থাতে স্থানান্তরে গমন এবং জাগ্রতের ন্যায় অন্য ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহাদিগকে স্বপ্নাচারী বলা হয় (Somnambulist)। ঐ প্রকার স্বপ্নাচরণ পিঙ্গলার ক্রিয়াশীলতা জাগ্রত থাকা হেতু হইয়া থাকে। যোগীদিগের প্রথমাবস্থায় যে লয় অনুভূত হয়, তাহাও স্নায়ুমণ্ডলের সংজ্ঞাশূন্যতারূপ নিদ্রামাত্র। প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গের অভ্যাস দ্বারা প্রাণবায়ু ক্ষীণ হয়, এবং ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়াও স্তিমিত হইয়া ঐ লয় উপস্থিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ নাদধ্বনির উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ প্রকৃত লয়াবস্থা হয় নাই। একাগ্রচিত্তে একাসনে দীর্ঘকাল কোনও এক বীজমন্ত্রের আবৃত্তিরূপ জপেও প্রথমতঃ ঐ লয়নিদ্রা দেখা

দেয়। সুষুম্নামধ্যে প্রাণানিল বিলীন হওয়াতে যে লয় উপস্থিত হয়, তাহার একমাত্র পরিচয় নাদের অনুভূতি। যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ বিক্ষেপের পরিহারের ন্যায় জড়তারও পরিহার করিতে হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রথমাধিকারী মন্ত্রযোগীকে সহস্রসংখ্যক জপের পর পুনরায় প্রাণায়াম ও ন্যাসাদি করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। এইরূপে একাসনে দীর্ঘকাল জপের ক্ষমতা হইলে তখন পুরশ্চরণের উপযোগিতা আসিতে পারে।

বীজমন্ত্রের জপে যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত মাত্রা জানা আবশ্যক, সেইরূপ গায়ত্রী মন্ত্র জপেও ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ভাগ লক্ষ্য করিতে হয়। তন্ত্রোক্ত প্রত্যেক গায়ত্রী মধ্যে তিনটী ক্রিয়াপদ আছে—বিদ্মহে, ধীমহি, ও প্রচোদয়াৎ। 'বিদ্মহে' ক্রিয়ার অর্থ জানিতেছি, এই জানিতেছি ভাবটুকু বিচারশূন্য, কারণ এখানে ক্রিয়া অকর্ম্মক। যেখানে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার হইতে থাকে, সেখানে এই অকর্ম্মক 'জানিতেছি' হইতে পারে না। ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রথম পাদ 'পরমেশ্বরায় বিদ্মহে' এই বাক্যের অর্থ 'আমরা (অর্থাৎ আমার মন বুদ্ধি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়গণ সহ আমি) এখন অন্যচিন্তা পরিহার করিয়া পরমেশ্বরে অর্পিত হইয়াছি, এবং তন্ময় হইয়া তাঁহাকে জানিতেছি।' এরূপ ভাবের জানাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়, ইহা শুদ্ধ অনুভূতি মাত্র, সুতরাং মনোবৃত্তির বহির্ম্মুখতা না থাকাতে ইহাতে ইড়াভাব মাত্র অবলম্বন হয়। 'পরমেশ্বরায়' এই চতুর্থী বিভক্তি থাকাতে 'পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত' আমার জ্ঞাতৃশক্তি নিযুক্ত হইয়াছে ইহাই অনুভূতির বিষয়। তৎকালে সমস্তই যেন পরমেশ্বরময় হইয়া গিয়াছে, নিজের দেহ প্রাণ মন ও আমিত্বটুকুও ঐ অনুভূতিতে বিলীন

হইয়াছে। এই অবস্থায় শ্বাস অতিধীরে প্রবেশ করিবে, অর্থাৎ গায়ত্রীর প্রথম পাদ চিন্তাকালে বায়ুর পূরণ হইবে। ক্রমে এই পূরক কেবল সূক্ষ্ম আভ্যন্তরিক আকর্ষণ জ্ঞান মাত্রে পরিণত হইবে, তখন আর বাহ্যবায়ুর প্রবেশরূপ পূরক হয় না।

ব্রহ্মগায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ—'পরতত্ত্বায় ধীমহি।' এই দ্বিতীয় পাদ চিন্তাকালে গৃহীত বায়ুর নিরোধ বা কুম্ভক করিতে হয়। 'ধীমহি' ক্রিয়ার অর্থ ধ্যান করিতেছি। কোনও বস্তু বা বিষয় ধ্যান করিতে গেলে, চিত্তবৃত্তি তাহার অভিমুখে ধাবিত হয়, তাহাই পিঙ্গলার বহির্ম্মুখতা ক্রিয়া। যদিও এখানে ধ্যেয় বস্তু পরমেশ্বর বাহিরের লক্ষ্য হইতেছেন না, তথাপি চিত্তমধ্যে বুদ্ধি কর্ত্তৃক কোনও ভাবের অবধারণ করিতে গেলে বুদ্ধিকে তদভিমুখে প্রেরণ করিতে হয়, এবং তখন ঐ গ্রহণীয় বিষয় গ্রহীতা অহংতত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া তাহা গ্রহীতার পক্ষে বাহ্য বিষয়, অতএব এস্থলে ধ্যানার্থ বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণই ধীমহি শব্দের অর্থ, এবং সেই প্রেরণ পিঙ্গলার সূক্ষ্ম ক্রিয়া মাত্র ও উহা ইড়ার ক্রিয়া অনুভূতি হইতে বিভিন্ন। এই অবস্থায় পরতত্ত্ব কি তাহার বিচার আসিতেছে, তখন সমগ্র জগৎ এবং মন-বুদ্ধি অহংকার সমস্তই মিথ্যাজ্ঞানে ত্যাগ করিয়া কেবল যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্, যিনি একমাত্র পূর্ণ সত্য বস্তু সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান, সেই সচ্চিদানন্দময় সকল কারণের কারণ পরমাত্মাই যে পরতত্ত্ব তাহা লক্ষ্য করিতে হইতেছে। বায়ুরোধ ব্যতিরেকে ঐ বিচার বা ধারণা ঠিক হয় না, তাই এই পাদ চিন্তাকালে কুম্ভকের ব্যবস্থা। পরতত্ত্বের প্রকৃত ধ্যান যখন সিদ্ধ হইবে, তখন আর উহাকে পরতত্ত্ব বলিয়া বোধ বা লক্ষ্য করিতে হইবে না, অথবা ধীমহি বলিতেও হইবে না।

ব্রহ্মগায়ত্রীর তৃতীয় পাদ—'তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ'—সেই পরতত্ত্ব, মন এবং বাক্যের অগোচর সর্ব্বাধার-ব্রহ্ম আমাকে আমার মন প্রাণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে মোক্ষপথে লইয়া চলুন। আমার স্বধর্ম্ম প্রতিপালন, ধর্ম্মতঃ অর্থ সমাগম এবং ধর্ম্মতঃ কামনাপূরণ যাহাতে হয়, যাহাতে অজ্ঞানজনিত মোহ ও মায়াপাশের বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আমি সর্ব্ববিধ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাই, এবং আমার সচ্চিদানন্দময় আত্মস্বরূপ লাভ করিতে পারি, সেই পথে তিনি আমার মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে চালিত করুন। এইটুকু অজ্ঞ জীবের প্রার্থনা, ইহাই তাহার আত্মনিবেদন—আমার সমস্তই এখন তাঁহার উপর সমর্পণ করিতেছি, যাহাতে আমার মঙ্গল হইবে তিনিই তাহার বিধান করিবেন। এই আত্মোৎসর্গ কালে অনুভূতি বা বিষয় গ্রহণ কিছুই নাই, সুতরাং ইড়া ও পিঙ্গলার ক্রিয়ার এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এখানে ইড়াপিঙ্গলা রূপ জাগতিক জ্ঞানকে সুষুম্নার সম্বিৎময় বহ্নিতে আহুতি দেওয়া হইতেছে, সেই আহুতি প্রদান সময়ে শ্বাসের ত্যাগ হইবে।

এখানে ব্রহ্মগায়ত্রী সম্বন্ধে যেমন দেখান হইল, সেই ভাবে সমস্ত গায়ত্রীর প্রথমপাদে বায়ুর আকর্ষণ সহ ইড়াতে উপাস্য দেবতার অনুভূতি, দ্বিতীয় পাদে বায়ুর স্তম্ভন সহ পিঙ্গলাযোগে বুদ্ধিরূপ হৃদয় মধ্যে উপাস্যের স্বরূপ অবধারণ, এবং তৃতীয় পাদে বায়ুর রেচন সহকারে সুষুম্নাতে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। এই বিধি অনুসারে যে কোন গায়ত্রীমন্ত্রের দশবার জপ করিলে, আগমের কথিত গায়ত্রীর সর্ব্বপাপ প্রণাশন শক্তি অনুভূত হইতে থাকিবে। পূর্ব্বে সকল মন্ত্র বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ এখানেও গায়ত্রীর প্রথম পাদের হ্রস্বমাত্রায় চিন্তা বা উচ্চারণ, দ্বিতীয় পাদের দীর্ঘমাত্রায়,

এবং শেষ পাদের প্লুতমাত্রায় চিন্তা বা উচ্চারণ করা বিধি। কিছুদিন এই ভাবে গায়ত্রীর সাধন করিতে থাকিলে, শ্বাসের গতি ক্রমশঃ লঘু হইতে থাকিবে, তখন আর কষ্ট করিয়া শ্বাসরোধ করিতে হইবে না, বায়ু সহজেই স্থিরভাব ধারণ করিবে। নাক টিপিয়া বলপূর্ব্বক বায়ুরোধ করিলে গৃহকর্ম্মাসক্ত দুর্ব্বল কলির জীব রোগগ্রস্থ হইয়া পড়ে। অথচ প্রাণায়াম ব্যতীত জীব বিষয় চিন্তা হইতে বিরত হইতে পারে না, সুতরাং ব্রহ্মচিন্তার অধিকারী হয় না, সেই জন্য যোগশাস্ত্রে মন্ত্রশাস্ত্রে এবং উপনিষদ্ মধ্যে প্রাণায়ামের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবস্তুর ভাবনা করিতে গেলেই প্রাণবায়ু মন্দগতি হয়—মন্ত্রমার্গে সেই ভাবনা মন্ত্রের অর্থচিন্তা সহ মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার চিন্তা দ্বারা সাধিত হয়, এবং সেই সঙ্গে প্রাণানিলও স্থির হইয়া আসে।

মন্ত্রজপ সম্বন্ধে আগমের একটী উপদেশ—'ইড়ায়াঞ্চ গতে রাত্রৌ শক্তিমন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে'—এই বচনের প্রকৃত অর্থ 'ইড়াতে শ্বাস সঞ্চরণ সময়ই রাত্রিকাল, এবং সেই কালেই শক্তিমন্ত্র জপের পক্ষে প্রশস্ত।' সূর্য্যাস্তের পর যে রাত্রিকাল, তখনও যদি চিত্ত বহির্ম্মুখ থাকে অর্থাৎ বিষয়চিন্তাতে রত থাকে, তবে সে রাত্রিও জপের জন্য প্রশস্ত নয়। কিন্তু কি দিবাতে কি, রাত্রিকালে যখনই প্রাণবায়ু ইড়াশ্রিত হইবে, সুতরাং চিত্ত অন্তর্ম্মুখ হইবে, তখনই শক্তিমন্ত্র জপের উপযুক্ত সময়। গীতার কথিত সংযমী ব্যক্তির নিশা হইতে এই নিশা পৃথক্, বরং সেখানে যাহা সংযমীর দিবা তাহাকেই এখানে রাত্রি বলা হইয়াছে। চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত না হইলে ইষ্টচিন্তা হয় না। ইড়াগত প্রাণ-বায়ুর অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত হইয়া চিত্ত অন্তর্ম্মুখী হয়, তখন আর ইন্দ্রিয়গণ চিত্তকে বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে না বলিয়া আগমে প্রাণের ইড়াশ্রিত কালকে রাত্রি বলা হয়, এবং এখানেও সেই

অর্থে রাত্রিশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এস্থলে 'শক্তিমন্ত্র' অর্থে কেহ যেন কেবল দেবীমন্ত্র না বুঝেন। কুণ্ডলিনীর নামই শক্তি, সেই কুণ্ডলিনীশক্তির প্রবোধের বা পরিচয়ের নিমিত্ত যে সকল মন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্তই শক্তিমন্ত্র। দেবতাবিশেষের কৃপা বা অনুগ্রহ লাভের জন্য কিম্বা ঐহিক বিভূতি লাভের জন্য যে সকল মন্ত্র, তাহাদের সাধন প্রায় দিবাতে ও দক্ষিণাচারেই বিহিত হইয়াছে। কৃপা বা অনুগ্রহ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় যে উপাসনা, তাহাতে উপাস্য ও উপাসকের প্রভেদজ্ঞান থাকিবেই, সুতরাং চিত্তের বহির্ম্মুখতা হেতু তৎকালে পিঙ্গলা প্রবহমান থাকেন। আর জ্ঞান বা মুক্তিকামীর উপাসনাতে চিত্ত অন্তর্ম্মুখী হয়, সেখানে উপাস্য ও উপাসক একাত্মা বলিয়া ভেদ-বর্জ্জিত, ও সেই একাত্মভাব চিত্তের অন্তর্ম্মুখী অবস্থাতেই হইতে পারে, সুতরাং তৎকালে বামানাড়ী ইড়াতে প্রাণ আশ্রয় করে। দিবা ও রাত্রিপূজা বিষয়ে তন্ত্রে আর একটী বচন আছে, এবং সেখানেও এইরূপ অর্থ—

দিবা ন পূজয়েল্লিঙ্গং রাত্রৌ নৈব প্রপূজয়েৎ।
সর্ব্বদা পূজয়েল্লিঙ্গং দিবারাত্রিনিরোধতঃ॥

এখানেও প্রকৃত অর্থ—দিবাতে অর্থাৎ সূর্য্যনাড়ী পিঙ্গলাতে যখন প্রাণ অবস্থিত, সুতরাং যখন মন বাহ্যবিষয় গ্রহণে আসক্ত, সেই দিবাতে লিঙ্গপূজা (ইষ্টমূর্ত্তির পূজা) করিবে না; এবং রাত্রিতে, অর্থাৎ যখন মন নিদ্রাভাবকে অবলম্বন করে এবং প্রাণ ইড়াগত হয়, তখনও পূজা করিবে না, কিন্তু ইড়া ও পিঙ্গলার নিরোধ কালে, অর্থাৎ প্রাণকে সুষুম্নার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া ইষ্টচিন্তা করিবে। এখানে কেবল মানস পূজাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মের ধ্যেয় মূর্ত্তিকেই লিঙ্গ বলা হইয়াছে। 'লয়নাৎ সর্ব্বভূতানাং তস্মাল্লিঙ্গং প্রচক্ষ্যতে'—হরি-হর-

ব্রহ্মাদি হইতে বালুকার কণা পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই ‘ভূত’ শব্দবাচ্য, সাধক ভূতশুদ্ধিকালে সেই সমস্ত ভূতপদার্থকে ইষ্টদেবতার রশ্মি ভাবিয়া ইষ্টের ধ্যেয়মূর্ত্তিতে লয় করেন, সেইজন্য ব্রহ্মের ধ্যেয় মূর্ত্তিকে লিঙ্গ বলা হয়। এখন ঐ বচনের কোন সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আর এক প্রকার, তাহা বাহ্যপূজা বিষয়েই উপযোগী। যাঁহারা গ্রাম নগরাদির মধ্যে বাস করেন, দিবসে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং নানা কোলাহলের মধ্যে থাকাতে, নিস্তব্ধ রাত্রিকালেই তাঁহাদের ইষ্টচিন্তার প্রশস্ত সময়। সেই রাত্রির প্রথম অর্দ্ধ প্রহর ও শেষ অর্দ্ধ প্রহর কাল জীবজগৎ জাগ্রত থাকাতে তাহাকে দিবা বলা হয়, রাত্রির সেই দিবা অংশ ইষ্টপূজার সময় নয় কেননা তখন চিত্তস্থির হয় না। রাত্রির প্রথম অর্দ্ধপ্রহরের পর ছয়দণ্ড কাল, ও শেষ অর্দ্ধপ্রহরের পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়দণ্ডকাল, এই দ্বাদশ দণ্ড কালকে রাত্রি বলা হয়, তখনও পূজার ঠিক সময় নয়, প্রথম ভাগের ছয়দণ্ডে জগৎ সম্পূর্ণ প্রসুপ্ত হয় না এবং সাধকের মনোবৃত্তিও তখন সাংসারিক চিন্তাতে রত থাকে, আর শেষ ভাগের ছয়দণ্ডে জাগ্রত থাকা প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া তখনকার পূজা বিষময়। উভয়দিকের ঐ ছয়দণ্ড ত্যাগ করিয়া, মধ্যবর্ত্তী প্রায় দশদণ্ড কালকে আচার্য্যেরা ‘সর্ব্বদা’ বলিয়া গিয়াছেন এবং তাহাই ইষ্টপূজার প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং রাত্রির প্রথম দশদণ্ড ও শেষ দশদণ্ড ছাড়িয়া অবশিষ্ট মধ্যরাত্রি ‘সর্ব্বদা’ কাল হইতেছে। সর্ব্বদা কালের মধ্যবর্ত্তী দুই ঘটিকা কালকেই মহানিশা বলা হয়।

অকথাদি ত্রিরেখাই কুণ্ডলিনীর অবয়ব যন্ত্র, তাহাতেই ত্রিশক্তি ত্রিদেবতা ত্রিতত্ত্ব ও ত্রিনাড়ী অবস্থিত। একা শক্তি ত্রিশক্তিরূপে চিন্তনীয়, সেইজন্য শক্তিমন্ত্র দীক্ষার আগমোক্ত পূর্ণাভিষেক সংস্কার

কালে শিষ্যকে ক্রমদীক্ষা প্রদান করা হয়। ত্রিশক্তির পর পর মন্ত্রদীক্ষার নাম ক্রমদীক্ষা। প্রথমে আদ্যাশক্তি দীক্ষা, তাহার পরদিন বা পরবৎসরে বা বৎসরান্তরে দ্বিতীয়া শক্তির দীক্ষা, এবং ঐরূপ পরবর্ত্তী কালে তৃতীয়া শক্তির দীক্ষা। এইরূপ ক্রম অনুসারে পর পর দীক্ষার নাম ক্রমদীক্ষা। শিষ্যের ইষ্টদেবতাই তাঁহার আদ্যাশক্তি, যে শক্তির মন্ত্র প্রথম উপদিষ্ট হয়। ত্রিশক্তি যথাক্রমে 'আদৌ কালী ততস্তারা সুন্দরী তদনন্তরম্'—প্রথম দীক্ষা কালীমন্ত্রে হইলে, দ্বিতীয় দীক্ষা তারামন্ত্রে, তৃতীয়া দীক্ষা সুন্দরী মন্ত্রে হয়। অথবা 'সুন্দরী তারিণী কালী ক্রমদীক্ষা ত্রিগামিনী'—আদিতে সুন্দরী মন্ত্র, পরদীক্ষা তারিণীমন্ত্র, এবং শেষদীক্ষা কালীমন্ত্র। কিম্বা 'তারিণী সুন্দরী কালী ক্রমদীক্ষান্বিতাঃ প্রিয়ে'—প্রথমদীক্ষা তারিণীমন্ত্রে, তাহার পর সুন্দরীদীক্ষা, ও শেষে কালীদীক্ষাতেও ক্রমদীক্ষা সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মশক্তির মূর্ত্তিসকল কেহ মহালক্ষ্মীর, কেহ মহাসরস্বতীর, এবং কেহ মহাকালীর মূর্ত্তিভেদ। সেই মূর্ত্তিভেদ বিচার করিয়া ক্রমদীক্ষার আদ্যা দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া বিদ্যা নিরূপণ করা হয়। এই ত্রিশক্তি আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী শক্তি, এবং তাঁহারাই দেহ মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক নাড়ীত্রয়। বর্ণময়ী ব্রহ্মশক্তি অকথাদি ত্রিরেখারূপ ধারণ করাতে, সেই ত্রিকোণই ব্রহ্মযোনি। ত্রিশক্তির বোধ না হইলে ঐ ব্রহ্মযোনির পরিজ্ঞান হয় না, এবং ইড়াদি ত্রিনাড়ীর স্বরূপ অবগত না হইলে ত্রিভাবে অবস্থিত ত্রিশক্তির সাধনভেদ পরিচয় হয় না। সেই ভাবত্রয় জাগ্রত-স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপে, ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞান রূপে, ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ রূপে, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার রূপে, রজঃ-সত্ব-তমঃ রূপে, চন্দ্র-সূর্য্য-বহ্নিরূপে, গঙ্গা যমুনা-সরস্বতী রূপে, মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী-মহাকালী রূপে, আমাদের ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না হইতে অভিন্ন। সুষুম্নাতে মুক্তিদায়িনী আদ্যাশক্তি

মূলদেবতার অধিষ্ঠান, সুতরাং সমাধিযোগ ভিন্ন ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হন না। ইড়ার স্বপ্নাবস্থা রূপ অনুভূতিযোগে ইষ্টদেবতার দ্বিতীয়া অর্থাৎ বামা মূর্ত্তির চিন্তাদ্বারা সাধক আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহুজন্মার্জ্জিত পাপের ক্ষয় করেন, তাই ইড়া ভগবতী গঙ্গা। পিঙ্গলার ক্রিয়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া তৃতীয়া বা দক্ষিণা মূর্ত্তির সাধনে সাধক ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের অধিকারী হইয়া বাসনা ক্ষয় করিতে সক্ষম হন। ত্রিশক্তির সাধন ত্রিনাড়ীর ভাবত্রয় অবলম্বন ভিন্ন হয় না। ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মূর্ত্তিরও পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের কাম ক্রোধ, ভক্তি স্নেহ আলস্য উদ্যম, অনুরাগ দ্বেষ প্রভৃতি ভাবের বিকাশের সঙ্গে মূর্ত্তিরও ভাবানুরূপ পরিবর্ত্তন হয়। আদ্যাশক্তির ভাব—কৃপা অনুগ্রহ স্নেহ প্রেম জ্ঞান আনন্দ সর্ব্বাধারত্ব সর্ব্বাশ্রয়ত্ব সর্ব্বাতীতত্ব নির্গুণত্ব নির্লিপ্ততা প্রভৃতি, এবং এই সমস্তই সুষুম্নার প্রসব ও ঐশ্বর্য্য শক্তির অনুরূপ। যে কোনও দেবতামূর্ত্তি সাধকের প্রথম দীক্ষার দেবতা হইবেন, তাঁহাকেই এই সুষুম্নান্তর্গত শক্তিরূপে, সচ্চিদানন্দময় ভাবরূপে, চিন্তা করিতে হইবে। তিনিই গীতাতে কথিত ভগবান সর্ব্বাত্মা বাসুদেব। ইষ্টদেবতার বামাভাবের দ্বিতীয়া শক্তির মূর্ত্তি শিথিল ভাব ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাতে হিংসা দ্বেষ দম্ভ চপলতা নাই, তিনি জগৎকে আপনারই বিরাট্ মূর্ত্তি দেখিতেছেন; এই জগদাত্ম ভাবের চিন্তাই তারিণীর চিন্তা, সেই চিন্তা ইড়ার অনুভূতি যোগে হয়, এবং এই ভাবের চিন্তাতে সাধক পাপমুক্ত হন। ইষ্টদেবতার দক্ষিণা ভাবের সাধনই তৃতীয়া শক্তির সাধন—এখানে শক্তি ক্রিয়াসাধনের জন্য সদাই উন্মুখী, তাঁহার দেহ দীর্ঘ অঙ্গ বিশিষ্ট, শিথিলতা বর্জ্জিত, যেন উদ্যমের পরাকাষ্ঠা মূর্ত্তি, সমস্ত অঙ্গ যেন টানের ভরে রহিয়াছে; নয়ন বিস্ফারিত, যেন সকল বিষয়ে সকল দিকে তীব্র মনঃ সংযোগ ও

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন ; তিনি একদিকে ভক্তকে বর ও অভয় দিতেছেন, এবং অপরদিকে জগতের বৈরী নাশের জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। এই দক্ষিণাভাবই সাক্ষাৎ সূর্য্য স্বরূপ পিঙ্গলামূর্ত্তি, সেই হেতু পিঙ্গলাকে অর্কপুত্রিকা বা সূর্য্যকন্যা যমুনা বলা হয়; পুরাণ সেইজন্য ভূভারহরণে উদ্যত শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিকে যমুনাপুলিনে দাঁড় করাইয়াছেন। সর্ব্বত্র সকল মন্ত্র বিষয়ে আদ্যাশক্তি শ্রীসুন্দরীমূর্ত্তি। যেখানে শ্রীকালী প্রথম দীক্ষার দেবতা, সেখানে কালীমূর্ত্তিই সুন্দরী-মূর্ত্তি। এইরূপ প্রথম দীক্ষার তারিণীমূর্ত্তিই সুন্দরীমূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রীর পক্ষে তিনি গোপাল-সুন্দরী মূর্ত্তি। সকল মন্ত্রের দ্বিতীয়া দীক্ষার মূর্ত্তিই শ্রীতারিণী মূর্ত্তি, এবং তৃতীয়া দীক্ষার মূর্ত্তিই শ্রীদক্ষিণা কালীর মূর্ত্তি। অর্থাৎ দ্বিতীয়া শক্তি তারিণী ভিন্ন অন্য দেবতা হইলেও, তাঁহার উপাসনা তারিণী ভাবে হইবে ; এবং তৃতীয়া শক্তি কালী ভিন্ন অন্য হইলেও তাঁহার সাধন কালীবৎ দক্ষিণাভাবে হইবে। বস্তুতঃ একই শক্তির ত্রিভাবে চিন্তা ও সাধনার জন্য ক্রমদীক্ষার প্রয়োজন। প্রথম অধিকারীর হৃদয়ে সেই পৃথক তিন ভাবের উদ্দীপনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্র ও বিভিন্ন মূর্ত্তির উপদেশ দেওয়ার বিধি কল্পিত হইয়াছে। যিনি ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার রহস্য ধারণা করিয়াছেন, এবং ভাবত্রয়কে আপনাতে লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি প্রত্যেক মূর্ত্তিতে তিন ভাব ফুটাইতে পারেন, এবং প্রত্যেক বীজমন্ত্রেও ভাবত্রয় দেখিতে পান, কারণ বীজমাত্রেই ত্রিখণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং সেই তিন খণ্ডে ত্রিশক্তি বিরাজ করিতেছেন। আদ্যাশক্তি নাদাংশে প্লুত মাত্রাতে, বামাশক্তি প্রথম বর্ণে হ্রস্ব মাত্রাতে, এবং দক্ষিণাশক্তি দ্বিতীয় বর্ণে বা স্বরে দীর্ঘমাত্রাতে বিরাজিত।

প্রত্যেক বীজমন্ত্রে পশুভাব, বীরভাব, ও দিব্যভাব অবস্থিত। বীজের ত্রিখণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ডে পশুভাব, মধ্যখণ্ডে বীরভাব, ও

শেষ খণ্ডে দিব্যভাব অবস্থিত। পশুভাব প্রাকৃত অবস্থা, তাহা অশিক্ষিত বোধ মাত্র। বীরভাব ক্রিয়াফলাকাঙ্ক্ষী, ক্রিয়ার সিদ্ধিলাভের জন্য চিত্ত পিঙ্গলাযোগে বহির্ম্মুখী হয়, তখন মন্ত্রের মধ্যখণ্ড দীর্ঘমাত্রায় তীব্রজ্যোতিতে ভাসমান হয়। এখানে পদে পদে সাধ্যদেবতা, সাধক পুরুষ, ও সাধনসামগ্রীর গুণবিচার। দিব্যভাবে মন্ত্রের নাদাংশই ভাসমান হয়, তখন আর পূজাপাঠের ঘটা নাই, ক্রিয়াফল উদ্দেশ্য নাই, চিত্ত নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় ক্রমশঃ অস্তমিত হইতে থাকে। এই ভাব না আসিলে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ ঘটে না। রুদ্রযামলে শ্রীদেবী আনন্দভৈরবকে বলিয়াছেন—

দিব্যভাবং বিনা নাথ মৎপদাম্ভোজদর্শনম্।
যঃ কাঙ্ক্ষতি স মূঢ়াত্মা স কথং সাধকো ভবেৎ॥

"দিব্যভাব ব্যতীত যিনি আমার পাদপদ্ম দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই মূঢ় ব্যক্তি কিরূপে সাধক পদবাচ্য হইতে পারে?" ভাব না ফুটিলে সমস্তই বৃথা আড়ম্বর মাত্র, নিজে ঠকা আর পরকে ঠকান।

আমরা এপর্য্যন্ত দেখিলাম যে ইচ্ছাশক্তি নাদরূপ ধারণ করিয়া সেই নাদতরঙ্গকে নিজাভিমুখে আকর্ষণ করতঃ বিন্দুরূপ ধারণ করিলেন, তাহাকে পরবিন্দু বলা হইয়াছে। শক্তির সঙ্কল্পবশে পরবিন্দু ভেদ হইয়া শব্দব্রহ্ম নামক অব্যক্ত ধ্বনি হইল, এবং সেই ধ্বনি, বিন্দু ও বীজ সংজ্ঞক অকথাদি ত্রিরেখাতে পরিণত হইল, এবং এই পরবর্ত্তী (অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মের উৎপাদিত) বিন্দু কর্ত্তৃক বীজ ক্ষোভিত হইয়া অপর নাদ আবির্ভূত হইল। শব্দব্রহ্মের অখণ্ড ও অব্যক্ত নাদমধ্যে সত্ত্বাদি গুণত্রয় অভিন্নাবস্থায় ছিলেন, অকথাদি ত্রিরেখাতে আসিয়া গুণত্রয় পৃথক্ হইলেন, সেখানে ত্রিবিন্দু ত্রিশক্তি ত্রিদেবতা প্রভৃতি ত্রিতত্ত্ব পৃথক্ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। সুতরাং বর্ণপুঞ্জরূপ বীজ ক্ষোভিত

হইয়া যে নাদ উৎপন্ন হইল তাহাতেও ঐ সকল ত্রিতত্ত্ব উপাগত হইল।
এখন শারদাতিলক বলিতেছেন—

অথ বিন্দ্বাত্মনঃ শম্ভোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মনঃ।
অজায়ত জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী সদাশিবঃ ॥
সদাশিবাৎ ভবেদীশস্ততো রুদ্রসমুদ্ভবঃ।
ততো বিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা তেষামেবং সমুদ্ভবঃ ॥

"যিনি কালের বন্ধু, এবং কলা বা মায়া যাঁহার প্রকৃতি, সেই বিন্দুরূপী শম্ভু হইতে সর্ব্বব্যাপী জগৎসাক্ষী সদাশিব হইলেন, সদাশিব হইতে ঈশ্বর হইলেন, ঈশ্বর হইতে রুদ্র এবং রুদ্র হইতে বিষ্ণু হইলেন, বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।" তাহার পর বলিতেছেন—

মূলভূতাত্ততোঽব্যক্তাৎ বিকৃতাৎ পরবস্তুনঃ।
আসীৎ কিল মহত্তত্ত্বং গুণান্তঃকরণাত্মকম্ ॥
অভূত্তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সৃষ্টিভেদতঃ।
বৈকারিকাদহংকারাদ্দেবা বৈকারিকা দশ ॥
দিক্‌বাতার্কপ্রচেতোশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ।
তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যাসংস্তন্মাত্রাক্রমযোগতঃ ॥
ভূতাদিকাদহংকারাৎ পঞ্চভূতানি জজ্ঞিরে।

"যাহা সর্ব্বসৃষ্টির মূলস্বরূপ, সেই অব্যক্ত অথচ পরবস্তুর বিকৃত অবস্থা হইতে 'মহত্তত্ত্ব' উৎপন্ন হইলেন। যিনি পরবিন্দু তাঁহাকেই পরবস্তু বলা যাইতে পারে, এবং শব্দব্রহ্মই তাঁহার বিকৃত অবস্থা, কারণ পরবিন্দুর ভেদ হইতেই তাঁহার উৎপত্তি। শব্দব্রহ্ম অখণ্ড নাদমাত্র, সুতরাং অব্যক্ত, এবং তিনি পরবর্ত্তী সর্ব্বসৃষ্টির মূলভূত। শব্দব্রহ্ম হইতে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হইলেন, সেই মহত্তত্ত্ব মধ্যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্রারূপ গুণ, এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-চিত্ত এই

অন্তঃকরণ চতুষ্টয় অবস্থিত। মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ সৃষ্টি, এবং সেই সৃষ্টিভেদে ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। সাত্বিক সৃষ্টিতে যে অহঙ্কার তাহাকে বৈকারিক অহঙ্কার বলা হয়, এবং ঐ সৃষ্টিরও অপর নাম বৈকারিক সৃষ্টি। বৈকারিক অহঙ্কারের সৃষ্টি—দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতস্, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র এই দশদেবতা, ইহাঁরা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রাঘবভট্ট বলেন, 'মিত্রক' এই শব্দের 'ক' চন্দ্রকে বুঝাইতেছে, তিনি মনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। রাজস বা তৈজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় হইলেন। আর তামস্ বা ভৌতিক অহঙ্কার হইতে পূর্ব্বোক্ত শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রা সংযোগে আকাশাদি পঞ্চভূত হইলেন।" পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত আমাদের পরিদৃশ্যমান আকাশ-বায়ু-তেজ-জল-পৃথ্বী রূপ পঞ্চ স্থূলভূতে পরিণত হইলেন, তাহাদিগের দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম সমস্তই গঠিত হইল। আগমে দুই প্রকার পঞ্চীকরণ কথিত হইয়াছে। প্রথম প্রকারে প্রত্যেক ভূতকে আটভাগে বিভক্ত করা হইল। পরে আকাশের ৪ ভাগ সহ বায়ুর ১ ভাগ, তেজের ১ ভাগ, জলের ১ ভাগ, ও পৃথ্বীর ১ ভাগ মিলিত হইয়া আমাদের স্থূল আকাশ উৎপন্ন হইল। এইরূপে অন্য সূক্ষ্ম ভূতপদার্থের প্রত্যেকের ৪ ভাগ সহ অপর ভূতের এক এক ভাগ যোগে সেই সেই স্থূল মহাভূত উৎপন্ন হইল। অপর মতে প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভূত দশভাগে বিভক্ত হইয়া একভূতের ৬ অংশ সহ অন্যান্য ভূতের এক এক অংশ যোগে স্থূল মহাভূত উৎপন্ন হইল। আকাশের ৬ ভাগ সহ বায়ু-তেজ-জল-পৃথ্বীর প্রত্যেকের এক এক ভাগ মিলিত হইয়া স্থূল আকাশ হইল; আকাশচারী দেবতাগণের দেহ এই আকাশ দ্বারা গঠিত। তেজের ৬ অংশ সহ অন্য ভূতগুলির

এক এক অংশ মিশিয়া আমাদের বহ্নি ও সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ এবং তৈজস দেবতাগণ উৎপন্ন হইল। এইরূপ বায়ু জল ও পৃথ্বী সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। আমাদের পৃথ্বীতে যেরূপ, আমাদের শরীরেও সেইরূপ ভৌতিক পদার্থের সন্নিবেশ—পৃথ্বীর ৬ ভাগ ও অপর ভূত-গুলির এক এক ভাগ। যে সকল দেবতাগণ অসুর ও রাক্ষস কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছেন, তাঁহাদের দেহ এইরূপ পঞ্চীকৃত ভৌতিক পদার্থে গঠিত। সূক্ষ্মদেহধারী দেবতাগণ ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা আকাশ বায়ু ও তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আকাশের অর্দ্ধাংশ সহ বায়ুর চতুর্থাংশ এবং তেজের চতুর্থাংশ মিলিয়া আকাশদেবতাগণ, বায়ুর অর্দ্ধাংশ সহ আকাশ ও তেজের প্রত্যেকের চতুর্থাংশ মিলিয়া বায়ব্য-দেবতা, এবং তেজের অর্দ্ধাংশ সহ আকাশ ও বায়ুর চতুর্থাংশ যোগে বহ্নিদেবগণ। এই ত্রিবিধ দেবসৃষ্টিতে জল ও পৃথ্বীর অংশ নাই। বরুণলোকবাসী দেবতাগণের দেহ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চীকৃত স্থূলভূত দ্বারা গঠিত, কেবল তাহাতে জলের ৬ ভাগ ও অন্যভূতের এক এক ভাগ। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দিক্ প্রভৃতি যে একাদশ দেবতার পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে, তাহারা দেহধারী নহেন, কেবল তত্ত্বরূপে অবস্থিত। নাদের বিকৃত অবস্থা প্রথম অহঙ্কারে, পরে ভৌতিক গুণ পঞ্চতন্মাত্রাতে এবং সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থে পরিণত হয়। গুণসৃষ্টির সঙ্গেই গুণগ্রাহকশক্তি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে আবির্ভূত হয়, সেই শক্তির গুণগ্রহণ যোগ্যতাই ইন্দ্রিয়াকারে পরিণত হয়।

বিন্দুরূপী শম্ভু হইতে সদাশিব ঈশ্বর রুদ্র বিষ্ণু ও ব্রহ্মা পরপর উৎপন্ন হইলেন, আর মহত্তত্ত্বকে শব্দব্রহ্মের বিকৃতি বলা হইল, এটুকু একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে। নাদ ও বিন্দু উভয়ে বস্তুতঃ এক পদার্থ হইলেও উভয়ের বিশেষত্ব এই যে নাদ ব্যাপকরূপে

আকাশের ন্যায় আধার স্বরূপ, আর বিন্দু সেই আধারস্থ সাক্ষী চৈতন্য। নাদশক্তি সর্ব্বত্র চিদাকাশরূপে একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু, তিনি সর্ব্বাধারের ক্ষেত্রস্বরূপ, বিন্দু সেই চিদাকাশস্থ চিৎসূর্য্য এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বত্র নাদ প্রকৃতি এবং বিন্দু পুরুষ, নাদই শক্তি এবং বিন্দু শক্তিমান। আদি নাদ ও তাহার অবস্থান্তররূপ পরবিন্দুর এই বিশেষত্ব তাঁহাদের পরবর্ত্তী অবস্থাগুলিতে বিদ্যমান আছে। সকল দেহাকাশ নাদের বিকৃতি, এবং দেহীরূপ চৈতন্য বিন্দুর স্ফুলিঙ্গ। শব্দব্রহ্ম অখণ্ড অব্যক্ত নাদরূপে স্ফুরিত হইলেন, তখনই আকাশকল্পনা উপস্থিত হইল, কারণ শূন্য-কল্পনা ব্যতীত নাদ স্ফুরিত হয় না, তবে এখানে নাদ অব্যক্ত সুতরাং আকাশও অব্যক্ত। সেই অব্যক্ত আকাশ অকথাদি ত্রিকোণ ও তাহার ত্রিরেখাস্থিত বীজরূপী পঞ্চাশৎ শূন্যমণ্ডল রূপ ধারণ করিলেন, অর্থাৎ শব্দব্রহ্মের নাদভাগই পঞ্চাশৎ বীজরূপী (বর্ণময়ী) শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার বিন্দুভাগ সেই পঞ্চাশৎ শূন্যমণ্ডলে স্ফুরিত হওয়াতে সেই সকল শূন্য হইতে যে সকল নাদকলা উত্থিত হইল তাহারা মিলিত হইয়া ব্যক্ত নাদরূপে আবির্ভূত হইল, ইহাই বিন্দু দ্বারা ক্ষোভিত বীজ হইতে নাদের উৎপত্তি। যেমন কতকগুলি শূন্য কলস একত্র সারিবদ্ধ থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ শব্দ উৎপাদন করে, কিন্তু সকল কলস হইতে উত্থিত ধ্বনি মিলিত হইয়া একটী ধ্বনিরূপে শ্রুতিগোচর হয়, এখানেও সেইরূপ বর্ণপুঞ্জ হইতে উত্থিত নাদ-কলা সমূহের মিলিতাবস্থার নাম ব্যক্ত-নাদ।

এই বীজোত্থ ব্যক্তনাদই বিরাট্‌রূপে অবস্থিত, এবং তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত সমষ্টি, কারণ ঐ নাদমধ্যে সমস্ত তত্ত্বই উপাগত হইয়াছে। তিনিই বিরাট্ প্রকৃতি। শব্দব্রহ্মোত্থ যে বিন্দু অকথাদি ত্রিরেখাতে ত্রিবিন্দুরূপে স্ফুরিত হইয়া এই ব্যক্তনাদের সৃজন করিলেন,

তিনিই এই বিরাট্ প্রকৃতিতে উপহিত বিরাট্ চৈতন্য। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের কর্ত্তা অথচ তাহাদের অতীত, সেই জন্য তাঁহাকে কালবন্ধু বলা হইয়াছে। বিশ্বসৃজনকর্ত্রী শব্দব্রহ্ম তাঁহার দেহ বা প্রকৃতি বলিয়া তাঁহাকে কলাত্মা বলা হইয়াছে। এই বিন্দুরূপী বিরাট্ চৈতন্য হইতে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী সদাশিব হইলেন। ব্যক্তনাদের ব্যাপ্তির সঙ্গেই আকাশ উপস্থিত হয়, তাহা অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূতরূপে অবস্থিত, এবং সেই আকাশে উপহিত চৈতন্যই ঐ সদাশিব।

অকথাদি ত্রিরেখারূপে নিষ্পন্ন বীজাবলী, ও তাহাতে স্ফুরিত বিন্দু, শব্দ ব্রহ্মের প্রকৃতি, এবং ব্যক্তনাদ শব্দ ব্রহ্মের বিকৃতি, অর্থাৎ অব্যক্ত বস্তু ব্যক্তভাবে পরিণত হইলেই তাহার প্রকৃতি বিকৃত হয়। এই বিকৃতি মহত্তত্ত্বের জননী। সমগ্র ব্যক্ত সৃষ্টি সমষ্টিরূপে ঐ মহত্তত্ত্ব বা মহান্ পদার্থ। অকথাদি ত্রিরেখামধ্যে যে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার সূক্ষ্মভাবে ছিলেন, এবং যাহা ব্যক্তনাদমধ্যে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই গুণত্রয়রূপে সমাগত হইলেন, সেই গুণত্রয় হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব রূপে প্রাদুর্ভূত হইল। সৃষ্টিমধ্যে সর্ব্বত্র ঐ ত্রিবিধ অহঙ্কার বিদ্যমান আছে। স্থূল জগতে যিনি ব্রহ্মারূপে প্রকটিত হন তিনি রাজস বা তৈজস অহঙ্কার, বিষ্ণু সাত্ত্বিক বা বৈকারিক অহঙ্কার, এবং রুদ্র তামস বা ভৌতিক অহঙ্কার, সেই জন্য রুদ্রকে ভূতনাথ বলা হয় এবং তাঁহার সর্ব্ব-ভব-রুদ্র-উগ্র-ভীম-পশুপতি-মহাদেব-ঈশান এই অষ্টমূর্ত্তি যথাক্রমে গীতাতে কথিত ভূমি-জল-অনল-বায়ু-আকাশ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার এই অষ্ট অপরা প্রকৃতি। মহত্তত্ত্বই বিরাট্ জগতের সমষ্টি দেহ; যাঁহাকে আমরা ব্যক্তনাদ বলিতেছি তাঁহাতে নাদাত্মক প্রকৃতি এবং বিন্দ্বাত্মক পুরুষ উভয়ই অবস্থিত ছিলেন, এখন সেই পুরুষভাগ সদাশিব প্রভৃতি রূপে এবং প্রকৃতিভাগ মহত্তত্ত্ব ও

তদুৎপন্ন সৃষ্টিরূপে পৃথক্ সত্ত্বা লাভ করিলেন, কিন্তু পৃথক্ হইয়াও তাঁহারা একত্র অবস্থিত, যেমন আমাদের মনবুদ্ধি ও অহঙ্কার সমন্বিত স্থূলদেহ ও সেই দেহমধ্যে অবস্থিত পুরুষ।

ব্যক্ত নাদের ব্যাপ্তিহেতু আকাশতত্ত্বের উৎপত্তি, সেইজন্য আকাশ শব্দগুণময়; অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশমধ্যে ঐ শব্দগুণ শব্দতন্মাত্রা নামে অভিহিত। এই আকাশ ও তত্রস্থ সদাশিব আমাদের কণ্ঠপ্রদেশস্থ মেরুমধ্যে বিশুদ্ধাখ্য চক্রে চিন্তনীয়। ঐ প্রদেশে আমাদের শ্বাসযন্ত্র মধ্যে বর্ণগত শব্দ স্পন্দিত হইয়া পরে বাক্যরূপে ধ্বনিত হয়, এবং এখানেই বাগিন্দ্রিয়ের উৎপত্তি স্থান।

নাদের সঞ্চরণ ক্রিয়া হইতে বায়ুতত্ত্বের উৎপত্তি। বায়ু গতিশীল ও স্পর্শগুণ বিশিষ্ট, একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। বস্তুগ্রহণ নিমিত্ত হস্তরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়, বায়ুতত্ত্বের বিকৃতিরূপে আগত হইয়াছে। বায়ুতত্ত্বে যে চৈতন্য উপাগত হইলেন, তিনি পূর্ব্বতত্ত্বের সদাশিবের অংশ, এবং তিনি ঈশ্বরে নামে অভিহিত। ঈশ্বর ভূতজগতের প্রেরণকর্ত্তা, তিনি জগৎকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় ভ্রামিত করিতেছেন, সমস্ত সৃষ্টপদার্থের অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঐ ভ্রামণ ক্রিয়ার ফল, জগতে এমন কিছুই নাই যাহা নিরন্তর ঘূর্ণায়মান হইতেছে না, বায়ুতত্ত্বে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরচৈতন্য ঐ প্রেরণ ভ্রামণ ও সঞ্চালন ক্রিয়ার কর্ত্তা। আমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া ঐ বায়ুতত্ত্বের অধীন, এবং হৃৎপ্রদেশের সন্নিহিত মেরুমধ্যস্থ স্নায়ুমণ্ডলে অনাহত নামক চক্রে স্পর্শতন্মাত্রা সহিত বায়ুতত্ত্ব ও তত্রস্থ সূর্য্যরূপী ঈশ্বরচৈতন্য চিন্তিত হন।

বায়ুর গতিশীলতা হইতে তেজের উৎপত্তি। গতি (motion) উত্তাপে পরিণত হয় এবং উত্তাপ গতিশক্তিতে পরিণত হয়। উত্তাপের ঘনীভূত অবস্থাই বহ্নিরূপী তেজস্তত্ত্ব। তেজ দ্বারা রূপ প্রকটিত হয়,

তেজস্তত্ত্বে রূপতন্মাত্রা অধিষ্ঠিত। রূপের সঙ্গে তাহার গ্রহণে সমর্থ দর্শনেন্দ্রিয় উপস্থিত হয়। তেজস্তত্ত্বে ঈশ্বরের অংশভূত চৈতন্য রুদ্রনামে অভিহিত। আমাদের জঠরানল তেজস্তত্ত্বের বিকার, এবং নাভির নিকটস্থ মেরুমধ্যে মণিপুর নামক চক্রে এই সকল তত্ত্ব চিন্তা করা হয়।

তেজ মন্দীভূত হইলে শৈত্যগুণের আবির্ভাব হয়, শৈত্য রসরূপে (moisture) পরিণত হয়, সেই রসই অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম জলতত্ত্ব। রুদ্রের অংশভূত চৈতন্য রসতত্ত্বে আসিয়া জলশায়ী বিষ্ণুরূপে চিন্তিত হন। আমাদের মূত্রযন্ত্রের সমীপবর্ত্তী মেরুমধ্যস্থ স্বাধিষ্ঠান নামক চক্রে রসতন্মাত্রা সহিত জলতত্ত্ব, এবং তথায় বরুণবীজাধিরূঢ় বিষ্ণুকে চিন্তা করা হয়। এখানেই রসনা ও উপস্থ এই ইন্দ্রিয়দ্বয় বীজভাবে অবস্থিত। রসভিন্ন জীবজগৎ ও তাহাদের উপাদেয় তৃণবৃক্ষাদি থাকে না, রস লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, রস কামনারূপে জীবমাত্রে বিদ্যমান, রসের রূপান্তর বা ভাবান্তর 'কাম' জীবকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, জীবজগতের প্রেরণকর্ত্তা রসময় বিষ্ণুই সেই কাম।

রস কর্ত্তৃক বস্তুজাত ক্লিন্ন হয়। রসের পরিণাম ক্লেদ, রস ঘনীভূত হইয়া ক্লেদ অবস্থাতে উপনীত হয়, ক্লেদ হইতে গন্ধের উৎপত্তি ও তৎসঙ্গে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উপস্থিত হয়। গন্ধতন্মাত্রাযুক্ত ক্লেদ কঠিনীভূত পৃথ্বীতত্ত্বে পরিণত হয়, যে মেদ হইতে মেদিনীর উৎপত্তি সেই মেদ ক্লেদ ভিন্ন আর কিছু নয়। পৃথ্বীতত্ত্ব ভূতজগতের অস্থিস্বরূপ। স্থূল জগতের প্রধান উপাদান এই পৃথ্বী আমাদের পায়ুপ্রদেশের সমীপবর্ত্তী মেরুমধ্যস্থ মূলাধার চক্রে গন্ধতন্মাত্রাযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন, এখানেই স্থূলাভিমানী ব্রহ্মা অবস্থিত এবং তিনি বিষ্ণুর অংশাবতার। স্থূলজগৎ বৃহৎ রূপে লক্ষিত হয়, সেই বৃহত্ত্বা হেতু এখানে অধিষ্ঠিত চৈতন্যের নাম ব্রহ্মা।

পূর্ব্বে যে শব্দব্রহ্ম নামক অব্যক্ত বস্তু অকথাদি ত্রিরেখাকারে ব্যক্ত হইয়াছিলেন, তিনি সৃষ্টিক্রমে এই সকল ক্রমপ্রাপ্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। শব্দব্রহ্ম হংসঃ ও সোহং ভাবে প্রণবরূপে স্ফুরিত হন। অ-উ-ম্-বিন্দু ও নাদ ইহারা প্রণবের পঞ্চ অবয়ব। যাহা নাদ তাহাই আকাশ-পুরুষ সদাশিব, নাদোত্থ বিন্দুই ঈশ্বররূপে বায়ুতত্ত্বে অধিষ্ঠিত, মকার বহ্নিতত্ত্বরূপী রুদ্র, উকার রসতত্ত্বশায়ী বিষ্ণু বরুণবীজ বকারে অধিরূঢ় (উকার হইতেই বকারের আগম হয়), অকারমাত্রা আধার রূপে পৃথ্বীতত্ত্বে ব্রহ্মাতে প্রতিষ্ঠিত। এই সদাশিব প্রভৃতি ওঙ্কারের পঞ্চাবয়ব। ইহারা নাদবিন্দু ঘটিত অন্য একাক্ষরী বীজমন্ত্রেরও পঞ্চাবয়ব, সেখানে ব্যঞ্জনবর্ণ স্থূলভুক্ ব্রহ্মা, স্বরমাত্রা বিষ্ণু, মকার রুদ্র, বিন্দু ঈশ্বর, এবং নাদ সদাশিব। বিন্দু হইতে সমাগত এই সদাশিব প্রভৃতি অবিকৃত সাক্ষী চৈতন্য, আর মহত্তত্ত্বের অংশভূত আকাশাদি তত্ত্ব ও তাহাদের গুণ বিকৃত পদার্থ। নাদরূপিণী শক্তি আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতপদার্থে কলারূপে অবস্থিত। পৃথ্বীতত্ত্বে নিবৃত্তিকলা, রসতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা, বহ্নিতে বিদ্যা, বায়ুতে শান্তি, এবং আকাশে শান্ত্যতীতা কলা। কলারূপিণী শক্তি সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া আছেন; তিনি যেমন গ্রহগণকে তাহাদের নিয়মিত মার্গে চালিত করিতেছেন, তেমনি আমাদের দেহস্থিত রস-রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-অস্থি-শুক্র সপ্তধাতুকে ধারণ করিতেছেন। তিনি জড়বিজ্ঞানের আকর্ষণ-শক্তি (Gravitation)।

প্রণবের পঞ্চাবয়বই পঞ্চাননের পঞ্চ মুখ। লিঙ্গপুরাণ বলিতেছেন "পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মা পঞ্চব্রহ্মাত্মকঃ শিবঃ", ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যাঁহার দেহ তিনি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাত্মা, তিনি নিজে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতীত ষড়বিংশ তত্ত্ব। ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, ও সদ্যোজাত এই পঞ্চ শিববদন বা শিবমূর্ত্তি যথাক্রমে সদাশিব ঈশ্বর রুদ্র

বিষ্ণু ও ব্রহ্মা রূপে ওঙ্কারের পঞ্চ অবয়ব, সেই জন্য শিবকে পঞ্চব্রহ্মাত্মক বলা হয়। পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন, অহংকার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, ও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, ইহারা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। ইহারাই ব্যক্তনাদের বিরাট্ মূর্ত্তি। নাদরূপী ঈশান মূর্ত্তি সদাশিবে—(১) প্রকৃতিবর্গের ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞ (২) শ্রোত্র, (৩) বাক্ (৪) শব্দতন্মাত্রা (৫) আকাশ এই পঞ্চতত্ত্ব; বিন্দুরূপী তৎপুরুষমূর্ত্তি ঈশ্বরে (১) প্রকৃতি (২) ত্বক্ (৩) পাণি (৪) স্পর্শতন্মাত্রা (৫) বায়ু; মকাররূপী অঘোরমূর্ত্তি রুদ্রে (১) বুদ্ধি (২) চক্ষু (৩) পাদ (৪) রূপতন্মাত্রা (৫) অগ্নি; উকাররূপী বামদেবমূর্ত্তি বিষ্ণুতে (১) অহংকার (২) জিহ্বা (৩) উপস্থ (৪) রসতন্মাত্রা (৫) জল; অকাররূপী সদ্যোজাত মূর্ত্তি ব্রহ্মাতে (১) মন (২) ঘ্রাণ (৩) পায়ু (৪) গন্ধতন্মাত্রা (৫) বিশ্বম্ভরা ধরা—এই সকল তত্ত্ব যথাক্রমে অবস্থিত। শব্দব্রহ্ম বিকৃত হইয়া এই সকল তত্ত্বে পরিণত হইলেন, এবং তাহারা ঐ ক্রমে বিশুদ্ধি অনাহত মণিপুর স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধার চক্রে বিন্যস্ত হইলেন।

এই মূলাধার প্রভৃতি চক্র কি কেবল আমাদের মেরুমধ্যস্থ কেন্দ্র বিশেষ? কেবল তাহা নয়। সমগ্র সৃষ্টি সূক্ষ্ম অবস্থাতে পঞ্চস্তরে অবস্থিত, এবং এই সকল চক্র সূক্ষ্ম সৃষ্টিক্রমের পঞ্চ ভূমি বা স্তর। আমাদের পরিদৃশ্যমান এই স্থূল জগৎ মধ্যেও ঐ পঞ্চস্তর রহিয়াছে। স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম অন্তর্জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র, ইহা স্থূলদ্রষ্টা ব্রহ্মার সংকল্প বশতঃ স্থূলরূপে ভাসমান হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক ইহার স্থূল অস্তিত্ব নাই—স্বচ্ছ চিদাকাশে এই সকল স্থূল পদার্থ থাকিতে পারে না। এই স্থূলকে সূক্ষ্মাকারে জানিবার জন্যই সকল যোগের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন। সহস্রদলে ও আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধভাগে অব্যক্ত সৃষ্টিভূমি। অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম মিলিয়া সৃষ্টি সপ্তস্তরে অবস্থিত।

প্রথম স্তরে মহাশূন্যে নির্গুণ শিবপদবীতে ইচ্ছারূপিণী শক্তির উদয়, তাঁহার নাদ ও বিন্দু রূপধারণ, এবং বিন্দুভেদ হইয়া শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি। যোগীদেহে ইহা মস্তিষ্ক কোটরের সহস্রদল নামক মহাশূন্য। দ্বিতীয়স্তরে বিন্দুরূপী পুরুষের আজ্ঞাতে বীজাকারে পঞ্চাশৎ শূন্যমণ্ডলের উৎপত্তি, সেই সকল শূন্য হইতে ব্যক্তনাদের আবির্ভাব, এবং তাহা হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার বিশিষ্ট মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি। এই আজ্ঞাই ব্রহ্ম-প্রকৃতি মহামায়া, এবং যোগী তাঁহাকে ভ্রূমধ্যের সমীপবর্ত্তী মস্তিষ্কের অধস্তন ভাগে সাক্ষাৎ করেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম আজ্ঞাচক্র। তৃতীয়স্তরে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশতত্ত্ব, যোগীর ইহা কণ্ঠপ্রদেশস্থ বিশুদ্ধি চক্র, কারণ আকাশ-পুরুষ না হইলে চিত্তমল বিশুদ্ধ হয় না। চতুর্থস্তরে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল, ইহা যোগীর হৃৎপ্রদেশস্থ অনাহত চক্র, যেখানে নাদরূপী অনাহত ধ্বনির স্ফুরণ প্রথম উপলব্ধি হয়। পঞ্চমস্তরে তেজস্তত্ত্ব বহ্নিমণ্ডল ও তদ্দ্বারা রূপ-বিকাশ, ইহাই যোগীর মণিপুর চক্র, কারণ মণিগণের বিভিন্ন জ্যোতিই প্রথম রূপসৃষ্টি, এবং বহ্নি হইতেই সমস্ত মণি কাঞ্চন উৎপন্ন হইয়াছে। ষষ্ঠস্তরে রসতত্ত্ব ও কামসৃষ্টি, এখানেই যোগীর স্বাধিষ্ঠান চক্র। জীব কামরসে লিপ্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে, আকারভেদে কাম নানা বন্ধনে জীবকে বাঁধিয়াছে, সেই কামচক্র বা রাধাচক্র জীবাত্মার অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া ইহার নাম স্বাধিষ্ঠান। কামই প্রেমে পরিণত হয়, তখন কামচক্র রাধাচক্র হইয়া দাঁড়ায়। সপ্তমস্তরে পার্থিবমণ্ডল, ইহাই জীবজগতের স্থূলভোগের স্থান 'মূলাধার'—পার্থিব ভোগে নিস্পৃহ না হইলে উর্দ্ধতন ভূমির অভিজ্ঞান আসে না।

সপ্তস্তরে বিন্যস্ত সপ্ত সৃষ্টিমণ্ডলে যোগীর সপ্ত যোগভূমি এবং সপ্ত আচার কল্পিত হইয়াছে। মূলাধার মণ্ডলে শুভেচ্ছা নামক প্রথম

ভূমিতে আত্মজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা উদয় হয়, তখন যোগী বেদাচার নামক সদনুষ্ঠানে রত হয়। স্বাধিষ্ঠান মণ্ডলে কামতৃষ্ণার ক্ষয় হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়, দেহাত্মবিচার উপস্থিত হয়, তখন বিচারণা নামক দ্বিতীয় যোগভূমিতে আরূঢ় যোগী জীবমাত্রে হরিজ্ঞানে হিংসাশূন্য বৈষ্ণবাচারে রত হয়। মণিপুরমণ্ডলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্ষীণতা হয়, সেই তনুমানসা (যেখানে মনের 'তনুতা' অর্থাৎ ক্ষীণতা হয়) নামক তৃতীয় ভূমিতে যোগী জিতেন্দ্রিয় হইয়া অষ্টাঙ্গ যোগানুষ্ঠানে রত হয়, এবং যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধ্যান-ধারণা-সমাধির অনুষ্ঠান জন্য শৈবাচারী কথিত হয়। অনাহতমণ্ডলে চিত্ত বিষয়রাগ বর্জ্জিত হওয়ায় যোগী তখন শুদ্ধ সত্ত্বস্থ হইয়া দক্ষিণাচার পালন করে, সেইজন্য এই ভূমির নাম সত্ত্বাপত্তি। নাদানুসন্ধান এই দক্ষিণাচারের মুখ্য লক্ষণ, তখন যোগী অহর্নিশি মন্ত্রজপে রত হইয়া শ্মশান প্রান্তরাদি নির্জ্জন দেশে অবস্থিতি করে, নাদের আস্বাদন নিমিত্ত ক্ষুদ্র বিষয়সুখ আর তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না; কিন্তু এখনও জগৎ লয় হয় নাই, চিত্ত নাদতরঙ্গে সম্পূর্ণ প্লাবিত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বৈতভ্রম ঘুচিতে পারে না, তাই জগতের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি থাকাতে এই আচারের নাম দক্ষিণাচার। বিশুদ্ধিমণ্ডলে যোগী আকাশবৎ স্বচ্ছ হন, তখন শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবেও তাঁহার আসক্তি থাকে না বলিয়া এই ভূমির নাম অসংসক্তি। এখানে প্রকৃত লয়ক্রম বা বামাচার উপস্থিত হয়, যোগীর চিত্ত নাদে বিলীন হয়, তাহাই খেচরীমুদ্রাতে পরামৃত আস্বাদন বলিয়া হঠযোগে কথিত হয়। আজ্ঞামণ্ডলে যোগীর বিন্দুদর্শন হয়, তখন বাহ্য ও আভ্যন্তর সমস্ত পদার্থের ভাবনা তিরোহিত হয় বলিয়া এই ভূমির নাম পদার্থা-ভাবনী, সোহং ভাবের বিকাশ হওয়ায় যোগীর এখন সিদ্ধান্তাচার।

সহস্রদল মণ্ডলে পূর্ণব্রহ্মময় যোগী নিজের সচ্চিদানন্দময় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হন, ইহাই তুর্য্যগা নামে সপ্তমভূমি। এই ভূমিতে আরূঢ় যোগীর ব্যুত্থান দশাতে বিষ্ঠাচন্দনে শত্রুমিত্রে সমভাবের উদয় হয়, তখন তিনি কুলাচারী বা কৌল বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহার বুদ্ধিকৃত কর্ম্মলোপ হইয়া তিনি 'কুল' অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া বিচরণ করেন।

এখন বর্ণময়ী শক্তিপুঞ্জ যে ভাবে উৎপন্ন হইলেন তাহার একটু আলোচনার আবশ্যক। শ্রীকালিকার ককারকূট সহস্রনাম প্রসঙ্গে দেবী প্রশ্ন করেন—"সৃষ্টিঃ কুত্র বিলীয়েত পুনঃ কুত্র প্রজায়তে। ব্রহ্মাণ্ডগোলকং তত্র কিমাদ্যং কারণং মহৎ ॥"—সৃষ্টি কোথায় বিলীন হয়? এবং পুনরায় কোথায় উৎপন্ন হয়? এই ব্রহ্মাণ্ডগোলকের আদ্য মহৎ কারণই বা কি? তদুত্তরে শ্রীসদাশিব বলিতেছেন—

শূন্যে ব্রহ্মাণ্ডগোলেতু পঞ্চাশৎ শূন্যমণ্ডলে।
পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা তদন্তে কালিকা স্থিতা ॥
অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডং রাজদন্তাগ্রকে শিবে।
স্থাপ্য শূন্যালয়ং কৃত্বা কৃষ্ণবর্ণং বিধায় চ ॥
মহানির্গুণরূপাতু বাচাতীতা পরাকলা।
ক্রীড়য়া শূন্যরূপস্তু ভর্ত্তারঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥
সৃষ্টেরারম্ভকার্য্যার্থং ছায়া দৃষ্টা তদা তয়া।
ইচ্ছাশক্তিস্তু সা জাতা তয়া কালো বিনির্ম্মিতঃ ॥
প্রতিবিম্বং তত্র দৃষ্টং জাতা জ্ঞানাভিধা তু সা।
ইদমেতৎ কিং বিশিষ্টং জাতং বিজ্ঞানকং যদা।
তদা ক্রিয়াভিধা জাতা তদিচ্ছাতো মহেশ্বরি ॥
ব্রহ্মাণ্ডগোলকে দেবি রাজদন্তস্থিতস্তু যৎ।
সা ক্রিয়া স্থাপয়ামাস স্ব স্ব স্থানক্রমেণ চ ॥

"ব্রহ্মাণ্ডগোল শূন্যে অবস্থিত, এবং ইহা শূন্যময়। শব্দব্রহ্ম যে অব্যক্ত শূন্যমণ্ডলে স্ফুরিত হইলেন তাহাই শূন্য ব্রহ্মাণ্ডগোল। শব্দব্রহ্মের ঐ শূন্যগোল বীজরূপী পঞ্চাশৎ শূন্যমণ্ডল রূপধারণ করিলেন। সেই সকল শূন্যমণ্ডল ওঙ্কারের পঞ্চ অবয়ব ক্রমে পঞ্চস্তরে বিন্যস্ত হইলেন। প্রণবাত্মক শব্দব্রহ্মের পঞ্চ অবয়বই পঞ্চ শূন্য, এবং সেই পঞ্চশূন্যে সদাশিব প্রভৃতি পঞ্চ পুরুষ উপহিত। যে সকল বীজরূপী শূন্যমণ্ডল অকথাদি ত্রিরেখাতে শব্দব্রহ্মের উৎপত্তির সঙ্গে বিনিঃসৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন এই পঞ্চশূন্য মধ্যে উপাগত হইলেন, এখানে বীজগুলি পঞ্চশূন্যের পঞ্চ অধিদেবতা কর্ত্তৃক উৎপাদিত কলারূপে বর্ণাত্মক দেহ ধারণ করিলেন। যাহা পূর্ব্বে অব্যক্ত শব্দব্রহ্মমধ্যে স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহাই এখন ব্যক্তরূপে পরিণত হইল, প্রণবের পঞ্চ অবয়বই তাহাদের ব্যক্তাবস্থার উৎপাদক, সেই সকল অবয়ব যখন অব্যক্তরূপে শব্দব্রহ্মে বিলীন ছিল তখন বীজগুলিও সেই সেই অবয়ব মধ্যে বিলীন ছিল, পঞ্চ অবয়বের ব্যক্তাবস্থায় পঞ্চস্তরে ভাসমান হওয়ার সঙ্গে বীজগুলিও সেই সেই অবয়বের সঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইল। ব্রহ্মা প্রণবের প্রথম মাত্রা অকার হইতে সৃষ্টি-ঋদ্ধি-স্মৃতি-মেধা-কান্তি-লক্ষ্মী-ধৃতি-স্থিরা-স্থিতি-সিদ্ধি এই দশ কলা উৎপাদন করেন, এবং ইহারা যথাক্রমে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ এই দশবর্ণ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। দ্বিতীয় মাত্রা উকার হইতে বিষ্ণু কর্ত্তৃক জয়া পালিনী শান্তি ঈশ্বরী রতি কামিকা বরদা হ্লাদিনী প্রীতি ও দীর্ঘা এই দশকলা উৎপাদিত হয়, ইহারা যথাক্রমে ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন এই দশবর্ণে অবস্থিত। তৃতীয় মাত্রা মকার হইতে তীক্ষ্ণা রৌদ্রী ভয়া নিদ্রা তন্দ্রী ক্ষুৎ ক্রোধনী ক্রিয়া উৎকারী ও মৃত্যু এই দশকলা সংহার নিমিত্ত রুদ্র উৎপাদন করেন, ইহারা যথাক্রমে প ফ ব ভ ম য র ল ব শ এই দশবর্ণে অধিষ্ঠিত। বিন্দু হইতে ঈশ্বর

কর্ত্তৃক পীতা শ্বেতা অরুণা অসিতা ও অনন্তা এই পঞ্চকলা উৎপাদিত হয়, ইহারা য স হ ল ক্ষ এই পঞ্চবর্ণে প্রতিষ্ঠিত, এই মূর্ত্ত জগৎ ঐ বিন্দুজ পঞ্চকলাতে তিরোহিত হয়। নাদ হইতে সদাশিব কর্ত্তৃক নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্যা শান্তি ইন্ধিকা দীপিকা রেচিকা মোচিকা পরা সূক্ষ্মা সূক্ষ্মামৃতা জ্ঞানামৃতা আপ্যায়নী ব্যাপিনী ব্যোমরূপা ও অনন্তা এই ষোড়শ ভুক্তিমুক্তিপ্রদ কলা উৎপাদিত হয়, এবং ইহারা ষোড়শ স্বরবর্ণে যথাক্রমে অবস্থিত। স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে ভাসমান সমগ্র মূর্ত্ত জগৎ এই পঞ্চশূন্যমধ্যস্থ পঞ্চাশৎ কলামধ্যে নিয়মিত রহিয়াছে। বিরাটরূপিণী তারা সেই মূর্ত্তজগৎকে ধারণ করিতেছেন, তাই বলা হইয়াছে 'পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা'। তার বলিতে ওঙ্কারাত্মক নাদকেই বুঝায়, তারা সেই নাদের ব্যক্ত বিরাট্‌মূর্ত্তি যাঁহার উদর মধ্যে পঞ্চশূন্য কল্পিত হইয়াছে। পঞ্চশূন্যের পরপারে যাহা তাহা অমূর্ত্ত—অব্যক্ত শব্দব্রহ্ম—তাহাই কারণরূপিণী কালিকা। এই কালিকা কল্পভেদে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে উপাসিত হইলেও বস্তুতঃ তিনি আদ্যাশক্তি-রূপিণী মূলপ্রকৃতি। তাঁহার কারণ শরীর অলক্ষ্য বলিয়া রূপকল্পনার অতীত। সেই পরাশক্তি হইতে কালের উৎপত্তি। সৃষ্টি কালব্যাপী, কাল ও জগৎ অভিন্ন, যাহা কিছু হইয়াছে হইতেছে বা হইবে সে সমস্তই কালের মূর্ত্তি। বিন্দুরূপী কাল শক্তি হইতে বিনিঃসৃত বলিয়া শক্তির নাম কালিকা। কাল ভিন্ন শক্তির অন্য রূপ নাই। যে কালে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে, সেই কল্পে শক্তির শ্বেতবর্ণা মূর্ত্তিই কালিকা নামে উপাসিত হন। রজোগুণের প্রাধান্য হইলে, কালিকা তখন রক্তবর্ণা, এবং তামস কল্পে তিনি কৃষ্ণবর্ণা। কল্পভেদের ন্যায় যুগভেদেও সত্ত্বাদিগুণের বৃদ্ধি অনুসারে কালিকা মূর্ত্তিরও বর্ণভেদ হইয়া থাকে।

আদ্যাশক্তি রাজদন্তের সমীপবর্ত্তী তালুমূলের উপরিভাগে শূন্য

কল্পনা করিয়া সেই শূন্যমধ্যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন। এখানে রাজদন্ত শব্দে জিহ্বামূলের উর্দ্ধভাগে অলিজিহ্বা (আলজিভ্ Uvula)কে বুঝাইতেছে, উচ্চস্বর নির্গমনে এই যন্ত্রের ও তালুমূলের সঙ্কোচ হয়, এবং ইহাদের উর্দ্ধে মস্তিষ্ককোটরে সমগ্রসৃষ্টি কারণরূপে অবস্থিত। এখানে শক্তিরূপিণী মূলপ্রকৃতি প্রথমে শূন্য কল্পনা করিয়াছিলেন, শূন্য ব্যতিরেকে নাদাদি পরবর্ত্তী তত্ত্ব উদ্ভূত হইতে পারে না, শূন্যকে আশ্রয় করিয়াই আদ্যাশক্তি সৃষ্টির মূল নাদকে ধারণ করেন, সেইজন্য শূন্যকে শক্তির ভর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। এই মহাশূন্যই মহাকাল, কারণ যতক্ষণ এই শূন্যকল্পনার অবস্থিতি ততক্ষণ মাত্র সৃষ্টির অবস্থিতি, আংশিক পরিবর্ত্তন বা লোপ হইলেও সমগ্র সৃষ্টির ধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় হইতে পারে না। মহাশূন্য মহাকাল এবং শক্তির নাদরূপে বিকাশ এই তিনই সমকালব্যাপী। শক্তি যাহা করিতেছেন, শূন্যরূপী মহাকাল তাহাই সাক্ষীচৈতন্যরূপে দর্শন করিতেছেন, তিনিই একমাত্র 'উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্ত্তা ভোক্তা এবং মহেশ্বর।' সৃষ্টির অনাদিকল্পে, যখন এই শূন্যকল্পনার উদয় হয়, তখন কিছুরই বিকাশ ছিল না, শূন্য তখন অনভিব্যক্ত বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ—অর্থাৎ সমস্ত বর্ণের অভাব। আমাদের সুষুপ্তি দশাতে মন প্রভৃতি যে তমোমধ্যে বিলীন হয়, এই কৃষ্ণবর্ণ সেইরূপ তমোময় অবস্থা। তৎকালে কোন ভাবের বিকাশ না থাকাই ঐ তমোরূপ নির্ব্বিশেষতা। অতঃপর যাহা বলা হইয়াছে সে সমস্ত কথা আমরা শক্তিসঙ্গমতন্ত্রোক্ত সৃষ্টিবর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কাল নির্ম্মিত হইলেন, ইহার ভাবার্থ পূর্ব্ববর্ণিত নাদ হইতে বিন্দুরূপী মহাকালের আবির্ভাব, নাদব্যাপ্ত শূন্যই বিন্দুরূপ ধারণ করেন, সুতারাং শূন্যকে মহাকাল বলা আর বিন্দুকে মহাকাল বলা একই কথা। রাজদন্তের উর্দ্ধে যে ব্রহ্মাণ্ড-

গোল নির্ম্মিত হইল, ক্রিয়াশক্তি তাহা বিভিন্ন স্তর ক্রমে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিলেন। এই ক্রিয়াশক্তি পরবিন্দুভেদ হইয়া শব্দব্রহ্মরূপে নির্গত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার দ্বারা সৃষ্টি যে ভাবে স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত হইল তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

পৃথ্বিমণ্ডলে আসিয়া সৃষ্টি নিবৃত্ত হইল, তাই পৃথ্বীতে নিবৃত্তি কলা। আমাদের মেরুদণ্ডও আধারপদ্মে আসিয়া শেষ হইয়াছে। যদিও মেরুমধ্যস্থ রন্ধ্র আরও ঊর্দ্ধে বদ্ধ হইয়াছে, এবং সেইজন্য কোনও মতে মূলাধারকে গুহ্যপ্রদেশের দুই অঙ্গুল ঊর্দ্ধ অপেক্ষা আরও উচ্চে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মেরুর নিরন্ধ্র নিম্নভাগই মূলাধার নামক পৃথ্বী মণ্ডল। যে স্থানে সুষুম্নার রন্ধ্র আরম্ভ হইয়াছে সেখানেই আধারপদ্মের মূল। ঐ রন্ধ্রমুখে অধোমুখ সচ্ছিদ্র স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ অবস্থিত, লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া তড়িৎলতার ন্যায় ভাসমানা নাদময়ী কুণ্ডলিনী শক্তি লিঙ্গের রন্ধ্র নিজমুখ দ্বারা রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিতা রহিয়াছেন, লিঙ্গের নিম্নে চতুর্ম্মুখ ধাতা, তন্নিম্নে ত্রিলোকেশ্বর ইন্দ্র, তাঁহার নিম্নে পীতবর্ণা পৃথিবী। এই আধারপদ্মও অধোমুখ। এই সকল কথার ভাবার্থ—মূলকারণ ব্রহ্ম হইতে দৃষ্টি বিমুখ হওয়াতেই এই জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, নাদশক্তি শব্দব্রহ্ম এখানে আসিয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়াছেন, যতক্ষণ আমাদের অধোদৃষ্টি ব্রহ্মাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত না হয় ততক্ষণ তিনি নিদ্রিত, সাধকের নাদ স্ফুরিত হইলে ঐ কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হন, যখনই আমরা জগৎ হইতে চিত্তকে প্রত্যাহরণ করিয়া ব্রহ্মান্বেষণে প্রস্তুত হইব তখনই তিনি জাগ্রত হইয়া লিঙ্গমধ্যস্থ রন্ধ্রপথে তাঁহার নাদাত্মক বিমানে আমাদিগকে সুষুম্নাবিবরে প্রবেশ করাইয়া ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবেন। তিনি সর্ব্বময়ী, একমেবাদ্বিতীয়ম্—বিন্দুরূপী চৈতন্য যখন যে আধারে যে ভাবে

অবস্থিত, সেখানেই তিনি স্বীয় নাদদেহের দ্বারা সেই চৈতন্যকে বেষ্টন করিয়া আছেন, তাই তাঁহার নাম কুণ্ডলিনী। শ্রীরুদ্রযামলতন্ত্রে পরাশক্তি আনন্দভৈরবকে বলিতেছেন—

যৎযৎ পদার্থনিকরে তিষ্ঠসি ত্বং সদা মুদা।
তত্রৈব সংস্থিরা হৃষ্টা চাহমেব ন সংশয়ঃ॥

"হে বিষয়ানন্দে মগ্ন ভৈরব! তুমি যে যে বিষয়সমূহে আনন্দরসে লিপ্ত হইয়া অবস্থিতি কর, আমিও সেই সেই স্থানে হৃষ্টচিত্তে তোমার সহ স্থির হইয়া থাকি।" তাঁহার এই ভাবই সতীধর্ম্ম, এবং তাহা মনুষ্যলোকে কোথাও কখনও লক্ষিত হয়। দেবীর সহস্রনাম মধ্যেও দেখিতে পাই, ভৈরব বলিতেছেন "চেতনেতি তদা শক্তিঃ মাং হ্যাপ্যালিঙ্গ্য তিষ্ঠতি" অর্থাৎ যখন আমি সৃষ্টিবিকাশের জন্য চিন্তিত হই, তখন কোনও এক চেতনরূপিণী শক্তি যেন আমাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, এরূপ অনুভব হয়। আমাদের মনই ঐ চেতনশক্তি। মনই মূলপ্রকৃতি, কখনও মায়া, কখনও নাদবিন্দু, কখনও চিত্ত অহঙ্কার, কখনও ভূতপদার্থ ও তাহাদের গুণপরম্পরা, নানারূপে আবির্ভূত হইয়া নর্ত্তকীর ন্যায় বহুভাব প্রকাশ করিতেছেন। মনই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, তাহার স্রষ্টা ও সৃষ্টি-পালন-সংহার কর্ত্তা। 'সাপ হয়ে কামড়াও তুমি, ওঝা হয়েও ঝাড় তুমি।' মনই গোপাল, গোপালের ব্যাধি, এবং গোপালের বৈদ্য, আবার তিনিই নন্দ যশোদা রাধা জটীলা কুটিলা। সেই মন অতি বক্র! সদাই কুণ্ডলী পাকাইতেছেন। তাঁহাকে সোজা করিতে পারিলেই তিনি তখন নাদময়ী শক্তিরূপে সুষুম্নাপথে প্রবেশ করেন। মনই মূলাধারের কুণ্ডলিনী শক্তি। আমাদের পূজ্যপাদ গুরুদেব একদিন জিজ্ঞাসা করেন "বাবা! কৃষ্ণ বংশীরবে গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেন। বলিতে পার, বাঁশের

একটা বাঁশীতে এমন কি গুণ ছিল? ঐ বাঁশীটা সরল ছিল গো!" মনের বিচরণ ক্ষেত্র মেরুদণ্ডই কুঞ্জিকা, সর্পের ন্যায় বক্রাকারে অবস্থিত, মনঃস্থির সহকারে যোগাসনে বসিয়া ঐ কুঁজিকে সোজা করিতে হয়, তখন তাহাতে বংশীধ্বনি উত্থিত হইলে নাদকলারূপ গোপীগণ বশীভূত হয়, এবং বিষয়কোলাহল রূপ 'কংস' অসুর বধ হয়। চিত্তকে নাদাসক্ত করিবার নিমিত্তই মন্ত্রধ্বনির প্রয়োজন। চিত্ত নিরালম্ব থাকিতে পারে না, তাহাকে জাগতিক চিন্তা হইতে প্রত্যাহরণ করিয়াই নাদাসক্ত করিতে হইবে, নতুবা সে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইবে। ঐহিক বিভূতি কামনাতেই হউক, অথবা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের জন্যই হউক, মনকে সুষুম্নারন্ধ্রে প্রবেশ করাইতে হইবে। সুষুম্নাই সর্ব্বশক্তির আধার। মানুষ দেহধারী হইয়া আপনার পূর্ণশক্তির স্বামী হইতে পারিলেই তিনি 'স্বামী' পদবাচ্য। প্রকৃতি সেই শক্তিবিকাশের জন্যই জীবকে প্রেরণ করিতেছেন। যাঁহারা প্রকৃতির সেই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন, প্রকৃতি তাহাদিগকে দুঃখ দারিদ্র্য ব্যাধি রাজপীড়া প্রভৃতি নানাবিধ শাস্তির দ্বারা নিপীড়িত করিয়া উন্নতির পথে আনিবার চেষ্টা করেন। যদি তাহাতেও জীবের দুষ্প্রবৃত্তির মোড় না ফেরে, তখন প্রকৃতি তাহাকে নিকৃষ্ট যোনিতে, এবং ক্রমে কাষ্ঠ পাষাণ আদি জড়াবস্থায়, নিক্ষেপ করেন। ইহাই 'Survival of the fittest' যোগ্যতম বস্তুই যোগ্যতম ক্ষেত্রের অধিকারী। সৎশাস্ত্র প্রকৃতির অলঙ্ঘ্যনীয় শাসনকেই প্রকাশ করিতেছেন—"এই এই গর্ত্তে পড়িও না! কোন শক্তির অপব্যয় করিও না! ঈশ্বর তোমার বুদ্ধিরূপ হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি ভুলপথ ও ঠিকপথ বলিয়া দিবেন, সাধু ও চোর দেখাইয়া দিবেন!" জগতের ইতিহাস প্রকৃতির নিয়মেরই পরিচয় দিতেছে।

মন্ত্রশক্তি ও মন্ত্রদেবতা

নিস্তরঙ্গ জলরাশিতে ঢিল পড়িলে সমকেন্দ্র বৃত্তাকার তরঙ্গ সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, একটীর পর আর একটী করিয়া ক্রমাগত কেন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইতে থাকে। যদি কোন স্থানে আসিয়া ঐ তরঙ্গ বাধা পায়, তবে সেই বাধাকে নূতন কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকার ক্ষুদ্র তরঙ্গ সকল প্রসারিত হয়। ঠিক এইরূপ আকাশমধ্যে কোনস্থানে ধ্বনি হইলে, সেই ধ্বনির তরঙ্গ বৃত্তাকারে সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হয়, জলের হিল্লোলের ন্যায় এখানে আকাশস্থ বায়ুর হিল্লোল সহ ধ্বনি ক্রমশঃ দূর প্রদেশে গমন করিতে থাকে। বায়ুশূন্য আকাশে বস্তুর আঘাতজনিত শব্দ শ্রুতি-গোচর হয় না, সেই জন্য অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে বায়ুর স্বল্পতাহেতু নিকটস্থ লোকের কথা সুস্পষ্ট শুনা যায় না। বায়ুর স্তর পৃথিবীর সন্নিকটে যেরূপ ঘনীভূত, পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ উচ্চে ঐ স্তর ক্রমশঃ লঘু হইতে থাকে, এবং পরিশেষে প্রায় নির্ব্বাত আকাশই বিদ্যমান থাকে, সেখানে উল্কা প্রভৃতি খেচর পদার্থের সংঘর্ষ হইলেও তাহার শব্দ শ্রবণগ্রাহ্য হয় না। নির্ব্বাত প্রদেশে বস্তুর সহ বস্তুর সংঘর্ষজনিত শব্দ শ্রুতিগোচর না হইলেও, ঐ সংঘর্ষের ফলে তত্রত্য আকাশে শব্দ হইয়াছিল কি না? ঐরূপ ক্রিয়া বায়ুমণ্ডলের মধ্যে হইলে যখন শব্দ-রূপে প্রতীয়মান হয়, তখন মানিতে হইবে যে সেখানেও শব্দ হইয়াছিল, তবে তাহা শ্রবণের উপযোগী নয়, কারণ বায়ুদ্বারাই শব্দ কর্ণপটহে ধ্বনিত হইয়া শ্রবণযোগ্য হয়। ধ্বনি বা শব্দ প্রকৃত কি বস্তু? বস্তুগত

পরমাণু সকলের (molecules) স্পন্দন বা কম্পনই শব্দরূপে বায়ুদ্বারা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। বস্তুভেদে ঐ পরমাণু কোথাও ঘনীভূত কোথাও বিরলভাবে অবস্থিত। কাংস্য প্রভৃতি ধাতব পদার্থের পরমাণুগুলি ঘনীভূত অর্থাৎ ঠেসাঠেসি ভাবে থাকাতে, তাহাতে আঘাত করিলে পরমাণু সকলের তীব্র স্পন্দন হইতে থাকে, সেইজন্য ধাতবপদার্থ হইতে তীক্ষ্ণ ধ্বনি উত্থিত হয়। কাষ্ঠ প্রভৃতি পদার্থে পরমাণু সকলের দূরত্বহেতু সেরূপ ধ্বনি হয় না, এবং কাষ্ঠমধ্যে যাহার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক তাহাতে শব্দও অধিক হয়। বস্তুতে আঘাত লাগিলে তাহার পরমাণু সকল স্পন্দিত হইয়া শব্দ আবিষ্কৃত হয়, অতএব শব্দ আর কিছুই নয় উহা পরমাণুর স্পন্দনের শ্রবণযোগ্য অবস্থা। বস্তুমধ্যে যে পরমাণু আছে তাহা সেই বস্তুর অতি সূক্ষ্ম অবস্থা। রসায়নশাস্ত্রে বিভিন্ন বস্তুতে পরমাণুর ভিন্নত্ব লক্ষিত হইয়াছে, বস্তুর যে সূক্ষ্মতম অবস্থাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহাই সেই বস্তুর পরমাণু। কিন্তু নিরালম্ব আকাশমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর পরমাণু কোথা হইতে উপাগত হইল? আকাশমধ্যে যে সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহা একজাতীয় ভিন্ন হইতে পারে না। সেই একজাতীয় সূক্ষ্মতম পদার্থের স্পন্দন হইতে সর্ব্বপ্রকার রাসায়নিক পরমাণু উৎপাদিত হইয়াছে, স্পন্দনের তীব্রতা বা মৃদুতা নিবন্ধন বিভিন্ন পরমাণুর সৃষ্টি। স্পন্দনই একমাত্র মূল ক্রিয়াশক্তি। ইচ্ছাশক্তিও সেই স্পন্দন (vibration) ছাড়া আর কিছুই নয়। যাহা স্থির নিশ্চল নিষ্কম্প নিস্পন্দ, তাহাই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর পরমধাম। স্পন্দনবিশিষ্টতাই জগতের লক্ষণ, জগতের পরমাণুও স্থির নয়, সদাই সচল। অচল ধ্রুব ব্রহ্মাকাশে ইচ্ছাশক্তির উদয় হওয়াতে সেই আকাশ স্পন্দিত হইল। সেই স্পন্দনের নামই নাদ, এবং নাদের অবস্থাভেদ বিন্দু। সেই স্পন্দনই

একমাত্র পরমাণু, এবং তাহাই এই বিশাল সৃষ্টিরূপ ধারণ করিয়াছে। সেই স্পন্দন বৃত্তাকারে প্রসারিত হয় বলিয়া তাহার নাম কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলিনী স্পন্দাত্মিকা শক্তি বলিয়া আগম তাঁহাকে 'বায়বী' শক্তি নাম দিয়াছেন। বায়ুশব্দ স্থূলভাবে বাতাসকে বুঝায়, আরও সূক্ষ্মভাবে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াকে বুঝায়, কিন্তু ব্রহ্মাকাশের স্পন্দনই একমাত্র আদি বায়ু। আমাদের মনঃশক্তিকে সংকল্পাত্মিকা বলা হয়, সংকল্প আর কিছুই নয় উহা মনের স্পন্দন মাত্র, বিষয়ের আকর্ষণনিমিত্ত তদভিমুখে সঞ্চালিত হওয়াই ঐ সঙ্কল্প বা স্পন্দন। যাহা মূলে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই শেষে মনঃশক্তি। ইচ্ছাশক্তি, কুণ্ডলিনী, বায়বী, মন এ সমস্তই স্পন্দন মাত্র, এবং আগমও তাহাদের একার্থতা ভূয়োভূয়ঃ প্রকাশ করিতেছেন—

সর্ব্বত্রব্যাপিকাশক্তিং কামরূপাং নিরাশ্রয়াম্।
ব্যক্তাব্যক্তাং স্থিরপদাং বায়বীং মাং ভজেদ্ যতিঃ॥

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আমি ব্যাপ্ত হইয়া আছি বলিয়া আমি 'ব্যাপিকাশক্তি', আমি স্বেচ্ছাতে সর্ব্বরূপ ধারণে সমর্থ বলিয়া 'কামরূপা', যাহা কিছু মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় সেই সকল 'ব্যক্ত' পদার্থ এবং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত যাহা 'অব্যক্ত' সে সমস্তই আমি, আমি কোন সৃষ্টপদার্থকে অবলম্বন না করিয়া অবস্থিত বলিয়া 'নিরাশ্রয়া', একমাত্র সত্য ধ্রুব পরব্রহ্মে আমার অবস্থিতি জন্য আমি 'স্থিরপদা', এবং আমি সকলকে তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপারে প্রেরণ করিয়া থাকি বলিয়া 'বায়বী,' সেইজন্য আমি সংযতচিত্ত মুমুক্ষুগণের উপাসনার বস্তু।"

ধন্যস্তাভ্যাসযোগেন চৈতন্যা কুণ্ডলী ভবেৎ।
সা দেবী বায়বী শক্তিঃ পরমাকাশরূপিণী॥

"ভোগবিরত ধন্য ব্যক্তির যম-নিয়ম-প্রাণায়াম-ধ্যান-ধারণাদি অভ্যাসযোগবলে কুণ্ডলী চৈতন্য হন (অর্থাৎ আপনাকে কুণ্ডলিনী শক্তির স্পন্দনরূপে বিদিত হন), সেই কুণ্ডলী শক্তিই বায়বী শক্তি, এবং তিনি পরমাকাশরূপে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের একমাত্র আধার।"

এষা দেবী কুণ্ডলিনী যস্যা মূলাম্বুজে মনঃ।
মনঃ করোতি সর্ব্বাণি ধর্ম্মাধর্ম্মাণি সর্ব্বদা।
যত্র গচ্ছতি সঃ শ্রীমান্ তত্র বায়ুশ্চ গচ্ছতি॥

"এই পরমজ্যোতি স্বরূপিণী কুণ্ডলিনী জীবের মূলপদ্মে মনোরূপে অবস্থিতা। মনই সর্ব্বদা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম করিতেছেন। মনই সমস্ত বিষয়শ্রীর অধিপতি, কারণ বিষয়মাত্রেই মনের কল্পনা সম্ভূত। সেই শ্রীমান্ মন যেখানে গমন করেন, সেইখানেই বায়ুরূপ ক্রিয়াশক্তি তাঁহার অনুগমন করেন।"

বেদাধীনং মহাযোগং যোগাধীনা চ কুণ্ডলী।
কুণ্ডল্যধীনচিত্তন্তু চিত্তাধীনং চরাচরম্॥
মনসঃ সিদ্ধিমাত্রেণ শক্তিসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
যদি শক্তির্বশীভূত্বা ত্রৈলোক্যঞ্চ তদা বশম্॥

"জীবরূপী নিজ আত্মাকে বিশ্বচৈতন্যের পরপারে পরমাত্মাতে একীভূত করাই 'মহাযোগ।' সেই মহাযোগ বা মহালয় ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বেদের অধীন—সর্ব্বত্র একমাত্র বিশ্বব্যাপক চৈতন্য বিরাজিত, ইহাই বেদ বা ব্রহ্মজ্ঞান, এবং সেই জ্ঞান ব্যতীত জীব কখনই পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে সক্ষম হইতে পারে না ইহাই ভাবার্থ। জীবমাত্রে মনোরূপে অবস্থিত কুণ্ডলী-শক্তি যোগের অধীন—অর্থাৎ কুণ্ডলীকে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে আপনাকে নাদতরঙ্গে ভাসাইতে হইবে, মন্ত্রধ্বনি চিন্তাদ্বারা অথবা কুম্ভক অবলম্বনে অন্তরে অনাহত নাদস্রোত

স্ফুরিত হইলে নিজের অহন্তা সেই স্রোতে বিলীন হয় তাহাই 'যোগ,' তখনই বিশ্বময়ী নাদরূপিণী কুণ্ডলিনীর সাক্ষাৎকার ঘটে। জীবের চিত্ত কুণ্ডলীর অধীন, এবং চরাচর বিশ্ব চিত্তের অধীন"—অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী নাদশক্তির কলা বা অংশই জীবের চিত্তরূপে অবস্থিত, সেই শক্তি যে আধারে যেরূপে স্ফুরিত হইতেছে সেখানে চিত্তও তদনুরূপ ভাবযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, কোথাও ভোগবিলাসে আসক্ত কোথাও পরোপকার নিরত এবং সর্ব্বভূতে আত্মবৎ প্রতীতি। শক্তির নানারূপ ধারণ ও নানাভাবের অবতারণ বিষয়ে শ্রীত্রিপুরার সহস্রনাম মধ্যে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

কামাকর্ষণিকা শক্তিবু‍র্দ্ধ্যাকর্ষণরূপিণী।
অহঙ্কারাকর্ষণী চ সর্ব্বাকর্ষণরূপিণী।
স্পর্শাকর্ষণরূপা চ রূপাকর্ষণরূপিণী।
রসাকর্ষণরূপা চ গন্ধাকর্ষণরূপিণী।
চিত্তাকর্ষণরূপা চ বিশ্বাকর্ষণরূপিণী।
নামাকর্ষণরূপা চ জীবাকর্ষণরূপিণী।

জগৎ চিত্তাধীন কেন? চিত্তই যেমন ভাবিতেছে কালক্রমে সেইরূপই দেখিতেছে। এই জগতের বাস্তব অস্তিত্ব চিত্তরূপ মাত্র। নাদকলার স্ফুরণ চিত্তরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে, তাহাই জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে। সেই জন্য শেষে বলিতেছেন, মনের সিদ্ধি করিতে পারিলেই শক্তির সিদ্ধি আপনি হয়, এবং শক্তি বশীভূত হইলে ত্রৈলোক্য বশতাপন্ন হয়। এখানে সিদ্ধির অর্থ স্বরূপ অবধারণ। মনকে নাদকলা রূপে পরিজ্ঞাত হওয়াই মনের সিদ্ধি, নাদ অন্তরে স্ফুরিত হইবা মাত্র মন তাহাতে লয় হয়, তখনই শক্তির পরিচয় হয়, কারণ শক্তিই নাদময়ী।

আজ্ঞাচক্রস্য মধ্যেতু বায়বী পরিতিষ্ঠতি।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা সা ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিতা।
মনোরূপা শরীরং হি ব্যাপ্য তিষ্ঠতি খেচরী॥

"বায়বী শক্তি আজ্ঞাচক্রের মধ্যে অবস্থিতা, তিনি চন্দ্রসূর্য্য ও অগ্নি রূপিণী, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিতা। সেই খেচরী শক্তি মনোরূপে সর্ব্বশরীরে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন।" এখানে শক্তির অকথাদি ত্রিরেখারূপে স্ফুরণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং সেখানে তিনি পরমাকাশে বিহারিণী বলিয়া 'খেচরী' বলা হইয়াছে—অথবা শক্তি সর্ব্বত্রই আকাশকল্পনা করিয়া তন্মধ্যে স্পন্দিত হইতেছেন বলিয়া তিনি সর্ব্বত্রই খেচরী। আজ্ঞাচক্রেই শক্তির প্রথম মনোময় বিগ্রহ ধারণ, সেখানে তিনি ত্রিবিন্দু ত্রিরেখা ও ত্রিশক্তিরূপে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের আদিম সূক্ষ্ম অবস্থাতে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছেন। যে মন লইয়া আমরা ঘর করি, তাহা ভৌতিক সৃষ্টির অন্তর্গত। সেই কারণাবস্থায় মনের ধর্ম্মাধর্ম্ম কল্পনা থাকিতে পারে না, জগৎ মধ্যে আসিয়াই ঐ ভেদকল্পনা উপস্থিত হইয়াছে। মস্তিষ্ককোটরের মহাশূন্যের ঠিক নিম্নভাগে আজ্ঞাচক্র, এই আজ্ঞামণ্ডলে পরমেশ্বরের আজ্ঞারূপিণী প্রকৃতি বা শক্তি প্রথম স্ফুরিত হন, সেই আজ্ঞাই ভগবতী উমা। উমা ও বম্ ওঙ্কারের রূপান্তর, অ-উ-ম বর্ণত্রয়ের বিপর্য্যাস অর্থাৎ স্থান পরিবর্ত্তন বশতঃ উমা (উ-ম-অ) ও বম্ (উ-অ-ম) শক্তির অবস্থাভেদ মাত্র। হংসচক্রে যেমন দক্ষিণাবর্ত্তে 'হংসঃ' ও বামাবর্ত্তে 'সোহং' অবস্থিত, সেই চক্রের ত্রিবিন্দু স্থানে অ-উ-ম এই বর্ণত্রয় বসাইয়া উকার হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে 'উমা' এবং বামাবর্ত্তে 'বম্' হয়।

নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদ্ যদি জানাতি বায়বীম্।
বায়বী পরমাশক্তিরিতি তন্ত্রার্থনির্ণয়ঃ॥

"বায়বী শক্তির পরিচয় হইলে অকালমৃত্যু হইতে পারে না। সর্ব্বতন্ত্রেই বায়বী পরমা শক্তি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।" হংসরূপে যে প্রাণবায়ু শ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রমে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা বায়বী-শক্তির স্পন্দনক্রিয়া সমুদ্ভূত। পূর্ণানন্দগিরিও বলিয়াছেন "শ্বাসোচ্ছাস-বিভঞ্জনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্য্যতে"—যে কুণ্ডলিনী শক্তি শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ দ্বারা জগতের জীবকে ধারণ করিতেছেন, কারণ ঐ প্রবাহ বন্ধ হইলেই মৃত্যু। জীব আপনাকে স্পন্দনাত্মিকা শক্তির সহ অভেদজ্ঞানে ভাবিতে থাকিলেও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে, ক্রমে প্রাণবায়ুর যাতায়াত বন্ধ হইয়া বাহ্যাভ্যন্তর বায়ুর সমতা উপস্থিত হয়, সেই নিরোধশূন্য বায়ুর সমতাকে 'কেবল' কুম্ভক বলা হয়। প্রাণবায়ুর ঐ সমতাই আয়ুষ্কর, এবং তাহাই অকালমৃত্যু রোধ করিয়া সুদীর্ঘ জীবন এবং জরাশূন্য কলেবর সম্প্রদানে সমর্থ। কিন্তু কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ সে পক্ষে ভীষণ অন্তরায়! রিপুগণের মধ্যে কাম ও ক্রোধ বায়ুসমতার প্রধান শত্রু। মহর্ষি বিশ্বামিত্র কামাপেক্ষা ক্রোধকে অধিক বিঘ্নকারী বলিয়া গিয়াছেন, কারণ কাম ক্রিয়ানিষ্পত্তি কালেই শ্বাসের গতিচাঞ্চল্য ঘটাইয়া থাকে, কাম্যবস্তুর চিন্তাকালে ইড়াভাবের প্রাধান্য বশতঃ ইন্দ্রিয়গণ শিথিল থাকে। ক্রোধের উদ্রেক মাত্রেই নিশ্বাসের উষ্ণতা উপস্থিত হয়, তখন মন পিঙ্গলাকে আশ্রয় করিয়া উগ্রভাব ধারণ করে, সেই সঙ্গে শ্বাসের প্রবল গতি হইতে থাকে এবং তাহা ক্রোধনিবৃত্তির পরেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

স্পন্দনাত্মিকা বায়বীশক্তি এই জগৎ প্রপঞ্চের মূল মধ্য ও অবসান। তিনি ভিন্ন অন্য কিছুরই সত্ত্বা নাই। তিনিই এক এবং অদ্বিতীয়। হরি-হর-ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত দেবতা, সমস্ত শক্তি, সেই বায়বীর লীলাবতার। আমাদের শ্বাস ত্যাগের ন্যায় তাঁহার প্রসারণ বা

বিকাশই সৃষ্টি, এবং শ্বাসগ্রহণের ন্যায় তাঁহার সঙ্কোচই প্রলয়। বিকাশ ও সঙ্কোচের মধ্যবর্ত্তী কাল তাঁহার স্পন্দনক্রিয়ারূপ জগতের স্থিতি। শ্রীমেরুতন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন—

চতুর্দ্দশেন্দ্রসংস্থৈব ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।
যা ধ্যায়তে মহামায়া ময়া তৎ শ্বাসনির্গমঃ॥
প্রপঞ্চো ব্রহ্মদিবসঃ কুম্ভকো রাত্রিরস্য তু।
এবং তস্যা ঘটিকয়া বর্ষমেকং বিধেঃ স্মৃতম্॥
ঘটীশতমিতং তস্যা ব্রহ্মা জীবতি কীটবৎ।
পক্ষমেকং সতীরূপং শুক্লং কৃষ্ণন্তু পার্ব্বতী॥
ঋতুমাত্রং হরির্জীবেৎ বর্ষমাত্রমহং শিবঃ।
এবং সা শতবর্ষা বৈ মহাকালস্য গেহিনী॥
সর্পকঞ্চুকবদ্দেহং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা পুনর্যুবা।
মহাকালঃ সদাতিষ্ঠেৎ স ময়া বিষয়ীকৃতঃ॥

"চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকালই ব্রহ্মার দিন পরিমাণ। যে মহামায়ার ধ্যানে আমি সর্ব্বদা নিমগ্ন, তাঁহার শ্বাসনির্গম কালই ব্রহ্মার দিন, যখন এই সৃষ্টিরূপ প্রপঞ্চের বিকাশ হয়। তাঁহার কুম্ভক অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণ ও নিরোধ কালই ব্রহ্মার রাত্রি, যখন প্রপঞ্চ লয় হয়। সেই মহামায়ার এক ঘটিকা (দণ্ড) কালে ব্রহ্মার এক বৎসর, এবং তাঁহার একশত ঘটিকা কালমাত্র ব্রহ্মা কীটবৎ জীবিত থাকেন। মহামায়ার শুক্লপক্ষই তাঁহার সতীরূপ, এবং তাঁহার কৃষ্ণপক্ষই পার্ব্বতীরূপ, অর্থাৎ মহামায়ার একপক্ষ কাল সতীদেহ স্থায়ী এবং অপর পক্ষ পার্ব্বতীদেহ স্থায়ী। তাঁহার এক ঋতু (মাসদ্বয়) পরিমিত কাল হরি জীবিত থাকেন, এবং আমি জগৎসাক্ষী সদাশিব তাঁহার বর্ষমাত্র কাল জীবিত থাকি। এইরূপ গণনাতে সেই মহামায়া শতবর্ষ

পরিমিত কাল মহাকালের গৃহিণীরূপে বিরাজ করেন, (অর্থাৎ মহামায়ার প্রতি শত বৎসর অন্তে মহাকাল পরবিন্দুরূপে ভাসমান থাকেন না, যে আদিনাদ হইতে পরবিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছিল সেই মূলাশক্তিরূপ আদিনাদে মহাকাল বিলীন হন, সেই শক্তিও তখন নির্গুণ ব্রহ্মপদবীতে বিশ্রান্ত হন। পরবিন্দুতে নিহিত ক্রিয়াশক্তিই মহাকালের গৃহিণী 'মহামায়া,' এবং ইচ্ছারূপিণী নাদময়ী আত্মাশক্তি পরবিন্দুরূপী মহাকালের জননী। পুনরায় ইচ্ছাশক্তির উদয়ে পরবিন্দুর আবির্ভাব হয়, তাই বলিতেছেন)—মহাকাল সর্পকঞ্চুকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ দেহত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করেন সেই জন্য মহাকালকে সদাস্থায়ী বলা হয়। আমি সেই মহাকালের স্বরূপ সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়াছি।" মহামায়ার একবার শ্বাসত্যাগে ব্রহ্মার একদিন, এবং ব্রহ্মার ৩৬০ দিনে মহামায়ার একদণ্ড কাল, অতএব মহামায়ার ৩৬০ শ্বাসে তাঁহার একদণ্ড হয়। দিবারাত্রির ৬০ দণ্ড মধ্যে আমাদের ২১৬০০ শ্বাস নির্গত হয়, সুতরাং আমাদেরও প্রতি-দণ্ডের শ্বাসসংখ্যা ৩৬০। পরবিন্দুর বিলোপই প্রকৃত মহাপ্রলয়, এবং তাঁহার পুনরাবির্ভাবই মহাকালের নব কলেবর পরিগ্রহ। পরমাকাশব্যাপী সদাশিবই মহাকালের স্বরূপ পরিজ্ঞাত আছেন, সুতরাং যখন যোগনিরুদ্ধ নির্ব্বিষয় চিত্ত সদাশিবের অবস্থাতে উপনীত হয় তখনই আমাদের মহাকালের পরিচয় ঘটিতে পারে। এই মহাকাল বা পরবিন্দুই একমাত্র পরমাণু। যোগীর চিত্ত যখন সদাশিব রূপ পরমাকাশে মিশিয়া স্থিতিলাভ করে তখনই—

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঅস্য বশীকারঃ।

পাতঞ্জল ১।৪০

আমাদের চিত্ত নিরন্তর একবিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত

হইতেছে, ইহার নাম চিত্তবিক্ষেপ। এই বিক্ষেপ না থাকিলে আমরা জাগতিক ব্যাপারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ি, আবার বিক্ষেপ থাকিতেও ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের স্থিতিলাভ রূপ যোগ হয় না। যোগীকে বিক্ষেপ পরিহারের জন্য হয় প্রাণবায়ুর রেচনান্তে রেচিত বায়ুকে নাসাগ্রে ধারণ অর্থাৎ নিরোধ করিতে হইবে, এইরূপ রেচক প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা চিত্ত একমাত্র লক্ষ্য-বিষয়ে স্থিতিলাভ করিবে। অথবা শব্দাদি বিষয়কে তত্তৎ ইন্দ্রিয়পথে চিত্তসংযম সহকারে ধারণা করিলে, চিত্ত তাহাতেই মগ্ন হইয়া অন্যদিকে ধাবিত হইবে না—নাসাগ্রে চিত্তসংযম অভ্যাসদ্বারা দিব্যগন্ধের সাক্ষাৎকার হইয়া চিত্ত তাহাতেই স্থিতিলাভ করে, এইরূপ জিহ্বাগ্রে সংযম দ্বারা দিব্যরসের আস্বাদনে, কণ্ঠমূলে সংযম দ্বারা দিব্যশব্দ শ্রবণে, তালুতে সংযমনে দিব্যরূপ দর্শনে, কর্ণবিবরে বাহ্যধ্বনির ধারণাদ্বারা নাদানুভূতিতে চিত্ত নিমগ্ন হয়, আর মন্ত্রধ্বনিতে সংযমদ্বারা মন্ত্রযোগীর চিত্ত সেই ধ্বনিতে স্থিতিলাভ করতঃ মন্ত্রশক্তিকে সাক্ষাৎ করে, সেইরূপ হৃৎপদ্মকোটরে দেবতার দিব্যমূর্ত্তি অথবা জ্যোতি চিন্তাতে চিত্ত সেই মূর্ত্তিতে অথবা জ্যোতিতে মিশিয়া যায়। যখন চিত্ত এইরূপে একমাত্র লক্ষ্যবস্তুতে সম্যক্ স্থিতিলাভ করে, তখন সেই বিক্ষেপশূন্য চিত্ত সূক্ষ্মধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইলে পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয়, এবং স্থূলধ্যানে নিবিষ্ট হইলে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুপদ মহাকাশ প্রত্যক্ষ হয়। ইহার নাম চিত্তের 'বশীকার।'

চিত্তের বশীকার অবস্থাতে মন্ত্রশক্তির ও মন্ত্রদেবতার সাক্ষাৎ হয়। যেখানে মূর্ত্তিধ্যান ব্যতিরেকে কেবল মন্ত্রধ্বনির অভ্যাস রূপ জপ হইতে থাকে, সেখানে মন্ত্রশক্তিরই পরিচয় হইয়া থাকে। সাধক জিতেন্দ্রিয় ও অন্য চিন্তা বিরহিত হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে প্রাণায়ামের অভ্যাস সহকারে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে ও মধ্যনিশায় নিয়মিত

মন্ত্রচিন্তাতে রত থাকিলে, দুই তিন মাসেই স্পন্দাত্মিকা মন্ত্রশক্তির আবির্ভাব হইবে, সাধকের দেহ মন অহঙ্কার সমস্তই সেই শক্তি-স্পন্দনে মিশিয়া গিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসের প্লাবন হইতে থাকিবে, তখন দেশ কাল ও রূপ কিছুই থাকিবে না। অথবা হয় ত কোন দিন সাধক ঐরূপ নিত্যকর্ম্মের অবসানে মন্ত্রচিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিয়াছেন, নিদ্রার আবেশে দেহমন স্তব্ধ হইয়াছে, তখন হঠাৎ এক অশ্রুতপূর্ব্ব সুমধুর দিব্যধ্বনির অপ্রতিহত প্রবাহ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সেই প্রবাহে টানিয়া লইল! তখন যদি ভয়সঞ্চার হয়, সুতরাং মন ও অহংজ্ঞান কথঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হয়, এবং সাধক উঠিবার জন্য প্রয়াস করেন, তবে দেখিবেন যে তাঁহার দেহ আর আজ্ঞাধীন নাই, কিন্তু চেষ্টা উদয়ের সঙ্গেই ধ্বনি স্তিমিত হইয়া আসিবে, এবং দেহের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভের সঙ্গেই ধ্বনিও বন্ধ হইবে। ইহাই মন্ত্রগত নাদের শ্রবণ, কিন্তু সে শ্রবণ কর্ণে হয় নাই, কারণ ইন্দ্রিয়গণ ও মন সহ অহংকার বিলুপ্ত হওয়ার পর ধ্বনির আবির্ভাব হইয়াছিল, ও তাহাদের আংশিক জাগরণের সঙ্গেই ধ্বনি তিরোহিত হইল। এখানে শক্তির স্পন্দন ধ্বনিরূপে প্রকট হইল। কিন্তু এই ধ্বনিকে ঠিক সুষুম্না মধ্যে স্ফুরিত নাদ বলিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাহ্যবায়ুর প্রবাহ দ্বারা শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর হয়, যেখানে সেই বায়ু বিরল সেখানে শব্দ ক্ষীণভাবে শ্রুতি-গোচর হয়, যেখানে বায়ুর অভাব সেখানে শব্দ শ্রবণগ্রাহ্য হয় না। কিন্তু সুষুম্নাতে বাহ্যবায়ুর প্রচার নাই, সেইজন্য সুষুম্নান্তর্গত নাদ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে না, সে নাদ কেবল আনন্দময় স্পন্দনরূপেই অনুভূত হইতে পারে। তবে ঐ অপ্রতিহত সুমধুর ধ্বনি কি পদার্থ? তাহা কখনই বাহ্য শব্দ নয়। চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইলেই,

অন্য সর্ব্বচিন্তার পরিহারের দ্বারা একমাত্র ধ্যেয়বস্তুতে চিত্ত আবদ্ধ হইলেই, ঐ ধ্বনির আবির্ভাব হইবে। ঐ ধ্বনি উপাসিত বীজ-মন্ত্রের নাদাংশ, উহাই মন্ত্রদেবতার শরীর, এবং ঐ ধ্বনি শ্রবণকে মন্ত্রময় দেবতার সাক্ষাৎকার বলা যাইতে পারে। সাধকের উহা কর্ণে শ্রবণ হয় নাই, কর্ণ দ্বারা ধ্বনিশ্রবণের অভ্যাস নিবন্ধন তিনি ভাবিয়াছিলেন কর্ণে শ্রবণ হইতেছে। বাস্তব পক্ষে সাধক তখন নিজে ঐ ধ্বনিতে একাত্মতা হইয়াছিলেন।

একাগ্রচিত্তে নিঃসঙ্গ সাধনাবস্থায় কখন এমনও হয় যে নিদ্রিত অবস্থাতেও সাধক যেন অনর্গল স্তব আবৃত্তি করিতেছেন, অথচ সেই স্তব তাঁহার পূর্ব্বে জানা ছিল না, কিম্বা সেরূপ রচনার পাণ্ডিত্যও তাঁহার ছিল না। ইহাও মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ, এবং এখানে সাধকের ভূতপূর্ব্ব কোনও জন্মের ঐ রচনাশক্তির জাগরণ হইয়াছিল। গীতা-তেও ভগবান বলিতেছেন "মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ," ভগবচ্চিন্তাতে নিরন্তর অভিনিবিষ্ট থাকিলে পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হয়, পূর্ব্বজন্মে উপার্জ্জিত জ্ঞানের বিকাশ হয়, আবার তাঁহার চিন্তাতে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির ইহ জীবনের স্মৃতি ও জ্ঞানও বিলুপ্ত হয়। তন্ত্রেও দেখিতে পাই, সাধক অশ্রুত শাস্ত্রেরও ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এবং তাঁহার মুখ হইতে গদ্যপদ্যময়ী বাণী নিঃসৃত হয়। মেহারে সিদ্ধিপ্রাপ্ত নিরক্ষর সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ যে সুললিত স্তবগান করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বানন্দতরঙ্গিনী গ্রন্থে পাঠক একবার দেখিবেন। তন্ত্রশাস্ত্রের সারভাগ, যাহা শিব-বাক্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা প্রবুদ্ধাবস্থায় সাধকের মুখ হইতেই নির্গত হইয়াছিল। বেদমন্ত্র ও উপনিষদ্ ঐরূপে প্রবুদ্ধ সাধকের বাণী হইতে গঠিত হইয়াছে।

জ্যোতিদর্শন মন্ত্রচৈতন্যের আর একপ্রকার লক্ষণ। যে সকল জ্যোতি

জাগ্রৎ অবস্থায় ক্ষণিকের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়, সে জ্যোতিকে মন্ত্রশক্তির প্রকাশ বলা যায় না। একাগ্রচিত্তে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টি থাকিলে, চক্ষু ঐরূপ জ্যোতি দর্শন করে, অক্ষিতারকার স্নায়বিক ক্রিয়াতে উহা উৎপাদিত হয়। কিন্তু যদি ঘোর অন্ধকার মধ্যে উপবিষ্ট ধ্যানস্থ সাধকের চতুর্দ্দিকে যেন অগ্নিময় প্রাকার বেষ্টন করিয়াছে, অথবা যেন সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভ স্ফুরিত হইতেছে, কিম্বা নক্ষত্রবৎ জ্যোতি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে সে সমস্ত মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া মানিতে হইবে। ধ্বনি যেমন আণবিক স্পন্দন দ্বারা উত্থিত হয়, জ্যোতিও সেইরূপ স্পন্দন ক্রিয়ার পরিণাম মাত্র, কিন্তু ধ্বনিপ্রচারের জন্য যেমন বাতপ্রবাহ আবশ্যক করে, আলোকরশ্মি দর্শনের নিমিত্ত তাহার বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া যাওয়ার আবশ্যক নাই, সেইজন্যই মহাকাশের অতিদূর প্রদেশস্থ নক্ষত্রাদির জ্যোতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

মন্ত্রচৈতন্যের প্রথম অবস্থাতেই নাদাত্মক ধ্বনির, বা জ্যোতির, বা দেবতামূর্ত্তির সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকে, কারণ তখনও সাধকের ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। যখন তিনি ইন্দ্রিয়গণকে বিস্মৃত হন, তাহাদিগের দ্বারা বস্তুগ্রহণের যোগ্যতা মনেও উদয় হয় না, তখন শব্দ স্পর্শাদির স্মৃতিও বিলুপ্ত হয়। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে স্মৃতির পরিশুদ্ধি বলা হইয়াছে, তখন আর সাধকের নিকট রূপ বা জ্যোতি অথবা ধ্বনি কিছুই প্রতিভাসিত হয় না, থাকে কেবল তাহাদের 'কারণ' মাত্র, যে কারণ হইতে রূপাদির প্রকাশ হয়, অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপ-বর্জ্জিত কেবল স্বভাবমাত্রের আস্বাদন, এবং সেই আস্বাদনে কোনরূপ বিকল্প বা ভেদজ্ঞান না থাকাতে তাহা বিতর্করহিত—"স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেব অর্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা", পাতঞ্জল ১।৪৩। চিত্ত এই নির্বিতর্ক অবস্থাতে উপনীত হইলে তখন মন্ত্রযোগীর মন্ত্র বা

দেবতা কেবল স্পন্দনরূপেই অনুভূত হইতে থাকে, এবং যখন স্পন্দনও স্থির হইয়া বিলুপ্ত হয় তখনই নির্গুণ উন্মনী অবস্থা বা নির্বীজ সমাধি।

পুরাণে যে সকল সাকার দেবতা বর্ণিত হইয়াছে, এবং তন্ত্র মধ্যে যে সমস্ত দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকল দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কারণ সে আলোচনা মন্ত্রদেবতার সাধন সম্পর্কে হওয়াই উপাদেয়। দেবতাভেদে পৃথক্ আলোচনারও প্রয়োজন, কারণ যে সকল দেবতা মৌলিক তত্ত্বরূপে সৃষ্টিপ্রবাহ মধ্যে অবস্থিত তাঁহারা জন্য বস্তু নন। যে ইন্দ্র মন্বন্তরব্যাপী কাল স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য করেন, পুণ্যক্ষয় হইলেই তাঁহার ইন্দ্রত্ব চলিয়া যায় এবং তখন সাধারণ জীবের ন্যায় তিনি জন্মমৃত্যুর বশীভূত হন। শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে নদীসকলের বালুকাসংখ্যা যত তত ইন্দ্র পূর্ব্বে গত হইয়াছেন, এবং কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এমন কোন জীব নাই যাহার একবারও ইন্দ্রত্ব হয় নাই। এই সকল ইন্দ্রত্ব কর্ম্মোপার্জ্জিত সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর। আর এক ইন্দ্র আছেন, যিনি সৃষ্টির কল্পকাল স্থায়ী, ঋগ্বেদ তাঁহারই স্তুতি করিয়াছেন, পরবিন্দুরূপী মহাকালের কলেবর পরিবর্ত্তনরূপ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তিনি ভূর্লোক ভুবর্লোক এবং স্বর্লোকের পরিপালন করেন, তিনি অশরীরী এবং স্বর্গাদি কোন লোকবিশেষের অধিবাসী নহেন। তিনি 'অজন্য' দেবতা। রাবণপুত্র মেঘনাদ যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া লঙ্কাধিপতি তাঁহাকে এই তিরস্কার করিয়াছিলেন যে "তুমি আমাদের শত্রু ইন্দ্রের উপাসনা করিতেছ।" মেঘনাদ উত্তর দিয়াছিলেন যে তিনি যজ্ঞে অমরাবতীশ্বর ইন্দ্রের আবাহন করেন না, কিন্তু 'অজান' অর্থাৎ জন্মরহিত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন। ঐ অজান ইন্দ্র মৌলিক তত্ত্ব, সুতরাং

বিশ্বশক্তির সর্ব্ববাপী সনাদন স্পন্দন হইতে অভিন্ন। যজুর্ব্বেদে তিনি গণপতি, রুদ্র ও সহস্রশীর্ষা পুরুষ প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যায় সংস্তুত হইয়াছেন।

এইরূপ ত্রিশক্তি—কালী তারা ত্রিপুরা—মূলপ্রকৃতির ত্রিতত্ত্বময়ী অবস্থা, এবং তাঁহাদের তন্ত্রোক্ত মূর্ত্তিভেদ সকলও সেই বস্তু। এই সকল দেবতার মূর্ত্তিকল্পনা তাঁহাদের গুণ ও ক্রিয়ানুসারে রচিত, লাক্ষণিক চিহ্নমাত্র (Symbolical representation), তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকের ধারণার জন্য গঠিত। ধ্যান-কল্পনা নিশ্চয় ঋষি দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ঋষি যে ভাবে মন্ত্রশক্তির মূর্ত্তি সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সেই ভাব কখনই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ হইবার নয়, কারণ সে সাক্ষাৎ তাঁহার মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ, কেবল যোগজ অনুভূতি মাত্র। সমাধিভঙ্গের পর তাঁহার স্মৃতি যাহা গঠন করিল তাহাই সেই দেবতার ধ্যান বা মূর্ত্তিকল্পনা বলিয়া প্রচার হইল। এই কল্পনাতে পূর্ব্ব আস্বাদনের যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহা পরিত্যক্ত হইল, যাহা না হইলে ভাবপূর্ণ হয় না তাহা পূরণ করা হইল। শাস্ত্রে যে সকল বাক্যের দ্বারা দেবতার ধ্যান প্রকাশ হইয়াছে, সেই বাক্য ঋষিদিগের শিষ্যপরম্পরাগত রচিত ভাষা ভিন্ন দৈববাণী কখনই নয়।

সমস্ত দেবতাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের জ্যোতিমাত্র। "যেন বর্ণেন যে দেবাঃ"—যে বর্ণের যে দেবতা, তন্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন। এই পৃথিবীর যেমন মনুষ্যলোক, সেইরূপ স্বর্গাদি জ্যোতির্লোকে দিব্য জ্যোতিঃশরীর বিশিষ্ট দেবতাগণ বাস করেন, এবং মানুষ তপঃপ্রভাবে অথবা ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত আরাধনা দ্বারা তাঁহাদের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারেন, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে সেই সকল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় ধরাতে পড়িতে হয়। ঐ সকল দেবতাও মন্ত্রময় দেহধারী, কারণ সৃষ্টপদার্থ মাত্রেই

বায়বীশক্তির স্পন্দনজনিত। মূলদেবতা অপেক্ষা এই সকল দেবতা শীঘ্র ফলপ্রদান করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক, তাই গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন—ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা।

দিব্যশক্তিসম্পন্ন যে সকল মহাসত্ত্ব পূর্ব্বযুগে ইহজগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং এখনও সম্প্রদায়ভেদে দেবতারূপে উপাসিত হইতেছেন, তাঁহারাও স্পন্দনাত্মিকা বায়বীশক্তির অংশাবতার, সেই সেই রূপে প্রকটিত হইয়া উদ্দেশ্য কার্য্যের সমাধা অন্তে পুনরায় সেই শক্তিতে মিশিয়াছেন, "যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায় জলে।" এখনও যে তাঁহারা সেইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্থানবিশেষে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা নয়। তবে সাধকের অত্যুগ্র সংকল্পবলে সে সকল রূপ তাঁহার নিকট পুনরায় প্রকট হয়, এবং সংকল্পবলেই তিনি সেই দেবতার দিব্যধাম দর্শন ও দেহান্তে তথায় সালোক্য বা সামীপ্য অথবা সাযুজ্য উপভোগ করেন। ব্রহ্মশক্তিই সাধকের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তত্তৎ দিব্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন।

স্বয়ং বায়বীশক্তিই মূলদেবতা। তিনিই ইচ্ছাশক্তিরূপে নিগুর্ণ ব্রহ্মাকাশে প্রথম স্ফুরিত হন, এবং তাঁহার স্পন্দনই কুণ্ডলিনীরূপে পরিণত হইয়া বিভিন্ন মন্ত্রদেবতা ও সৃষ্টির নানাভেদ বিস্তৃত হয়। স্পন্দনের তারতম্য বশতঃ কুণ্ডলিনী বিভিন্ন আধারে বিভিন্নরূপে গুণিত অর্থাৎ বলয়াকারে বেষ্টনযুক্ত হন। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে বলিতেছেন—"মনুষ্যমধ্যে কুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে (সাড়ে তিন পেচে) বেষ্টন-যুক্ত, অর্থাৎ ওঙ্কারের অ-উ-ম্ এই তিনবর্ণ ও নাদরূপ অর্দ্ধমাত্রা লইয়াই ঐ সাড়ে তিন বেষ্টন। পরাশক্তির কুণ্ডলিনী তাঁহার স্বেচ্ছাক্রমে গুণিত হয়। যখন শক্তি ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞান এই ত্রিশক্তিরূপে

ত্রিগুণময়ী হন, তখন তাঁহার কুণ্ডলিনী ত্রিধা গুণিত (অকথাদি ত্রিরেখা-রূপে শক্তি ত্রিধা গুণিত বলিয়া তাঁহার সেই অবস্থার নাম ত্রিপুরা) ; চতুর্ধা গুণিত হইলে তখন তিনি চতুর্ব্বেদেশ্বরী একজটা (তারাভেদ) মহাবিদ্যা, পঞ্চগুণা হইলে পঞ্চাক্ষরী মহোগ্রতারা ; ষট্‌গুণান্বিতা হইলে ষড়ক্ষরী সিদ্ধকালী ; সপ্তগুণা হইলে সপ্তাক্ষরী কালসুন্দরী ; অষ্টগুণান্বিতা অষ্টাক্ষরী ভুবনেশ্বরী ; নবধা গুণিতা হইলে নবাক্ষরী চণ্ডিকেশ্বরী ; দশগুণা কুণ্ডলিনী দশবিদ্যারূপিণী ; ১১ গুণা শ্মশানকালী ; ১২ গুণা চণ্ডভৈরবী ; ১৩ গুণা কামতারা ; ১৪ গুণা বশীকরণকালিকা ; ১৫ গুণা মহাপঞ্চদশী নামে শ্রীবিদ্যাভেদ ; ১৬ গুণা ষোড়শী ; ১৭ গুণা ছিন্নমস্তা ; ১৮ গুণা মহামধুমতী ; ১৯ গুণা মহাপদ্মাবতী ; ২০ গুণা বিংশদক্ষরী রমা ; ২১ গুণা কামসুন্দরী ; ২২ গুণা দ্বাবিংশদক্ষরী দক্ষিণাকালী ; ২৩ গুণা বিদ্বেশী ; ২৪ গুণা গায়ত্রী ; ২৫ গুণা পঞ্চমী সুন্দরী ; ২৬ গুণা ষষ্ঠীবিদ্যা ; ২৭ গুণা মহারত্নেশ্বরী ; ২৮ গুণা মৃত-সঞ্জীবনীবিদ্যা ; ২৯ গুণা মহানীলসরস্বতী ; ৩০ গুণা বসুধারা ; ৩১ গুণা ত্রৈলোক্যমোহিনী ; ৩২ গুণা ত্রৈলোক্যবিজয়া ; ৩৩ গুণা কামতারিণী ; ৩৪ গুণা অঘোরা ; ৩৫ গুণা সঙ্গীতমোহিনী ; ৩৬ গুণা বগলা ; ৩৭ গুণা অরুন্ধতী ; ৩৮ গুণা অন্নপূর্ণা ; ৩৯ গুণা লাঙ্গলী ; ৪০ গুণা ত্রিকণ্টকী ; ৪১ গুণা গুহ্যরাজেশ্বরী ; ৪২ গুণা ত্রৈলোক্যা-কর্ষিণী ; ৪৩ গুণা রাজরাজেশ্বরী ; ৪৪ গুণা কুক্কুটী ; ৪৫ গুণা সিদ্ধবিদ্যা ; ৪৬ গুণা মৃত্যুহারিণী ; ৪৭ গুণা মহাভাগবতী ; ৪৮ গুণা বাসবী ; ৪৯ গুণা ফেৎকারী ; ৫০ গুণা মহা মাতৃসুন্দরী ; ৫১ গুণা মাতৃকোৎপত্তিসুন্দরী।” বায়বীশক্তি পঞ্চাশৎ গুণান্বিতা হইয়া অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারাই সমস্ত পরবর্ত্তী সৃষ্টি কার্য্যের বীজরূপিণী। যাহাতে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ সূত্রে মণিগণের ন্যায়

গ্রথিত রহিয়াছে, তিনিই শব্দব্রহ্ম, এখানে তাঁহাকে 'মাতৃকোৎপত্তি সুন্দরী' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সকল শক্তি দেবীমূর্ত্তির গলদেশে বিন্যস্ত মুণ্ডমালাস্বরূপ এবং তাঁহারাই ৫১ মহা পীঠ বা শ্রীদেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। ইহাঁরা বিশ্বের সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন বলিয়া 'বিশ্বেদেবাঃ', অন্য দেবতাগণ তাঁহাদের ভাবান্তর মাত্র।

সমস্ত একাক্ষর বীজমন্ত্রে কুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা। দ্ব্যক্ষর মন্ত্রে, অর্থাৎ যেখানে দুইটী বীজ পর পর অবস্থিত, সেখানে প্রত্যেক বীজ একাক্ষরীর ন্যায় চিন্তনীয়, অধিকন্তু প্রথমটী ব্যাপ্তি বা বিকাশরূপে জ্যোতিঃস্বরূপ এবং দ্বিতীয়টী সংকোচরূপে ঐ জ্যোতির কেন্দ্রস্বরূপ। সমস্ত একাক্ষর মন্ত্র যেমন ওঙ্কারের স্বরূপ, সেইরূপ সমস্ত দ্বিবীজঘটিত মন্ত্র 'হংস' স্বরূপ, প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক। শারদাতিলক সমস্ত একাক্ষর মন্ত্রে শক্তি একধা গুণিত, দ্ব্যক্ষর মন্ত্রে দ্বিধা গুণিত, এবং এইরূপে মন্ত্রের বীজসংখ্যা অনুসারে শক্তির গুণসংখ্যা বলিয়া গিয়াছেন। ওঙ্কার প্রভৃতি একাক্ষর মন্ত্রে শক্তি একধা গুণিত বলা যায় না, এমন কি গণপতির (গঁং) একাক্ষর বীজেও ব্যঞ্জন স্বর বিন্দু ও নাদ এই সার্দ্ধত্রিবলয় বিদ্যমান রহিয়াছে। শারদাতিলক যে উদ্দেশ্যে বীজসংখ্যা অনুসারে গুণসংখ্যা বলিয়াছেন তাহা কিন্তু সাধনপক্ষে একান্ত উপযোগী। যেখানে একাধিক বীজঘটিত মন্ত্র জপ করিতে হইবে, সেখানে প্রতিবীজের এক এক কুণ্ডলী করিয়া, বেষ্টনের পর বেষ্টন উঠাইয়া, নাদোত্থান করিতে হইবে—প্রথম বীজের নাদ হইতেই যেন দ্বিতীয় বীজ নির্গত হইতেছে, এইরূপ বীজগুলি যেন পরস্পর অনুস্যূত বা গ্রথিত রহিয়াছে ভাবিতে হইবে, বীজগুলির পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণে কখনই সমুদয় মন্ত্রের জপ সিদ্ধ হইবে না।

কুণ্ডলিনীর আবর্ত্তনভেদে শক্তিসঙ্গমতন্ত্র যে সকল মূলদেবতার

উল্লেখ করিয়াছেন, তত্তৎ সংখ্যক বীজঘটিত অন্য দেবতার মন্ত্রেরও তাঁহারা অধিষ্ঠাত্রী শক্তি; যেমন, চতুর্ধা গুণিত শক্তিকে শক্তিসঙ্গম 'একজটা' বলিয়াছেন, চারি অক্ষরের সূর্য্যমন্ত্রেরও সেই একজটা অধিষ্ঠাত্রী শক্তি, এবং জগতে যাহা কিছু চারি সংখ্যায় কথিত হয় (যেমন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) সে সমস্তই একজটার স্বরূপ; এইরূপ পঞ্চগুণা 'মহোগ্রতারা' নমঃ শিবায় প্রভৃতি সমস্ত পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের, ষট্‌গুণা 'সিদ্ধকালী' ষড়ক্ষর নৃসিংহ ও গণপতি মন্ত্রের এবং ষট্‌কূটা প্রভৃতি মন্ত্রের, অষ্টগুণা 'ভুবনেশ্বরী' অষ্টাক্ষর নারায়ণ মন্ত্রের ও অষ্টাক্ষর শিবমন্ত্রের এবং সূর্য্যমন্ত্রের মূলশক্তি। মূলশক্তির ভাব ধরিয়া মন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে, নতুবা মন্ত্রচৈতন্য হইবে না। ভাবের বিভিন্নতা হইতে আচারের বিভিন্নতা, একজটা ও মহোগ্রতারা উভয়েই তারাভেদ হইলেও উভয়ের ধ্যানরহস্য পৃথক্, ভাবের পার্থক্য হইতেই ধ্যানের পার্থক্য। চতুর্বীজাত্মক সূর্য্যমন্ত্র একজটাভাবে সাধন করিলেই সিদ্ধ হইবে, আর অষ্টাক্ষর সূর্য্যমন্ত্র ভুবনেশ্বরীভাবে সাধন করিতে হইবে। এ সকল বিষয়ের এখানে সামান্যতঃ উল্লেখ করা গেল মাত্র। মন্ত্রযোগের সাধনখণ্ডে প্রত্যেক দেবতার পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে যথাসাধ্য বিশদ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মন্ত্রশক্তি বিশ্বচৈতন্যরূপ বায়বীশক্তির শাখা বা তরঙ্গস্বরূপ। মূলশক্তিতে উপনীত হইবার জন্য মন্ত্রশক্তি তাহার বিভিন্ন মার্গ বা প্রস্থান। জীবগত প্রকৃতি আধারভেদে বিভিন্ন, এবং সেই ভিন্নত্ব নিবন্ধন মন্ত্র বা দেবতার বিভিন্ন প্রকাশ। যেমন পঞ্চাশৎ বর্ণপুঞ্জমধ্যে স্ফুরিত নাদকলা বর্ণাধার ক্রমে ভেদবিশিষ্ট, তেমনি বর্ণশক্তি হইতে উদ্ভূত জীবপ্রকৃতি বর্ণগত নাদকলার উত্তরাধিকারী, এবং সেই নাদকলাই ঐ জীবপ্রকৃতিতে নিত্য স্ফুরিত বলিয়া তাহার উপাস্য মন্ত্র।

মন্ত্রই উপাসক মানুষ, আবার মন্ত্রই উপাস্য দেবতা। যখন সজীব নির্জীব সকল পদার্থেই বিশ্বব্যাপিনী বায়বীশক্তির প্রকাশ, তখন জগৎ নিশ্চয়ই মন্ত্রময়, এক বায়বীশক্তিই স্পন্দনের তারতম্যে বিভিন্ন সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। শক্তিস্পন্দনের ক্রমবিকাশে কীটদেহ মানুষদেহে পরিণত হইতেছে, মানুষ অবনতিক্রমে কীট হইতেছেন, তৃণ বৃক্ষাকারে পরিণত হইতেছে, নির্জীব সজীব হইতেছে, সজীব নির্জীব হইতেছে। স্পন্দনের বিশিষ্টতাই বিভিন্ন মন্ত্র ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতামূর্ত্তি! আপনাকে মন্ত্রময় করিতে পারিলে সেই মন্ত্রদেবতার সহিত নিজের অভেদ জ্ঞান হয়। ভেদজ্ঞান থাকাতেই আত্মবিস্মৃতি, অভেদজ্ঞান আনিবার জন্য নাদানুসন্ধান প্রয়োজন, মন্ত্রযোগ দ্বারা সেই অনুসন্ধান সত্বর এবং নির্ব্বিঘ্নে সাধিত হয়। ধ্যান ও জপ মন্ত্রযোগের প্রধান অঙ্গ। হয় কেবল জ্যোতির্ধ্যান, না হয় জ্যোতির্মধ্যে দেবতামূর্ত্তির ধ্যান, উভয়ের একটা চাই। ধ্যানচিন্তা ব্যতিরেকে শীঘ্র মন্ত্রচৈতন্য হয় না। ধ্যানের প্রধান ক্রিয়া চিত্তকে অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া একমাত্র ধ্যেয় বস্তুতে সংলগ্ন করা, মন্ত্রেরও ঠিক তাহাই প্রধান ক্রিয়া, একমাত্র মন্ত্রধ্বনিতে চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করা। সুতরাং উপায়দ্বয় সংযোগ হইলে ধ্যেয়মূর্ত্তিতে মন্ত্রধ্বনি স্ফুরিত হইয়া আত্মবিস্মৃতি উৎপাদন করিবে, সেই ধ্বনিময় মন্ত্রমূর্ত্তিতে চিত্তলয় হইলেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি উপস্থিত হইবে।

নাদানুসন্ধান।

আমরা নাদানুসন্ধানকেই মন্ত্রযোগ বলিয়া আসিতেছি। মন্ত্রসিদ্ধির দ্বারা দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন ও তাঁহার নিকট বরগ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত উপাখ্যান পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে অথবা সাধক পরম্পরাতে শুনিতে পাওয়া যায়, সে সমস্ত যোগের বিভূতি ছাড়া আর কিছু নয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য বা অভেদ জ্ঞানের নাম যোগ, এবং তাহা মন্ত্রমার্গেই হউক অথবা প্রাণায়াম ধ্যান ধারণাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধন দ্বারাই হউক, নাদানুসন্ধান সাপেক্ষ। দৃঢ় বিশ্বাস, ভক্তিশ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা, চিত্তের তীব্র একাগ্রতা ও কাতরতা, কামক্রোধাদি রিপুগণের সম্পূর্ণ দমন ও বিষয়বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণ না থাকিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ ঘটিতে পারে না, কিন্তু সেখানেও নাদানুসন্ধান ভিন্ন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ঘটিবে না। যাহা স্থির চৈতন্য তাহাই ঈশ্বর। নাদরূপিণী বায়বী ঈশ্বরের শক্তি, এবং সেই শক্তিতে জীব ও জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতে গেলে, যে পথেই হউক, সেই নাদশক্তির আবরণ ভেদ করিতে হইবে। মন্ত্রযোগের প্রধান অঙ্গ সেই নাদের অনুসন্ধান, যতক্ষণ তাহা না হয় ততক্ষণ মন্ত্র নির্জীব, অক্ষর মাত্র। নাদের আবির্ভাব না হইলে মন ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইবে না, বিশ্বাসও দৃঢ় হইবে না, জ্ঞানলাভ ত দূরের কথা—

ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ।
মারুতস্য লয়ো নাথঃ স লয়ো নাদমাশ্রিতঃ॥

মন ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি, কারণ মন যে যে বিষয়ে তাহাদিগকে প্রেরণ করে ইন্দ্রিয়গণ তাহাতেই নিযুক্ত হয়, মনঃসংযোগ ভিন্ন তাহারা জড়বৎ নিষ্ক্রিয়। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস রূপ পবন মনকে নাচাইতেছে, যখন মন একমাত্র লক্ষ্যে আবদ্ধ থাকে তখন প্রাণ-বায়ুও স্থির থাকে। প্রাণবায়ুর যাতায়াত হইতেই নানা বিষয়ের বাসনার তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। মন সেই সকল বাসনার আধার এবং মনই বাসনাময়, অতএব প্রাণানিল মনের স্বামী। প্রাণই বেদোক্ত "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ," জীবের যতগুলি বাসনা ততগুলি মন, প্রাণ সহস্র (অসংখ্য) বাসনার উদয় করিতেছে, প্রাণই বাসনারূপে উত্থিত হইতেছে, তাই প্রাণের সহস্র মস্তক। প্রাণের আধিপত্য নিবন্ধন চক্ষু সহস্র বিষয়ে আকৃষ্ট হইতেছে, সেইজন্য প্রাণই 'সহস্রাক্ষ,' এবং প্রাণের আকর্ষণে পাদ সহস্রদিকে ধাবিত হইতেছে বলিয়া প্রাণই 'সহস্রপাৎ'। প্রাণ দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত ভূমি বিচরণ করিয়া নাসাগ্রের বহির্ভাগে দশাঙ্গুলি পরিমিত উদ্গত হইতেছে, তাই শ্রুতি বলিতেছেন "স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্।" অধুনা জগতের মানবদেহে প্রাণবায়ু নাসাগ্র হইতে দ্বাদশাঙ্গুলি নির্গত হয়, পূর্ব্বতন যুগের দীর্ঘজীবনের মনুষ্যের অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব নির্গম সম্ভবপর, এবং হয় ত ভবিষ্যতের স্বল্পায়ু লোকের প্রাণনির্গমন দ্বাদশাঙ্গুল অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। প্রাণের স্থিরতার উপরই আয়ুর স্থিরতা নির্ভর করে। জীবদেহে বিদ্যমান নাদকলা প্রাণগতির সঙ্গে স্পন্দিত হইতেছে, সেই নাদকলা প্রাণী শরীরের মূলধন, প্রাণনির্গমের সঙ্গে সেই মূলধনের ক্ষয় হইতেছে, সেইজন্য প্রাণের স্পন্দন থাকিতে নাদের উপলব্ধি হয় না। প্রাণের স্থিরতার সঙ্গে বাসনা স্তম্ভিত হয়, সুতরাং মন বিক্ষেপশূন্য হইয়া

লয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই দেহস্থিত নাদকলার স্ফূর্ত্তি অনুভূত হয়, তাই বলা হইয়াছে যে "প্রাণবায়ুর অধিপতি লয়াবস্থা, এবং সেই লয় নাদকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে।" লয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে বলিয়াছেন—"অপুনর্বাসনোত্থানাৎ লয়ো বিষয়-বিস্মৃতিঃ," পুনঃ পুনঃ বাসনার উত্থান বন্ধ হইয়া যখন সমস্ত বিষয়ের বিস্মৃতি উপস্থিত হয়, তাহার নাম লয়। তখনকার নির্ব্বিষয় চিত্ত—

অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যঃ কুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণঃ কুম্ভ ইবার্ণবে॥

যেমন আকাশস্থিত শূন্য কুম্ভের ভিতরে ও বাহিরে একমাত্র শূন্য আকাশ সমভাবে অবস্থিত, সেইরূপ লয়াবস্থায় যোগীর চিত্ত শূন্যময় হয়। অথবা জলমধ্যে নিমগ্ন কুম্ভের ভিতরে ও বাহিরে যেমন সমভাবে জলপূর্ণ থাকে, সেইরূপ তখন যোগীর চিত্ত জগন্ময় হইয়া কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না। চিত্ত যখন পূর্ণানন্দে নিমগ্ন থাকে তখন আর তাহার বিষয় বাসনা থাকে না, সুতরাং লয়াবস্থাতে চিত্ত স্থিরপদ প্রাপ্ত হয়। নাদানুসন্ধানে সমাহিত চিত্তে পরানন্দের উচ্ছাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে—

নাদানুসন্ধানসমাধিভাজাং
যোগীশ্বরাণাং হৃদি বর্দ্ধমানম্।
আনন্দমেকং বচসামগম্যম্
জানাতি তং শ্রীগুরুনাথ একঃ॥

যিনি নাদানুসন্ধানের অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড আনন্দরস নিজে আস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই শিষ্যের উদ্ধারে সক্ষম শ্রীগুরুপদবাচ্য। যিনি নিজে আস্বাদন করেন নাই, অপরকে আস্বাদন করান তাঁহার

সাধ্যাতীত। এখনকার দিন সেরূপ সিদ্ধগুরুর অভাবে উপদেশ অবলম্বনে চেষ্টা ও যত্ন করিতে হইবে। ভগবান আচার্য্যও যোগ-তারাবলীতে নাদানুসন্ধানের শ্রেষ্ঠতা ব্যক্ত করিয়াছেন—

শ্রীআদিনাথেন সপাদকোটি-
লয়প্রকারাঃ কথিতা জয়ন্তি।
নাদানুসন্ধানকমেকমেব
মন্যামহে মুখ্যতমং লয়ানাম॥

"যোগিসম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীআদিনাথ সওয়া কোটি প্রকার লয়সাধনের উপায় উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একমাত্র নাদানুসন্ধানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে।" তাহার কারণ, নাদানুসন্ধান দ্বারা সহজে এবং শীঘ্র উন্মনী অবস্থা উপনীত হয়। নাদানুভূতি জনিত লয়াবস্থা ঘটিলেই সাধক রাজযোগ পদবীতে আরূঢ় হইয়া থাকেন, বিশেষতঃ অল্পবুদ্ধিদিগের জন্য এই ক্রমই সদ্য প্রত্যয়কারক ও অক্লেশসাধ্য। নাদের অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমতঃ যে কোন বাহ্য ধ্বনিতে মনকে সংলগ্ন করিতে হয়। ভ্রমরের গুঞ্জন, ঝিল্লীর রব, তানপুরার ঝঙ্কার, পিয়ানো বা মৃদঙ্গের ধ্বনি প্রভৃতির যে কোন ধ্বনিতে আপনার মন্ত্রের ধ্বনি একতার হইবে সেই ধ্বনিতে মন্ত্রের আবর্ত্তন করিতে হইবে। দীর্ঘকাল ঐরূপ আবর্ত্তন দ্বারা মন্ত্রধ্বনি নিরন্তর চিত্তমধ্যে স্ফুরিত হইতে থাকে, সেইজন্য মন্ত্রশাস্ত্রে প্রতিমন্ত্রের জপসংখ্যা নিরূপিত আছে। একাক্ষর বীজের প্রায় একলক্ষ আবর্ত্তনে মন্ত্রচৈতন্য বলা হইয়াছে, কিন্তু কলিতে মানুষের চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত বলিয়া চতুর্গুণ জপের ব্যবস্থা আছে। তথাপি যে আমরা শতগুণ জপেও মন্ত্রচৈতন্য হইতে দেখি না, তাহার প্রধান হেতু চিত্তের বিক্ষেপ এবং জপকালে নাদানুসরণের

অভাব। কেবল মন্ত্রমাত্রের কোটি কোটি বার আবর্ত্তনেও কুণ্ডলিনী অর্থাৎ মন্ত্রগত নাদশক্তি কথনই প্রবুদ্ধ হইবার নয়। নিয়মিত পরিমাণে, উপযুক্তকালে, নিত্য জপের অভাবেও কথিত ফল হয় না; অথবা যমনিয়মাদির অপালনে, আহারাদির সংযম না থাকিলে, কিম্বা সংসর্গদোষেও ফলহানি হয়। এই সকল বিষয় সাধনখণ্ডের 'পুরশ্চরণ' প্রস্তাবে নিরূপণ করা হইবে।

নাদানুসন্ধানের চরম ফল লয়াবস্থা। আগম সেই মুখ্যতম ফলকেই মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু নাদের অনুশীলন হইতে থাকিলে সেই সঙ্গে মনেরও ভাবান্তর হইতে থাকে, ইহাই মন্ত্রাভ্যাসের তাৎকালিক ফল। মনের ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মস্তিষ্কের সেই সেই স্নায়ুকেন্দ্রের অবস্থান্তর সংঘটিত হয়। সমস্ত মানসিক ভাবের জন্য বিশেষ বিশেষ স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্ক মধ্যে ব্যবস্থিত রহিয়াছে—যে সকল ভাবের অধিক অনুশীলন হইতে থাকে, তাহাদের স্নায়বিক আবর্ত্ত (convolutions) গুলির পুষ্টি ও পরিসর, এবং যে সকল ভাব মনোমধ্যে আর আবর্ত্তিত হয় না তাহাদের কেন্দ্রস্থানের ক্রমশঃ শীর্ণতা হইতে থাকে। নিরন্তর নিষ্ঠুরাচরণে রত ব্যক্তির দয়াকেন্দ্র কুণ্ঠিত ও ক্রমে লুপ্ত হয়, কামাসক্ত ব্যক্তির প্রেমসঞ্চার রুদ্ধ হয়, দ্বেষ হিংসাতে লোকরঞ্জন শক্তি নষ্ট হয়, নাস্তিকতা শ্রদ্ধাভক্তিকে শুষ্ক করে—আবার দয়ার অনুশীলনে নিষ্ঠুরভাব তিরোহিত হয়, প্রেমভাব কামকে দূরীভূত করে, লোকরঞ্জন দ্বারা দ্বেষ হিংসার ত্যাগ হয়, শ্রদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠানে আস্তিক্য বুদ্ধির সমাগম হয়। মন্ত্রশক্তির প্রভাবে পাপবুদ্ধি তিরোহিত হয়, এবং মস্তিষ্কের শোভন পুণ্য কেন্দ্রগুলি বিকসিত হয় এবং ফলে শরীরও তদনুরূপ কান্তিযুক্ত হয়, বোধশক্তি ও স্মৃতিশক্তি পরিপুষ্ট হয়।

মন্ত্র কেবল পরকালের জন্য নয়, ইহ জীবনের মেধাশক্তির পরিপুষ্টতাই মন্ত্রসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষণ। জীবের ক্রমোন্নতি মেধাবৃদ্ধির দ্বারাই লক্ষিত হয়। প্রথমে জাগতিক বস্তুজাত ও তাহাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ মেধা স্ফুরিত হয়, তাহার পর বায়বীশক্তির পরিচয় হইতে থাকিলে দিব্যমেধার আবির্ভাব হয়, এবং যখন বিশ্বচৈতন্যরূপিণী পরমা ব্রহ্মশক্তিতে আত্মসমর্পণ উপস্থিত হয় তখনই সাম্রাজ্যমেধার উদ্দীপন হয়। মেধাসাম্রাজ্যই ঈশ্বরের স্বরূপ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের আচরিত কর্ম্ম ও সুচিন্তিত বিষয়গুলির দ্বারাই ইহ জীবনের মেধা গঠিত হয়, সেই মূলধনের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনই মানব জীবনের ক্রমোন্নতি। আগমোক্ত সমস্ত প্রথম দীক্ষাই মেধাদীক্ষা, পিঙ্গলাযোগে কর্ম্মজীবনের সার্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি ও পরিশোধন এই প্রথম দীক্ষার উদ্দেশ্য। ইড়া যোগে বামমার্গে কর্ম্মত্যাগ হইয়া একমাত্র নাদশক্তিকে আশ্রয়ই দিব্যমেধার লক্ষণ, এবং সুষুম্না প্রবেশ দ্বারা সমাধিযোগে মেধাসাম্রাজ্যের আস্বাদন অনুভূত হয়। পূর্ব্বে যে ক্রমদীক্ষার কথঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা এই ত্রিবিধ মেধাদীক্ষার নামকল্পনা মাত্র।

এখনকার গৃহাশ্রমীর জন্য বক্তব্য এই যে নাদাভ্যাসরূপ মন্ত্রজপে জপসংখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখিলে নাদানুসন্ধানের বিঘ্ন হইবে, মন সংখ্যাপূরণের জন্য ব্যগ্র হইবে, যেন সংখ্যাপূর্ত্তি হইলেই অবকাশ! যতটুকু সময় মন অন্যচিন্তা হইতে বিরত হইয়া মন্ত্রনাদে আসক্ত থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই প্রথমাধিকারীর পক্ষে বিহিত, এবং সেদিকে কালাকাল বাছিলেও চলিবে না। বিষয়কর্ম্মে রত থাকিয়াই হউক, আর শয়নে পর্য্যটনে লোকসম্ভাষণে হউক, যখন যেটুকু মন্ত্রনাদের স্ফূর্ত্তি আসিবে, তখন সেইটুকু নাদানুসন্ধান করিলে সহস্র মন্ত্রাবৃত্তির

অপেক্ষা অধিক ফল নিশ্চয় হইবে। কিন্তু তৎকালে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক শক্তির অনুভূতি হইতেছে, এবং সেই শক্তি বিশ্বমধ্যে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। পরমেশ্বরের আজ্ঞাই জগৎমধ্যে একমাত্র শক্তি এইটুকু বিস্মৃত হইয়াই মানুষ পথভ্রষ্ট এবং উন্মার্গগামী হয়, তাহার ফলেই রোগ শোক অর্থনাশ অকালমৃত্যু স্মৃতিলোপ প্রভৃতি নানা দুর্দ্দশা আপতিত হয়। মানুষ যতই উন্নত হউক মানুষই থাকে, ঈশ্বরের সমকক্ষ কখনই হইতে পারে না। যোগানুশীলনে কথঞ্চিৎ বিভূতির উদয়ে মানুষ কখনও ভগবানের অবতার হইতে পারে না। যাহারা তাহা বলে তাহারা ধূর্ত্ত শঠ প্রতারক। আগম স্পষ্টবাক্যে উপদেশ দিতেছেন —"নরসেবা ন কর্ত্তব্যা," ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবা করিলে পতিত হইতে হয়, যাহার পূজা করা হয় তার দোষগুলি ঘাড়ে চাপিয়া বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয়, তাই বলিয়া পিতামাতা প্রভৃতি নিত্য গুরুজনের সেবা নিষেধ করেন নাই।

যাঁহারা নাদরূপিণী বায়বীশক্তির সাধন নিরত তাঁহারাই 'শাক্ত,' তাঁহারা যে কোন জাতীয় হউন সাধারণ মনুষ্যের শ্রেণীভুক্ত নহেন। মুণ্ডমালাতন্ত্র বলিতেছেন—

শাক্তা বৈ শঙ্করা দেবি যস্য কস্য কুলোদ্ভবাঃ।
চাণ্ডালা ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যসম্ভবাঃ॥
এতে শাক্তা জগদ্ধাত্রি ন মনুষ্যাঃ কদাচন।
পশ্যন্তি মানুষান্ লোকে কেবলং কর্ম্মচক্ষুষা॥
যে শাক্তা ব্রাহ্মণা দেবি ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
বৈশ্যাশ্চ ব্রাহ্মণা দেবি সর্ব্বে শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ॥

যাহারা ব্রহ্মশক্তির উপাসক, তাহারা যে কুলজাত হউক না কেন সকলেই ব্রাহ্মণ, সকলেই শঙ্কর তুল্য। শক্তির উপাসক চণ্ডাল হউক, অথবা ব্রাহ্মণ শূদ্র ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য জাতিসম্ভূত হউক, সকলেই সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ পদবীতে আরূঢ়। শক্তির সেবক সকলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র (কিম্বা যবন ও ম্লেচ্ছ) জাতীয় ব্যক্তিও ব্রহ্মশক্তির উপাসক হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া যায়! নাদবিন্দুঘটিত বীজমন্ত্রের উপাসক মাত্রেই শাক্ত।

এইখানেই আমরা মন্ত্রযোগের দর্শনখণ্ডের অবসান করিলাম।

ওঁ তৎসৎ ॥ ওঁ

:*:–

পরিষ্করণ

১১৭ পৃষ্ঠাতে 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দের সমাসভেদে পৃথক্ অর্থ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বৈয়াকরণ পাঠক মহাশয়ের সন্দেহ হইতে পারে। "ইন্দ্রস্য শত্রুঃ" এই তৎপুরুষ সমাসে বৃত্রকেই বুঝায় এবং "ইন্দ্রঃ শত্রুর্যস্য" এই বহুব্রীহি সমাসেও বৃত্রকে বুঝায়, কিন্তু তৎপুরুষে শত্রুশব্দ উদাত্ত হইবে আর বহুব্রীহিতে ইন্দ্রশব্দ উদাত্ত হইবে। হোতা ইন্দ্রশব্দ উদাত্তস্বরে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে 'ইন্দ্র শাতয়িতা হউক' এই অর্থই প্রবল হয় এবং সেই স্বর দোষনিবন্ধন ইন্দ্র বৃত্রের নিহন্তা হন। পাঠকের বিচারার্থ আমরা মহাভাষ্যের এই অংশের কৈয়টের টীকা উদ্ধৃত করিলাম।—"দুষ্টঃ শব্দ ইতি। স্বরেণ স্বরতঃ। আদ্যাদিত্বাত্তসিঃ। মিথ্যাপ্রযুক্ত ইতি। যদর্থ প্রতিপাদনায় প্রযুক্তস্ততো অর্থান্তরং স্বরবর্ণ-দোষাৎ প্রতিপাদয়ন্ অভিমতমর্থং নাহ ইত্যর্থঃ। বাগেব বজ্রো হিংসকত্বাৎ। যথেন্দ্রশত্রুশব্দঃ স্বরদোষাদ্ যজমানং হিংসিতবান্ ইত্যর্থঃ। ইন্দ্রস্যাভিচারো বৃত্রেণারব্ধঃ। তত্রেন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্বেতি মন্ত্র উহিতঃ। তত্র ইন্দ্রস্য শময়িতা শাতয়িতা ভবেতি ক্রিয়াশব্দোঽত্র শত্রুশব্দ আশ্রিতঃ, ন তু রূঢ়িশব্দঃ। তদাশ্রয়েণ বহুব্রীহিতৎপুরুষয়োরর্থা-ভেদঃ। তত্র ইন্দ্রামিত্রত্বে সিদ্ধে সতি ইন্দ্রস্য শত্রুর্ভব ইত্যত্রার্থে প্রতিপাদ্যে অন্তোদাত্তে প্রযোক্তব্যে আদ্যুদাত্ত ঋত্বিজা প্রযুক্ত ইতি অর্থান্তরাভিধানাৎ ইন্দ্র এব বৃত্রস্য শাতয়িতা সম্পন্নঃ।"